

উৎসব ।

ও ত্রী আশ্বারামায় নমঃ ।

অষ্টম কুরু যজ্ঞে যো যুদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি ।

স্বগাতাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে ॥

২য় বর্ষ]

১৩১৪ সাল, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ।

[১ম ও ২য় সংখ্যা]

নূতন বৎসরে ।

এস এস মরিতে ত হইবেই । তবে কুকুর শৃগালের মত নিতান্ত অসহায় অবস্থায় মরিয়া আবার এই ছুঃখ ভোগ করিতে আসিবে কেন—এস বীরের মত কর্তব্য করিয়া মরি ।

তুমি যেই হওনা কেন যুদ্ধ তোমার করিতে হইবেই । সন্ন্যাসী হও বা তপস্বী হও তব রক্ষ হইতে রক্ষা জন্য যুদ্ধ করিতে হইবে, রাজা হও বা ধনী হও বাহিরের শত্রু বা ঘরের শত্রু হইতে রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে হইবে, ব্যবসা, কৃষি, গোরক্ষা দ্বারা ধনোপার্জনধর্মী হও, নিষ্ঠুর লোভীর এক চেষ্টিয়া হইতে ধনরক্ষা জন্য যুদ্ধ করিয়া জীবিকা রক্ষা করিতে হইবে, ভগবানবোধে সেবাদর্মী হও সেখানেও আলস্য অনিচ্ছা হিংসা ইত্যাদি ব্যাপার হইতে রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধ করিতে হইবে ।

যুদ্ধ করিতেই হইবে—যতদিন না গল্পবা স্থানে পৌছিতেছ । তুমি যেই হওনা কেন, সাধুসন্ন্যাসী তপস্বীই হও অথবা রাজরাণাই হও কিবা ধনবানই হও অথবা সেবাদর্মীই হও অথবা সতী স্ত্রীই হও যখনই আলস্য আসিল, যখনই আরেস ইচ্ছা হইল, যখনই গল্পে রুচি হইল, তখনই জানিও অধঃপাত সূত্র হইল । এক স্থানে এক অবস্থার চূপ করিয়া থাকিবার স্থান ইহা নহে । হয় উন্নতি কর না হয় অধঃপাতে বাও এক স্থানে চূপ করিয়া থাকিতে কিছুতেই পারিবে না । উন্নতির চেষ্টা না কর অধঃপাতে বাইবেই ।

তাই বলিতেছি অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ না করিলে উন্নতি নাই। তাই বলিতেছি যুদ্ধ কর। শ্রীভগবান বলিতেছেন—

হতো বা প্রাণ্যাসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্তাসে মহীম্

তস্মাদ্ভুক্তিষ্ঠ কৌন্তেয় ! যুদ্ধার কৃতনিশ্চয়ঃ ।

হত হও স্বর্গ পাইবে আর জয়লাভ কর পৃথিবী পাইবে। অতএব হে কৌন্তেয় যুদ্ধই করিব নিশ্চয় করিয়া উদ্যোগী হও।

উদ্যোগহীন হইয়া মৃগাল কুকুর গৃধিনী শকুনীর মত পচা দেহের জন্য খাওয়া খারি করিয়া মরার লাভ কি—আবার মরিবে, আবার জন্মিবে, আবার অধিক দুঃখ পাইবে—ইহার অন্ত কখনও হইবে না।—এস এস শাস্ত্রমত যুদ্ধ করিয়া হয় জয়লাভ করি, না হয় যুদ্ধে জীবন দিয়া অক্ষর স্বর্গলাভ করি। ভগবান অর্জুনকে যাহা বলিয়াছেন তাহা কি তপস্যাপরায়ণ, কি শাস্ত্রপরায়ণ, কি ব্যবসা কারবারপরায়ণ, কি সেবাপরায়ণ সকলের পক্ষেই খাটিতে পারে। আমরা অন্ত সকলের কথা বলিব না। বলিব বাহ্যিক তপস্যার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন তাঁহাদের কর্তব্য।

প্রতিদিনের তপস্যার রজস্বলকে দূর করিয়া সবে অবস্থিত হইবে। এই যুদ্ধের জন্য নিয়ম চাই, সময়ের বিভাগ চাই। বাহ্যিক শুধু তপস্যাই করিবেন তাঁহাদের জ্ঞাত আমরা সময় ও কর্মের তালিকা দিয়া দিলাম।

এখানে একটি কথা বলি বাহ্যিক কোন প্রকার পঠন পাঠন বা চিন্তন জানেন তাঁহাদিগের জন্য পাঠ ও মনন একটি প্রধান তপস্যা।

শ্রুতি বলেন,

উত্তম্য তত্ত্বচিন্তেব মধ্যমং শাস্ত্রচিন্তনম্

অধম্য মন্ত্ৰচিন্তা চ তীর্থল্যাস্ত্রাধম্যধম্য ॥

তত্ত্বভাবনা উত্তম। শাস্ত্রভাবনা মধ্যম। শাস্ত্রভাবনা দ্বারা মনকে কর্মে প্রবৃত্ত করিয়া নিত্য কর্ম করিলেই কর্ম ঠিক ঠিক হইয়া থাকে। সন্ধ্যার ভাবনা দ্বারা মনকে সরল করিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি করিলে তবে সন্ধ্যা হইবে নতুবা সর্পমন্ত্র আবৃত্তি মাত্র। বাহ্যিকের দিবারাত্রিই আয়ত্তাবীন সেইরূপ তপস্বীর জন্য আমরা সময়ও কর্ম বিভাগ করিয়া দিলাম। বাহ্যিকের এত সময় নাই তাঁহারা আপন আপনার সুবিধামত ইহা পরিবর্তিত করিয়া লইবেন। কেহ যদি মনে করেন এত কি করা যায়—আমরা বলি ছেলে খেলার বা সখের সাধনায় কি ভগবান ছিলে? সে কি এত সহজ?

১। রাত্রি ৪টা হইতে বেলা ৯টা পর্য্যন্ত সময়ের কার্য ।

(ক) শয্যায় উপবেশন ও ভাবনা ।

(খ) শয্যাভ্যাগ—শৌচ, দস্তধাবনাদি ।

(গ) আজ্ঞা পাজ্যমার্জনী দ্বারা শরীরের বলা পরিষ্কার—(কণিকের জন্য শরীরের জড়তা দূর) ।

(ঘ) স্থানাসনে উপবেশন করিয়া গীতা বা অন্য কোন আধ্যাত্মিক শাস্ত্র লিখিয়া বৃত্তিতে চেষ্টা করা (শরীরের ও মনের জড়তা দূর দীর্ঘ সময়ের জন্য) ।

(ঙ) ভাবনাধ্যায় অগ্নি হোত্র বা, অগ্নিক্রিয়া বা তপস্যা বা তাপ দেওয়া যিনি বাহা জানেন ।

(চ) সন্ধ্যা আহ্নিক (ব্রাহ্ম যুহুর্ভেই আবশ্যক) সময়ে না হয় আরও পূর্বের সময় লইতে হইবে । ক্রমে অভ্যাগাস হইলে ঠিক সময়েই হইবে ।

(ছ) বেদ বা আধ্যাত্মিক শাস্ত্র পাঠ করা, লিখিয়া লিখিয়া মনন করা এবং ভাবনা । সৃষ্টি-ভাবনা, স্থিতি-ভাবনা, এবং লয়-ভাবনাই সর্বশ্রেষ্ঠ । আমরা অন্য স্থানে তাহা উল্লেখ করিয়াছি ।

বেলা ৯ হইতে বেলা ১১টার কৰ্ম ।

১। যোগ বাশিষ্ঠাদি বা অধ্যাত্ম রামায়ণাদি শাস্ত্রপাঠ ।

২। মধ্যাহ্নের জিয়া । লেখা ভাবনা ।

৩। দ্বানকালে দ্বানবজ্ঞ ভাবনা—দ্বান ।

৪। মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা ।

বেলা ১২টা হইতে ৩টার কার্য ।

১। আহার যজ্ঞ ভাবনা—আহার ।

২। বিজ্ঞানে ভাবনা—পুরাণাদি দেখা ও ভাবনা ।

৩। বিষয় কার্য—কাহারও সহিত দেখা বা চিঠি ।

বেলা ৩ হইতে ৬ পর্য্যন্ত

সংসঙ্গ—ভাবনা—বা শাস্ত্র চিন্তন, বাহার যাহা যুটে ।

৬টা হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত

১। ভাবনা—সন্ধ্যা ।

২। অগ্নিক্রিয়া—ভাবনা ।

৩। অল যোগাদি ।

৪। নীতাদি শুধু পাঠ ও ভাবনা ।

১. মধ্য রাত্রের কার্য—ভাবনা—স্মরণ—নিদ্রা।

যাহারা তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে চাহেন তাঁহাদের জন্যই ইহা আভাস দেওয়া গেল। যাহারা সিদ্ধ হইরাছেন (যথার্থ)—তাঁহারা সর্বদা সমাধিমুখে অবস্থিত থাকেন। কেহ আসিলে বা জিজ্ঞাসা করিলে সমাধি হইতে বিরাম লাভ করিয়া উপদেশ প্রদান করেন। যাহার বেক্ষপ অবস্থা উপাসনার ৪টি সম্বর করিয়া লইয়া জীবনের প্রথম হইতেই কিছু কিছু অভ্যাস আবশ্যক। গৃহীমধ্যে এ সুবিধা অতি অল্প কালীবাসীর আছে।

ভারতের অতীত গৌরব।

সকল মানুষের এমন কি সকল জীবের জুড়াইবার স্থান একটি মাত্র। শান্তি নিকেতন ভিন্ন শান্তি আর কোথাও নাই। মাতৃস্তন ভিন্ন সন্তানের স্বচ্ছন্দ-বলাধানের আর কিছুই নাই। শান্তিময়ী, আনন্দময়ীর কোল ভিন্ন চির আনন্দের স্থান আর কোথায়?

গতির স্থান এক হইলেও শক্তি ত সকল মানুষের একরূপ নহে। সকলের শক্তি একরূপ নহে বলিয়াই সকলের প্রগতি একরূপ হইতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন নরনারীর প্রগতি ভিন্ন বলিয়া সকল মানুষের কার্যও একরূপ দেখা যায় না।

যাহার যে কার্যে প্রবল আসক্তি তাহাই তাহার স্বাভাবিক কাৰ্য্য হইয়া গিয়াছে। সকল মানুষকে একরূপ কার্য্য করিতে বলিলে এই জন্ত সকলে তাহা করিয়া উঠিতে পারে না। এমন কি এক রকম খাদ্য যদি যুদ্ধে মানুষের জন্ত ব্যবহৃত করা যায় তাহা হইলে তাহা সকলের সমান ক্রটিকর হয় না। কাজেই প্রগতি বৃদ্ধি কর্ত্তব্য ব্যবহৃত করিতে হইবে। যেখানে এই প্রগতি বৃদ্ধি কর্ত্তব্য ব্যবহৃত করা হয় না সেখানে মানুষের সংগতি হয় না।

প্রাচীন ভারতের কর্ত্তব্য ব্যবহৃত প্রকৃতি ধরিয়া করা হইত। কেহ কেহ তপস্যা করিতে স্মৃতি পাণ্ডা কাহারও যুদ্ধাদিতে ক্রটি, কাহারও বা ধনোপার্জনে আসক্তি, কেহ বা সেবাকেই পরম স্মৃতি বলিয়া মনে করে। এমন কি একটা জীবনের বাল্য যৌবন, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধাবস্থার প্রকৃতি অনুসারে কর্ত্তব্য ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছে।

যাহার যে কার্য্যে স্বচ্ছন্দ হয় তাহাকে জন্ত কার্য্য করিতে বলাই পরধর্ম গ্রহণ কল্পন। ইহাতেও মানবের অধোগতি হইবেই। এই জন্ত ছন্দমত কর্ত্তব্য

নির্ধারণ করা নিতান্ত গুরুতর কার্য। গীতা শাস্ত্র অর্জুনের এই পরামর্শ গ্রহণেচ্ছা নিবৃত্তি করিয়া স্বধর্ম আনয়ন জন্য উপদেশ দিতেছেন।

সংগ্রাম সকলকেই করিতে হইবে। যিনি তপস্যা করিবেন তাঁহাকেও যেমন রজতমরুপ শত্রুকে জয় করিতে হইবে সেইরূপ যিনি রাজ্য রক্ষা করিবেন তাঁহাকেও রাজ্য অপহরণকারীকে দূর করিতে হইবে। যিনি ধনোপার্জন করিবেন তাঁহার প্রতিদ্বন্দীও আছে আবার যাহার সেবা ধর্ম তাহারও শত্রু আছে। বৃদ্ধেই জীবন। বীরই জীবিত। অলস ব্যক্তি মৃত। প্রাচীন ভারতের প্রণালী এই ছিল যে ভগবানকে সারথী করিয়া যুদ্ধ করা ভিন্ন অন্য কিছুই কল্যাণপথ বলিয়া বিবেচিত হইত না। যেমন ভগবান ত্রিগুনচন্দ্র ভিন্ন কুন্তকর্ণ ও রাবণের বিনাশ অন্য কেহ করিতে পারিলেন না সেইরূপ আত্ম-রামকে সারথী না করা পর্য্যন্ত তপস্যাকারীর তপোবিয় যে তম ও রজ অর্থাৎ লয় ও বিক্ষেপ ইহা কিছুতেই দূর হইবে না। ত্রিকুণ্ড ভিন্ন যেমন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কিছুতেই নিশ্চয় হইত না সেইরূপ ত্রিভগবানের দিকে লক্ষ্য না রাখিতে পারিলে মহিষাসুরমর্দিনী রমাকপর্দিনী শৈলহৃতাকে ছন্নবে না বসাইয়া বাহুবল প্রকাশ করিতে গেলে সে বাহুবলে কার্য্য হইবে না। এইরূপ ধনোপার্জনেও এবং সেবাধর্মেও ত্রিভগবানকে সারথী করা চাই। তপস্যা কর সেখানে ভগবান চাই; যুদ্ধ কর সেখানে মহিষাসুরমর্দিনী চাই; শিল্প বাণিজ্য গো সঞ্চয় কর সেখানে ভগবান চাই, সেবা কর সেখানেও ভগবান বোধে সেবা চাই। প্রাচীন ভারতের এই রীতি ছিল।

নবীন রীতি বেন বিপরীত পথে চলিতেছে। ভগবানের ব্যবস্থা না করিয়াই শুধু যেন সমবেত শক্তির বল দেখিতেছে। সমবেত শক্তি ভাল—সেই সঙ্গে ভগবানকে সারথী করার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাই ভারতের অতীত গৌরবের আলোচনা করিতেছি। সিংহশিল্প মেঘশাবকের দলে পড়িয়া যখন সিংহত্ব বিন্ধত হয় তখন তাহাকে সিংহের গর্জন শুনাইতে হয় নতুবা তাহার অভিনয় মেঘ শাবকের মত হইতে থাকে। প্রকৃত সিংহের গর্জন শুনিলে আত্মবিন্ধত মেঘশাবক-গত সিংহশিল্প আপনাকে আপনি দেখিতে পায় আপনার স্বরূপ দেখিয়া গর্জিয়া উঠে।

ভারতের আধুনিক কার্য্য প্রণালী দেখিলে মনে হয় ভারত আপনার সিংহত্ব ভুলিয়া মেঘশাবকের অভিনয় করিতেছে। অতীত গৌরব স্বরণ ব্যতীত ভারত আপনার স্বরূপ দেখিতে পাইবে না। নবীন রীতিতে চলিলে ভারত ভারত

থাকিবে না। ভারত যদি ভারত না থাকে তবে ভারতের নাম লোপ হইয়া যাউক—বরং তাহা ভাল তথাপি ভারত যেন পৃথিবীর আর কোন দেশের সমান না হইয়া যায়।

পৃথিবীর সহিত তুলনা কর, কি প্রাকৃতিক দৃশ্য কি জ্ঞান-বিকাশ সর্ব বিধে ভারত পৃথিবীর মস্তকস্বরূপ। হস্তীর ধান্য ক্ষেত্রে আপন দেখে লুকাইবার চেষ্টার মত ভারতের নবীন রীতি অবলম্বন, প্রকৃত দর্শকের কাছে নিতান্ত হাস্যজনক।

ভারতের প্রাচীন জাতিভেদ প্রথা যদি ভারতের অধোগতির কারণ বলিয়া মনে কর তবে বল দেখি জাতিভেদ না থাকিয়াও মুসলমানের অধোগতি কেন হইল? যদি বিধবার বিবাহ না দেওয়াই ভারতের অধঃপতনের কারণ হয় তবে যে সমস্ত জাতিতে বিধবাবিবাহ প্রচলিত তাহাদের বীৰ্য্যহানির কারণ কি? এই সমস্তই বিশেষ চিন্তার বিষয়। আমরা কিন্তু এই সমস্ত বিষয় আলোচনার জন্য এই প্রস্তাবের অবতারণা করি নাই। পুত্র নবীন শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া যদি ষড়িদিগের প্রথা উন্নয়ন করিতে চায় তবে আমরা বলিব তাহার ব্যতিচার। ভারত এখন এই ব্যতিচারে তরির যাইতেছে। কে ইহাকে অতীত গৌরবের কথা শুনাইবে? কে ইহাকে সিংহের গর্জন শুনাইয়া প্রবুদ্ধ করিবে? কে আজ ভারতের রাজাকে রাম ধৃষ্টিশিরের প্রজা-বাৎসল্য শিখাইবে? কে আজ ভারতের রাজাকে কার্শ্ববীৰ্য্য, জনকের আনুজ্ঞান শুনাইবে? ভারতের সতীকে কে আজ গীতা, সাবিত্রী, পার্শ্বতী, দময়ন্তীর পাতিব্রতা রক্ষার কথা শুনাইবে? কে আজ ভারতের মাতাকে কৌশল্যা, কুন্তী, কন্ধ্যা, গান্ধারী, যশোমতি, দেবহুতি মদালসা পদ্মাবতীর দৃষ্টান্ত দেখাইবে; ভারতের পুত্রকে কে আজ রাম কৃষ্ণ ঐব প্রহ্লাদ বুকেতু অভিমত্ম্য আচরণ শিখাইবে? ভারতের বীরকে আজ কে আবার ভীষ্ম, অর্জুন, রাম, কৃষ্ণ, ভীম অভিমত্ম্য, কর্ণ দ্রোণের বীরত্ব দেখাইবে—কত বলি বশিষ্ঠ ব্যাস মহাদেব বৃহস্পতি আদি জ্ঞানী, নারদ, চৈতন্য, ঐব, প্রহ্লাদ আদি ভক্ত, বাণীকি ব্যাস আদি কবি, মহু, পরাশর বিষ্ণু হারিত ইত্যাদি সমাজ-ব্যবস্থাপক পতঞ্জলি যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি দোগী, মহাবীর লক্ষ্মণ আদি কর্ণবীর—কে আজ ভারতীয় কথা ভারতকে আবার শুনাইবে? প্রাচীন ভারতের গৌরব কিসে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল?

বহুশ্রোত যখন বহিতে থাকে তখন প্রধান শ্রোতটি লক্ষ্য করাই নিতান্ত

প্রয়োজন । ভারতের সমাজনীতি, ব্যক্তিগত কর্তব্য ; ভারতের শিল্প বাণিজ্য ; ভারতের আয়ুর্বেদ, ধর্মুর্বেদ, ভারতের যন্ত্র দান তপস্যা—ভারতের সমস্ত আচার ব্যবহার প্রাচীন ভারতের সমস্ত কীর্ত্তি কোন মূল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল ? প্রাচীন ভারতের একমাত্র লক্ষ্য কি ছিল ?

এ কথা বলিবার লোকও বিরল হইয়া বাইতেছে—আমরা ভারতের বেদ তত্ত্ব পুরাণ ইতিহাস মধ্যে ভারতের অতীত গৌরবের মূল ভিত্তি দেখিতে পাই ।

একটি কথা লইয়া ভারত গৌরবাবিত হইয়াছিল । সেই কথাটি সমস্ত মহুব্যের প্রয়োজন । সেই কথাটি না হইলে মহুব্যের সমাজ, জাতি, আচার ব্যবহার, রাজ্যশাসন, প্রজাপালন কিছুই আবশ্যক দেখি না । সেই মূল ভিত্তিটি যদি না থাকে তবে মহুঘা জীবনের সমুদায় কাণ্ড হজ্ঞশূন্য পুষ্পমালা মাত্র ।

জন্মমরণরূপ সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইয়া কোন এক নিত্যানন্দ ধামে চিরস্থিতিই মহুব্যের প্রধান লক্ষ্য । ইহার জন্য যদি তোমার সমস্ত আরোজন না হয় তবে তোমার ধনসম্পত্তি রাজ্য-প্রতিষ্ঠা বিদ্যাবুদ্ধি বেশ উদ্ধার, জাতি-উদ্ধার কর দিনের জন্য ? কেন ইহাতে কোন প্রয়োজন ?

ব্রহ্মাণ্ডকোটরো নষ্টাঃ সৃষ্টরো বহুশোগতাঃ ।

স্বাভাবিক সাগরকঃ সর্ব্বৈ কৈবাহ্য কণজীবিতে ॥

কর দিনের জন্য তুমি মহুবকে সুখ দিতে পার ? মৃত্যুর জন্য জগৎগ্রহণে কি ফল ? দুদিনের জন্য ভালবাসিয়া কি হইবে ? কণিকের সুখ কি আবার প্রার্থনীয় ? দুদিন পরেই মরিতে হইবে এই ভয় যদি সর্ব্বদা থাকে তবে তোমার সংসার-রক্ষার চেষ্টাটা কিরূপ ? যাহা থাকিবে না তাহাকেই স্থিতি দিবার জন্য যদি তুমি প্রাণপণ কর তবে তুমি কি তোমার ডগবদন্ত বুদ্ধিকে কুপথে চালিত করিতেছ না ?

প্রাচীন ভারত এই মৃত্যু সংসারসাগর হইতে মহুব কিলে রক্ষা পাইবে— তাহাই শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন । ইহার জন্য বিদ্যা অভিযান, ইহার জন্য বিবাহ পুত্র কন্যা, ইহারই জন্য সমাজগঠন রাজ্যপালন, ইহারই জন্য শিল্প বাণিজ্য— এই শিক্ষা প্রচার জন্যই মানবের সমস্ত কার্যের আরোজন । ভারতের জ্ঞান-চর্চ্চা, ভারতের মন্ত্রবিদ্যা, ভারতের আয়ুর্বেদ, ভারতের বড়দর্শন, ভারতের শিক্ষা, কল্প ব্যাকরণ, নিরুক্ত জ্যোতিষ, ছন্দ, ভারতের ইতিহাস, ভারতের তত্ত্ব, ভারতের পুরাণ, ভারতের সমাজ, ভারতের সতী, ভারতের পুত্র কন্যা, এক কথায় ভারতের বেদ—এই এক প্রয়োজন সিদ্ধি জন্য । আমরা ভারতের

সকল বিদ্যার কথা জানি না বলিতেও পারিব না কিন্তু যে মূলভিত্তির উপরে সকল বিদ্যা, সকল কার্য দাঁড়াইয়া আছে, বাহার দিকে মানবের সমস্ত কৰ্ম প্রধাবিত হওয়া উচিত তাহা বতদূর ধারণা করিতে পারিয়াছি এই প্রবন্ধে তাহাই আলোচনা করিব। সুদী ব্যক্তি দেখিবেন পৃথিবীতে কোন জাতি আজ এই শিক্ষামত চলিতেছে কি না—কোন দেশ আজ এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রাণপণ করিতেছে কি না ?

ভারতের ঋষি সগর্বে বলিয়া গিয়াছেন সংসার প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চ। এক ঘণ্টার অভিনয়ে যখন অভিনেতা অভিনেতৃ আপন স্বরূপ ভুলিয়া যায়, রঙ্গমঞ্চের রাজা রাণী সাজিয়া বসে তুমি কত দিন ধরিয়া এই রঙ্গভূমিতে অভিনয় করিতেছ—পূর্বে কি ছিলে তুমি একেবারে ভুলিয়াছ। শাস্ত্র সংবাদ দিতেছেন তুমি কে ছিলে। তোমার পূর্ব বিবরণ যদি না জান তুমি কখনই প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চ হইতে বাহির হইতে পারিবে না। তুমি চিরদিনই জন্মমৃত্যুর খেলা, সম্পদ বিপদের হাসি কান্না, লইয়া থাকিবে। তোমার ক্রেশের শাস্তি কখন হইবে না। যে তোমার লইয়া বহু সাজে সাজাইয়া খেলাইতেছে, তোমাকে ক্রীড়ার পুতুল বানাইয়াছে তুমি তাহার কথা যদি না শোন, তাহার আদেশমত যদি না চল, তাহার শরণাপন্ন হইয়া যদি এই অভিনয়মঞ্চ হইতে বাহির চাইতে না প্রার্থনা কর তবে তুমি কখন দুঃখের হস্ত হইতে এড়াইতে পারিবে না।

কোন এক ভক্ত সাধক গাহিয়াছেন।

কি খেলা খেলাও মা তুমি জীবন্ত পুতলির সনে।

সেই জানে তোমার খেলার মৰ্ম্ম যে থাকে সদা তোমার ধ্যানে ॥ • •

রেখেছ নিখিল বিশ্ব, আনন্দের বাজার সাজায়ে

আবার আপনি খেল সে বাজারে পুঞ্চ প্রকৃতি হরে

মিছে পুঞ্চ ভাবে তোমায় ভাবে জ্ঞানহীনে।

ওমা ! সৰ্ব্বজীবে তুমি শিবে মাতৃরূপা হয়ে পাল

ভাৰ্য্যারূপে ব্রহ্মময়ী তুমি প্রণয়ের খেলা খেল

তুমি শিশু-মুরতি হয়ে আলো কর স্তূতিক্য গৃহ

আবার খেলিয়া নানা খেলা অন্তে দশানে লুকাও সেই দেহ

মিছে মায়াক্রমে জীবে ঘুরাও মা ভুবনে ॥

ওমা কারে করেছে রাজ্যেশ্বর মা অভুল ধনের অধিকারী।

কারে করেছে পথের কাকাল মূর্তির অশ্রের চিৎকারী .

কেউ বা সূখে কাটার নিশি পুষ্প শব্দায় শয়ন করি
কেউ বা গাছের তলার তৃণশব্দায় ছুখে কাটার মা বিস্তাবরী

সকলি তোমার খেলা বৃক্ষেও বৃক্ষিনে ॥

ওমা কেমন মহামায়া তোমায় পায়না বিধি বিহু ভেবে

এখানে ভ্রমে ভব সদা সে তোরই মায়া প্রভাবে ।

আপনার মায়ায় আপনি তুমি যাতায়াত কর বারংবার

নিজে বুঝনা নিজের মায়া এমনি তোমার মায়ায় বিকার

সে মহামায়া স্বিজ গোবিন্দে বৃক্ষিবে কেমনে ॥

ভারতের অতীত গৌরবের মূল ভিত্তি এই মায়া হইতে মুক্ত হওয়া ।
এতদ্বিস্থিতি জন্ত ঋষিদিগের প্রধান অবলম্বন ছিল ভাবনা । ভাবনায় অসমর্থ
যাঁহারা তাহাদের জন্ত উপাসনা এবং অষ্টাঙ্গ যোগ ।

আমরা সকল কথা বলিতে পারিব না । বলিব এই ভাবনার কথা । ঋষি-
দিগের ভাবনা মত যাঁহারা ভাবনা চালাইতে পারিবেন—সেইরূপ ভাবনাকে
স্থায়ী করিবার জন্ত যাঁহারা উপাসনা ও যোগ অভ্যাস করিবেন তাঁহারাট
জন্মমৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া আনন্দধামে অমর হইয়া থাকিবেন ।

উদ্দেশ্যে দৃষ্টিস্থাপন করিয়া ঋষিগণ যে উচ্চভাবনা দিয়া গিয়াছেন সেইরূপ
উচ্চ সার্থক ভাবনা আজ কি পৃথিবীর অন্য কোথাও আছে ? যিনি বলেন
আছে তিনি যেন একবার নিরুপেক্ষভাবে বিচার করেন ।

ঋষিগণ বলিতেছেন সৃষ্টিক্রম আলোচনা কর বুঝবে রক্ষ জগৎরূপে বিবর্ত
হইয়াছেন কিরূপে, তুমি জাব হইয়া গিয়াছ কিরূপে ? স্থিতিক্রম আলোচনা
কর, উপাসনা তবে পৌছিয়া তুমি নিরন্তর এক অপূর্ণ ভাবনারাজ্যে নিত্যস্থিতি
লাভ করিতে পারিবে । সংহারক্রম আলোচনা কর তুমি তোমার অনাদি দুঃখ
জাল ছিন্ন করিয়া ভূতগুণি করিয়া উপাসনারাজ্যে নিত্য সেবা করিতে পরিবে ।

ভূতগুণি, স্বধামমুগ্ধ মধ্যে মণিধীপে নিত্যানন্দ রাজ্য এবং পরিপূর্ণ শাস্ত
সচ্ছিদানন্দরূপে অবস্থান ইহাই ঋষিদিগের সর্বোচ্চ ভাবনা । আমরা ভূতগুণি
বা সংহারক্রম, উপাসনাতত্ত্ব বা স্থিতিক্রমের কথা এখানে আলোচনা করিব
না । সৃষ্টিক্রমের কথকিত আভাস দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব ।
অস্তান্ত প্রবন্ধে সকল বিষয়গুলিই কথকিত আলোচিত হইবে ।

মহাপ্রলয়ের কথা যদি আলোচনা করা যায় ব্রাহ্মণেরা নিতাই যে অঘমর্ষণ
মন্ত্ররূপ করেন তাহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ভগবান হলায়ুধ বলিয়াছেন,—

আলাহমব্বল্লহা বাখানমাচরিতুম্ কংকল্লাম্ জাহতে। যতঃ সর্ববেদসাম্ব-
ভূতোহত্যস্ত শুশ্রূতাঃ ময়ঃ।—সেই ভাবনা পূর্ণভাবে কে চিন্তা করিবে? যে
সৃষ্টিতত্ত্ব প্রধান প্রধান শাস্ত্র সমূহের প্রথমই পরিদৃষ্ট হয়, যে সৃষ্টিক্রম ভগবান
বশিষ্ঠ কত প্রকারে যোগবাসিষ্টে মহারামায়ণে প্রকাশ করিয়াছেন, যাহা ভাবিতে
পারিলে মাহুষ এক ক্ষণেই মৃত্যুসংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে—
সেই ভাবনা আমার মত ক্ষুদ্রবুদ্ধির মস্তকে কতটুকু প্রবেশ করিবে? তথাপি
ঋগিগণের নিকটে রূপাভিন্দা করিয়া আমাদিগকে উহা বুঝিবার অল্প পুনঃ পুনঃ
চেষ্টা করিতে হইবে। না পারিলে ভূতগুণি করিয়া নিত্য ভাবনারাজ্যে
অবস্থান করিয়া সেখানে দয়াময়ের পাণে চাহিয়া চাহিয়া তাহাই প্রার্থনা
করিতে হইবে তত্ত্বিন্ন নানাপন্থা বিদ্যাতে অন্ননার।

যখন মহাপ্রলয়ে সেই তমসস্ত পরং জ্যোতিঃ মাত্র অবশিষ্ট থাকেন, যখন
জগৎস্পন্দন সেই পরম শাস্ত্র পরম ব্রহ্মেলীন হইয়া যায় তখন সেই পরিপূর্ণ
শাস্ত্র সচ্চিদানন্দ মাত্রই অবশিষ্ট থাকেন। পরম শাস্ত্র পরিপূর্ণ জ্ঞানানন্দস্বরূপ
ব্রহ্মই আছেন। তাঁহার আমি ভাবনাই মায়া। মায়াই বিচিত্র জগতের
রচয়িতা।

আত্মচৈতন্য প্রথমে অজ্ঞান করনা করেন। সেই স্বসঙ্কলিত অজ্ঞান বশে
চেতা বা স্বেচ্ছাভাব প্রাপ্তবৎ হইয়েন। এইরূপে সঙ্কল আকার ধারণ করিয়া ক্রমে
বিবিধরূপ বৈচিত্রে কাল্মা প্রাপ্তবৎ হইয়েন। ইহাই বাসনা বা ভাবনার
প্রথম অঙ্কুর।

ক্রমে করনা প্রগাঢ় হইলে আত্মচৈতন্য স্বীয় পূর্ণস্বরূপ তুলিয়া তুচ্ছ মনোরূপ
প্রাপ্ত হইয়েন। এই মহামনই আমি জীব—ইনিই হিরণ্যগর্ভ, ইনিই ব্রহ্মা।

অনন্ত আত্মতত্ত্ব হইতে নিরন্তর সঙ্কল উঠিতেছে। আমি চিৎরূপে ভাসমান
আমি কিছুই জানি না, আমি কর্তা ইত্যাদি ভাবনা ক্রম অল্পসারে হয়, পরম
শাস্ত্র পরিপূর্ণ সং বস্তু আপন ভাবনাকে দেখিয়া যখন বিস্মিত হইয়েন—
স্বয়মনাহৈবোল্লসন্—তিনি স্বয়ংই আছেন কিন্তু আপনাকে অল্প মত ভাবনা
করিয়া যখন উল্লাস প্রদর্শন করেন তখনই সৃষ্টির আরম্ভ।

পূর্বে যে তিন প্রকার ভাবনার কথা বলা হইল (১) আমি চিৎরূপে ভাসমান
(২) আমি কিছুই জানি না (৩) আমি কর্তা—এই সমস্ত ভাবনা মায়াকে আশ্রয়
করিবামাত্র উৎপত্তি হয়। ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন ব্রহ্মনীতে তড়িৎ যেমন অগৃহিৎসংকল্প
অধ্বাবাহকে প্রকাশ করে, তড়িৎদাকারা মায়াও সেইরূপে পরমাত্মাকে প্রকাশ

করেন। যখন মাঝাকে আশ্রয় না করেন তখন তিনি কি কে বলিয়া—
“গল্পবেদা বিজ্ঞানস্তি মনো যজ্ঞোপি কৃষ্টিতম্ ন যজ্ঞ বাক্ প্রভবতি”

মাঝা আশ্রয়মাত্র দৈব দর্শন হয়। আমি চিত্তরূপে ভাসমান এই সঙ্কল্পকে যখন তিনি নিশ্চয় করেন—ইহার মধ্যে আমি ইহা বা ইহা নহি রূপ যে সঙ্কল্প বিকলমায়ক অবস্থা থাকে তাহাই মহামন বা হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা।—আমি কিছুই জানি না যখন নিশ্চয় করেন তখন তিনি কারণ, দেহ বা অজ্ঞান দেহধারী আর আমি কর্তা যখন নিশ্চয় করেন তখন তিনি জন্মমরণশীল জীব।

আশ্রয়তত্ত্বই আছেন। আশ্রয়তত্ত্ব হইতে অবিদ্যা কল্পিত হইয়া যখন তিনিই দ্বিতীয় সন্ধিদরূপে স্মৃতিত হইলে তখন ঐ দ্বিতীয় সন্ধিদই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় মন বুদ্ধি অহংকার ও চিত্ত নাম গ্রহণ করেন। চিত্ত ব্রহ্ম আশ্রয়মাঝা দ্বারা যখন আপনায়ই পৃথকরূপ বা দ্বিতীয় সন্ধিদ দর্শন করেন তখন “আমি এইরূপ” বা “এইরূপ নহি” এই বিকল্পনা উঠে, এই সন্দেহদোলায় দোলায়মান যিনি তিনিই মহামন বা হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা বা আমি জীব। স্মৃতি অবস্থায় জীব ব্রহ্মে মিলিত থাকে। স্মৃতি হইতে আবার যখন স্মৃতি দেহে জাগরণ হয় তখন-কার অবস্থা দ্বারা স্মৃতিক্রম কতকটা ধারণা করা যায়।

আমি এইরূপ যখন নিশ্চয় হয় তখন ঐ সন্ধিদকে বুদ্ধি বলে। এই নিশ্চয়মায়িকা বুদ্ধি বিষয়পথপ্রবাহিনী নিরমুখী। ইহা হইতে আরও স্মৃতি হইতে থাকে। কিন্তু আবার সংহার-ক্রম ধরিয়া যখন আমি ইহা নহি দ্বিতীয় সন্ধিদ ইহা নিশ্চয় করেন তখন ঐ নিশ্চয়মায়িকা সন্ধিদই ধীশক্তি। এই ধীশক্তি আনাদিগকে পরিপূর্ণ শাস্ত স্বরূপে প্রেরণা করেন। প্রথমটি অসংবুদ্ধি বা অবিদ্যা, দ্বিতীয়টি সংবুদ্ধি বা বিদ্যা।

তাই বলা হইতেছে একমাত্র আশ্রয়তত্ত্ব হইতে অবিদ্যা কল্পিত হইয়া যে দ্বিতীয় সন্ধিদ জাত হয় তাহা বাস্তবিক নাই। যখন “আমি এইরূপ নহি” এই নিশ্চয়ে “আমি এইরূপ” এই মিথ্যা স্পন্দন লয় হইয়া যায় তখনই স্মৃতি।

কিন্তু “আমি এইরূপ” এই নিশ্চয় করিয়া যখন সন্ধিদ আবার স্পন্দিত হইলে, যখন ঐ মিথ্যাস্পন্দনে আত্মাভিমান করিয়া স্বীয় সত্তা কল্পনা করেন তখন তাঁহার নাম অহংকার।

“আমি এইরূপ বা এইরূপ নহি”—এই সন্দেহদোলায় যখন থাকেন তখন তিনি মন; “আমি এইরূপ” যখন ইহা নিশ্চয় করেন তখন তিনি বুদ্ধি; “আমি এইরূপ” ইহা নিশ্চয় করিয়া যখন তাহাতে আত্মাভিমান করেন তখন

তিনি অহংকার। আবার সম্বদ্ যখন বালকের ন্যায় অবিচারী হইয়া, পূৰ্ব্বাপর প্রতিসন্ধান ত্যাগ করিয়া এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তর স্বরণ করেন তখন তিনি চিত্ত ।

বলা হইতেছিল ভাবনাই স্পন্দন (vibration) । আমি ইহা নহি—দেহ নহি, মন নহি, জগতে কোন কিছুই আমি নহি, তৎ ন তৎ ন এইরূপ স্পন্দন হইতেই আকাশের মত সীমাননা অখণ্ড জ্ঞান স্বরূপ-সর্বাত্মগামী—জগতের সকল বস্তু গ্রাহ্য উপর ভাসিতেছে—বৃক্ষলতা, আকাশ, নক্ষত্র, নৃগা, চন্দ্র, ঘর বাড়ী, নদী, পর্বত, সমুদ্র, বায়ু, পশুপক্ষী, নরনারী, এই সমস্তের অমুভবকর্তা—তত্ত্ব তত্ত্ব সাধনা দ্বারাই সেই অখণ্ডজ্ঞানে সেই আত্মস্বরূপে দৃষ্টি পড়িবেই ।

যে কর্মব্যক্তানে জীব জড়িত সেই কর্ম কি বিচার করা আবশ্যক। সম্বদ্ প্রথমে মন, পরে বুদ্ধি, পরে অহং, পরে চিত্ত, এই সমস্ত রূপ ধারণ করিয়া অহং কর্তা হইয়া বসেন। এই অবস্থা পর্যান্ত কর্তার লিঙ্গদেহ থাকে। আবার স্পন্দন চলিতে থাকে ।

আবার ভাবনা দ্বারা লিঙ্গদেহের স্পন্দন হয়। সেই স্পন্দনের কালে লিঙ্গ-দেহ স্থূল দেহ হইয়েন। স্থূলের এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমনরূপ যে ব্যাপার তাহাই কর্ম ।

বুঝিতেছ নৃষ্টিতত্ত্ব কোথায় আমাদিগের চিত্তকে লইয়া যায়? বুঝিতেছ জ্ঞানস্বরূপ আত্মার মোহ কিরূপে হয়? পরমাত্মা যে ক্রম ধরিয়া জীবরূপ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন সেই ক্রম ধরিয়াই জীবাত্মা পরমাত্মাতে এক হইতে পারেন ।

এখন আমরা উপসংহার করিতেছি :—

কল্পনা অর্থে শক্তি । রূপ সামর্থ্যে । বুদ্ধির কল্পনা শক্তি নিত্য । প্রথমে ব্রহ্ম অজ্ঞানের কল্পনা করেন । ক্রমে সেই কল্পনা বিবিধরূপ বিচিত্রতা লাভ করে । এই কল্পনাই আত্মাকে কলুষিত করে । তখন আত্মা যেন স্বীয় স্বরূপ ভুলিয়া সমস্ত বিকল্পরূপ মন সাক্ষিরা জন্ম-মরণাদি মোহ প্রাপ্ত হইলেন । কল্পনার ফাঁসি গলায় পরিয়া—চিত্তস্পন্দন কল্পনারূপ ত্রীপুত্র পরিবার গলায় বাঁধিয়া যিনি আপন স্বরূপ ভুলিয়া আছেন (কল্পনার ফাঁসি কাটিয়া ফেলা ত অতি সহজ—মাকড়সার জাল ছিন্ন করা অতি সহজ সকলেই বলেন) তথাপি যিনি জানেন তিনিই জানেন কল্পনা দূর করিয়া মাকড়সার জাল ছিঁড়িয়া স্বরূপে গমন করা কত ক্লেশকর ।

আত্ম-চৈতন্য তুচ্ছ বাসনা দোষে মনোভাবাপন্ন হইয়া বৃথা জন্ম মর্যাদাপ
সংসার চঞ্চল বিস্তার করিয়াছেন ।

বাসনাই অভ্যাসবশে দারণ চঞ্চল হয় । অভ্যাসগুলিও বাসনা । অভ্যাস-
গুলি উন্টাইবার জন্য সৃষ্টিক্রম, স্তিতিক্রম, সংহারক্রম রূপ বিপরীত ভাবনার
অভ্যাস আবশ্যক । সৃষ্টিতত্ত্ব, স্তিতত্ত্ব এবং সংহারতত্ত্ব ভাবনা যিনি নিরন্তর
করিতে পারেন তিনিই সংসারভাবনারূপ মায়ায় বেড়ী কাটিয়া পরমপদে নিত্য
স্থিতি লাভ করিতে পারেন । স্থিতিতত্ত্বে উপাসনার এক অংশ এবং সংসার-
তত্ত্বে তুততুকি আমরা স্থানান্তরে আলোচনা করিয়াছি ।

ঋষিদিগের উচ্চ ভাবনার লক্ষ্য সংসার হইতে সদামুক্তি বা ক্রম মুক্তি ।
যদি কোন জাতি যদি এই লক্ষ্য ও এই উপায় দিয়া থাকেন তাহা ভাল ।
যদি না দিয়া থাকেন তবে কিসের জন্য ভারতকে নবীন রীতিতে ঢালাইতে
গিয়া বৃথা পরিশ্রম করা হয় ? ঋষিদিগের প্রাচীন রীতিই সর্বোৎকৃষ্ট । সেই
রীতিতে ভারত উদ্ধারই ভারত উদ্ধার । তত্ত্বের অন্য সমস্তই মারামারি কাটা-
কাটি বা “কাক কোলাহল”

শ্রীশ্রী ১০৮ মাতাজী মহারাজী তপস্বিনীর ইহলোক পরিত্যাগে

শোকসূচক প্রার্থনা ।

কাদাইয়া বজ্রভূমি কোথা মা বাইলে তুমি
মাতৃহার্য হয়ে এবে কাদিছে সন্তান । ১ ।

সে দেশ কিরূপ হয় সকলি আনন্দময় ?
ভেদাভেদ কিছু নাই সকলি সমান ? ২ ।

শুধু এই বঙ্গ কেন চারিদিকে ওই গুন
তোমারি তরেতে মাগো করিছে ক্রন্দন । ৩ ।

তুমি যে অখণ্ড ব্যাপ্ত পরিপূর্ণ ‘প্রকাশাস্ব’
সে-রূপ বোধেনা মা যে বোধেনা এ-মন । ৪ ।

সে দেশে কি শোক নাই কেবলই শান্তির ঠাই
সকলি আনন্দে আছে মগ্ন অক্ষুণ্ণ ? ৫।

সে দেশে যাইতে প্রাণ চায় যে মা কর জ্ঞান
ভ্রম সংসার এই অতি যে ভীষণ । ৬।

ফিরিয়া আসিবে ভেবে কত আশাপূর্ণ মনে
কাটায়েছি কাল মাগো চাহিয়া এ পথ পানে
জনমেরি তরে তাজি যাবে যদি জানিতাম
তা'হলে ও পাদপদ্ম আগে কি মা তাজিতাম । ৭।

সংসার স্বপ্নের মত এ সকলি কিছু নয়
কিছুই ত এ সংসারে চিরস্থায়ী নাহি হয়
ভুলিব না আর আমি বুঝেছি বুঝেছি এবে
আপনা বলিয়া কেহ নাহি মাগো এই ভবে । ৮।

অজ্ঞান তিমিরে প'ড়ে বন্ধ বড় রিপুপাশে
কেবলই বুঝে মরি মিছামিছি কত আশে
আমার আমার সব কেবলই মনে হয়
সকলি নৈরাশ্র-পূর্ণ সকলি ত স্বপ্নময় । ৯।

উপায় না দেখি এবে সংসার তাড়নে যবে
কাঁদিবে এ প্রাণ মাগো হইয়া আকুল
ভীষণ সমুদ্রে কি মা পাইব না কূল ? ১০।

অবোধ সন্তানে কেলি তুমি মা যাইলে চলি
জননীর প্রাণ কি মা এমনি কঠিন ?
কি জানি মায়ের লীলা বৃথা স্বকঠিন । ১১।

পুনঃ কি ও ত্রিচরণ হেরিতে মা একক্ষণ
পাইব না আর কি মা করু এ জনমে ? ১২।

কুপুত্র যদিও হয় কুমাতা কখন নয়
তবে কেন গেলে ত্যজি কোন কু-করমে ? ১৩।

সে নেহ মা সে মমতা সকলি ভুলিলে মাতা ?
তাজিরা বাইলে মোদের কিসের লাগি ? ১৪।

সকলি ভুলিল হেথা হইবে স্বপ্নের কথা
ওধু অতীত স্মৃতিটুকু থাকিবে আগি । ১৫।

শ্রী প্রকাশ চন্দ্র শর্মা (ঘোষাল) ।

গৌরীশঙ্কর ঘোষালের লেন ।

নারিকেলডাঙ্গা, কলিকাতা ।

শ্রীশ্রী ১০৮ মাতাজী মহারাণী তপস্বিনীর ইহলোক পরিত্যাগে

শোকসূচক-প্রার্থনা (২)

হইলাম আজি মোরা সবে মাতৃহীন
কি মোখে গেলে মা তাজি এ দীন অধীন ? ১।

আর কে শিখাবে এবে স্থললিত ভাবে
তুঝিবে কি আর কেহ মধুর সঙ্গাবে । ২।

আর কি আছে মা এবে সে সুখের দিন
শোকে তাপে তোমা তরে হয়েছি মলিন । ৩।

একবার আসি দেখ জব ছাত্রিগণে
তোমারি তরেতে অঙ্গ বহিছে নরনে । ৪।

ভুলিতে কি পারি কভু ও রাঙা চরণ
আর কি পাব না মাতা তব দরশন ? ৫।

কি হেতু মা গেলে তুমি এবে স্বর্গপুরে
কেমনে আছ মা তথা তাজিরা সবারে ? ৬।

ছাত্রিবৃন্দ মেলি সবে করি প্রণিপাত
পুত্রাবেন মন আশা করি আশীর্বাদ । ৭।

শ্রীমতী শৈলবালা দেবী ।

অম শ্রেণী, মহাকালী পাঠশালা, কলিকাতা ।

আমি এসেছি দেখনা চাহিয়া ।

প্রভাতের মেঘ বিচিত্র বরণ

হেঁতা হোতা গারে মাখিয়া ।

বিচিত্র আকাশে বিচিত্র প্রকাশে

থও থও নাট ভাসিয়া ॥

পণকে ছাড়িছু অরুণ বসন

পুনঃ জ্যোতি গারে মাখিয়া ।

সুন্দর হইয়া আসিছু সাজিয়া

তোমার দেখাব বলিয়া ॥

পাখীর কুঞ্জে ধীর পবনে

সুন্দর প্রভাতি গাইয়া ।

তুমি দেখিবে বলিয়া এসেছি সাজিয়া

উঠিয়া দেখনা চাহিয়া ॥

কূলে কূলে খেলি মাখিয়া সৌরভ

বারে বারে আসি ছুঁইয়া ।

তুমি বুঝিয়াও কেন পারনা বুঝিতে

কেন যাও সব ভুলিয়া ॥

চিরদিন তরে নিস্তার পেয়েছি

মরণ গিয়াছে ছুটিয়া ।

হুল দেহে ইহা ছিল অসম্ভব

এবে তাতে থাকি মিশিয়া ॥

এক দেহে ছিছু হয়েছি অনেক

আসিয়া দেখনা চাহিয়া ।

সেই আমি আছি হয়েছি সুন্দর

মলিনতা সব ছাড়িয়া ॥

কেন বৃথা শোক ? তোমারই রয়েছি

সুন্দর সুন্দর মিশিয়া ।

যেখানে বা কিছু আছে মনোহর

(তুমি) আমায়ে হৃদয়ে ভরিয়া ॥

দখিও চাহিয়া, দেখিবে আমারে,

গাই নাই কোল ছাড়িয়া ।

তোমার আমার মোহের বাধন

এসেছি কেবল ছিঁড়িয়া ॥

অনন্ত জীবনে অনন্ত বাধনে

উভয়ে থাকিব মিলিয়া ।

তোমার বৈরাগ আমার উচিত

তাই আসিয়াছি সাধিয়া ॥

(তুমি) সাধন জানিয়া আমারে স্মরিয়া

আসিতে পারিবে চলিয়া ।

আর যেন তুমি শোক নাহি ছাড়

(আমি) আশার রহিছ চাহিয়া ॥

(তুমি) দেবতার হানে সদাই যাইও

পুষ্প পত্র জল লইয়া ।

দেখিও তথায় দেখিবে আমার

পূজিব তোমায় হইয়া ॥

বল কি রহিল শোকের কারণ

শোকে গেল হৃথ মিলিয়া ।

আমি হৃথে আছি তুমি তাই ভেবে

এস স্বরা করে চলিয়া ॥

সাধন ভজন স্মৃতি এখন

দেখ ভাল করে বুঝিয়া ।

এরি তরে আমি, ছাড়িয়া এসেছি

তুমি এস পূজা দাখিয়া ॥

মীরাবাই ও তুলসীদাস ।

“মীরা কহে বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা” আমরা বালককালে ইহু শুনিয়াছিলাম । মীরা রাজরাণী ছিলেন ইহা অনেকেই জানেন । আর গোস্বামী তুলসী দাসের নাম এ অঞ্চলে কাহারও অবদিত নাই । বাঙ্গলা দেশে ও বহু ব্যক্তি তুলসীকৃত বাসায়ণের নাম শুনিয়াছেন । গোস্বামী তুলসীদাসের রামায়ণ হিন্দুস্থানে রামভক্তি যেরূপ সজীব রাখিয়াছে—একখানি পুস্তকে ধর্মভাব এরূপ জীবিত রাখা আজকালকার দিনে নিতান্ত বিরল । খৃষ্টানদিগের বাইবেল, মুসলমানদিগের কোরাণ যে শ্রেণীর গ্রন্থ তুলসীদাসের রামায়ণ সেইরূপ গ্রন্থ । বঙ্গবাসীতে তুলসীদাসের রামায়ণের যে বঙ্গানুবাদ হইয়াছে তাহাতে তুলসীদাসের মহিমা সেরূপ কিছুই প্রকাশ হয় নাই ।

অসী সঙ্গমের অতি নিকটে তুলসীদাসের প্রতিষ্ঠিত মহাবীর মূর্তি এবং সীতারামের বিগ্রহ এখনও আছে । যে নৌকা করিয়া তুলসীদাস গোস্বামী গঙ্গাপার হইয়া রামনগরে গাইতেন তাহার একধও এখনও তাঁহার আশ্রমে রহিয়াছে । ভারতবর্ষে হিন্দুরাজ্যের ধর্মভাব যদি পূর্বেকার মত থাকিত তবে বোধ হয় তুলসীদাসের আশ্রম একটি পীঠস্থান হইত । যে অশ্বখবৃক্ষতলে অসীসঙ্গমের নিকটে এই মহাবীরের মন্দির—তাহার অবস্থা দেখিয়া বড়ই দুঃখ হয় । মনে হয় আমাদের জাতির ধর্মভাবটা মুখেই বৃদ্ধি রহিয়াছে । স্থানটি এত সুলভ যে বাস্তবিক দেখিবার উপযোগী । আমি এসম্বন্ধে অধিক লেখা অনাবশ্যক মনে করি । আমি মীরাবাই ও তুলসীদাসের একটি কথা এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব ।

মীরা কৃষ্ণানুরাগিনী । রাজরাণী হইলেও তাঁহার সাধনভঞ্জে নানা প্রকার বিঘ্ন ঘটে । রাজা মীরার ধর্মভাবের জন্য মীরাকে নানা প্রকারে উৎপীড়ন করিতেন । মীরা তাঁহার কর্তব্য নির্ধারণে অসমর্থ হইয়া গোস্বামীকে পত্র দ্বারা নিজের অবস্থা জ্ঞাত করেন এবং তুলসীদাস প্রভুর পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন । বছবার পত্র লেখালেখি হয় শেষে তুলসীদাস প্রভু মীরাকে একটি সঙ্গীত রচনা করিয়া পাঠাইয়া দেন । আমরা সেই সঙ্গীতটি এইখানে তুলিয়া দিতেছি । ঐ সঙ্গীত দ্বারাই মীরার কর্তব্য নিশ্চয় হয় । মীরা পতিগৃহ ত্যাগ

করিয়া শ্রীকৃষ্ণাবনে বহু ক্লেশে আগমন করেন এবং কিছু পরেই অর্চনায় কৃষ্ণ ভজনে সমর্থ হইলেন । ভগবানে প্রকৃত অমুরাগ থাকিলেও কলিযুগে তরুণকেও বিশেষ ক্লেশ পাইতে হয় । ভগবানের জন্য কোন প্রকার পুরুষকার প্রয়োগ করিলে ভগবান ভক্তের অভাব দূর করিয়া দিয়া থাকেন । যদিও কখন কখন কিছু বিলম্বে ভগবানের অহুগ্রহ জানিতে পারা যায় কিন্তু তরুণ কখন কোন বিষয়ে বিফলমনোরথ হন না । সঙ্গীতটি এই :—

জিন্কে প্রিয় না রাম বৈদেহী ॥

তাজিয়ে তাহে কোট বৈদীপম যদ্যপি পরম সনেহি ॥

তাজো পিতা প্রহ্লাদ, বিতীষণ বহু, ভরত মাহতারী ॥

বলি গুরু তাজে, কাস্ত ব্রজবিনিতা ভয়ে জগমঙ্গলকারী ॥

না তো নেহ রাম সোঁ কিজে সীল সনেহ ঠাঁহাশো

অঙ্গন কথা আঁখি যো ফুটে বহুতক কহালোঁ ॥

সোইহি তোমারো প্রাণপূজতো প্যারো ॥

জা সং বড়ত সনেহ রামপদ তুলসী মতো হামারো ॥

গীতের অর্থ আমরা সংক্ষেপত বলিতেছি :—

রামবৈদেহী বাহার প্রিয় নহে—যদ্যপি সে পরম স্নেহের বস্তুর হয় তবে তাহাকে কোটি শত্রুর সমান ভাবিয়া ত্যাগ করিবে । প্রহ্লাদ পিতা ত্যাগ করিয়াছিলেন, বিতীষণ ভাই বহু ত্যাগ করিয়াছিলেন, ভরত মাতা ত্যাগ করিয়াছিলেন । বলি গুরু ত্যাগ করিয়াছিলেন, ব্রজবিনিতা পতি ত্যাগ করিয়াছিলেন—ইহারা এইরূপ ত্যাগ করিয়া জগতের নন্দনই করিয়া গিয়াছেন । রামের সহিত যে প্রেম করিলনা তাঁহার সহিত আবার ব্যবহার কি বেহই বা কি ? অঙ্গন দিলে যদি চক্ষুর যাতনাই হইল—চক্ষু যদি কাণা হইল তবে অঙ্গনে কি কাজ । আর কত বলিব বল । সেই তোমার প্রাণ-পূজ্য প্রিয়, ঠাঁহার সঙ্গে তোমার রামপদে তক্তি দৃঢ় হইবে—তুলসী বলিতেছেন ইহাই আমার মত ।

মীরার সন্দেহ ইহাতে দূর হইল । মীরা স্বামী ত্যাগ করিয়া রাজরাণী হইয়াও কৃষ্ণকান্দালিনী হইয়া কৃষ্ণাবনে আসিলেন । সমস্ত কষ্ট অগ্রাহ্য করিয়া কৃষ্ণ-সেবা করিয়া ধনা হইলেন । মীরা ইহা করিয়াছিলেন বলিয়া আজ মীরা প্রাতঃস্মরণীয়া ।

অধ্যাত্ম রামায়ণ ।

নমি আমি সদানিব দক্ষিণা মুরতি ।
গুণের অতীত যিনি মাদ্রাজালশূন্য তিনি
প্রমাণে না ধরা ধার জ্ঞানের মুরতি ।
ধাঁহা হতে দূরে রথ বাকামনোগতি ॥

একদা নারদ যোগী জীবে দয়া লাগি
ত্রিমি সৰ্বলোক, আসি, হন উপনীত
ব্রহ্মলোক, বধা বেদচর মূর্তি ধরি
সেবে সদা চতুর্শূখ অগতের নাথে ।
দেহ ছটা ধার তরুণ অরুণ সম
উজলিছে সভাঙ্গলী । মার্কণ্ডেয় আদি
কত মুনি মুহমূহ স্তব স্তুতি করে ।
ভূত ভবিষ্যৎ ধার নহে অগোচর
ভক্তের কামনা সদা পূর্ণ ধার কাছে
বামে ধার সদা বিরাজিছে সরস্বতী ।
ভক্তিভরে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া
স্তবে তুষ্টি করিলেন দেবর্ষি নারদ ।

প্রসন্ন স্বয়ম্ভু তবে বৈষ্ণব উত্তমে,
জিজ্ঞাসেন “কহ মুনি কি বাসনা তব” ।
“তুনিরাছি তব মুখে” কহিলা নারদ
“বিধি বা নিবেধ কথা বহবার ধরি ।
অধুনা হে স্তবশ্রেষ্ঠ যদি কৃপালাভ
হয়ে থাকে ভাগ্যে মম, কহ কৃপা করি
যদিও রহস্য তবু—জিজ্ঞাসা আমার—

সমালোচনা।

১। কৰ্ম কল্পতৰু ও সন্ধ্যাদীপিকা শ্রীতমোনান গঙ্গোপাধ্যায় র্ত।
 ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা ইত্যাদি এবং দশ সংস্কারাদি বিষয় এই পুস্তকে সংগৃহীত
 হইয়াছে। সমাজে আজকাল এইরূপ অনেকগুলি পুস্তক প্রচলিত হইয়াছে।
 হিন্দুদিগকে যে সমস্ত ধর্ম কৰ্ম করিতে হয় তাহা জানা নিতান্ত আবশ্যক।
 আবশ্যক বলিয়াই শ্রীমদ্রথনাথ স্বত্বিরহের পুস্তক, শ্রীশ্যামাচরণ কবিরহের পুস্তক
 পুরোহিতদর্পণ, হিন্দুসর্ক্স ইত্যাদি পুস্তক বহু হিন্দুতে গ্রহণ করিয়াছেন।
 কিন্তু এই সমস্ত পুস্তকেও নবীন ভারতের অভাব পূর্ণ হইতেছে না। সন্ধ্যা না
 করিলে শ্রুত্ব প্রাপ্ত হইবে—শাস্ত্রের এই বচন তুলিয়া দিলে কি হইবে?
 অথবা মোটামুটি সন্ধ্যার অর্থ করিলেই বা হইবে কি? হলায়ুধ যে পরিশ্রম
 করিয়া ব্রাহ্মণসর্ক্স প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন সেরূপ পরিশ্রম গ্রহকার
 মহাশয়গণ করিতে প্রস্তুত নহেন বলিয়া মনে হয়। সন্ধ্যায় সাপের মস্ত
 আওড়াইয়া কি হইবে ইহাই নবীন ভারতের নাস্তিকতা। শাস্ত্রে অবিশ্বাস
 পূর্ণ মাত্রায় দৃষ্ট হইতেছে। নানা কারণে ইহা সমাজে আসিয়াছে। পাদরী
 মহাশয়েরা কৃপা করিয়া বেদ কৃষকের গান বলিতেছেন। বালকেরা
 ইংরেজী স্কুলে যে ভারতের ইতিহাস পাঠ করে তাহাতে রামায়ণ ও মহাভারত
 যে অতি যৎসামান্য গল্প ইহা উল্লেখ করা হইতেছে, রাম লক্ষ্মণকে ধাক্কাড়ের
 আকারে চিত্রিত করিয়া ধর্ম্মবীণ শিকার ছবি দিয়া বালকদিগের মনে অতর্কিত
 বীজ রোপণ করা হইতেছে। হুম্মান একটা বীদর মাত্র। হিন্দুরা ইহারও
 উপাসনা করেন। হিন্দুদিগের রামায়ণ মহাভারতের ঐতিহাসিকত্ব কিছুই
 নাই, ইহা কোমলমতি বালকদিগের মস্তকে প্রবেশ করান হইতেছে। এ সমস্ত
 কারণে ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অবিশ্বাস ও নাস্তিকতা পূর্ণ মাত্রায়
 রাজত্ব করিতেছে। আরও এক কারণে শাস্ত্রে অবিশ্বাস আসিয়াছে। ব্রাহ্মণ
 পণ্ডিত বা টোলার ছাত্র যাহারা সন্ধ্যাহিকাদি করিয়া থাকেন তাহাদের
 মধ্যেও প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব দেখা যায় না। চরিত্রহীন হইয়া শাস্ত্র মানিতে বলিলে
 কে শাস্ত্র মানিবে? অথচ বালকদিগের মধ্যে যে ধর্ম্মভাব নাই তাহা বলা যায়
 না। যদি শাস্ত্রের কর্ম্মকাণ্ডের যথার্থ ভাব প্রকাশ পায় তবে বালকেরা সাদরে
 শাস্ত্র মত কর্ম্ম করিতে প্রস্তুত ইহা আমরা বিপক্ষ জানি।

বিশ্বদ্বারা তিন গভুস জল পান করা হয় কেন, মার্জনা দি মস্ত্রে যে জলকে উপাসনা করা হয় তাহার প্রকৃত কারণ কি ? জলের অন্নদানের শক্তি এবং রমণীয় দর্শনের সহিত মিলিত করিয়া দিবার শক্তি আছে কি না, অঘমর্ষণ মস্ত্রে প্রকৃত শক্তি কি, গায়ত্রী কিরূপে আমাদিগকে উদ্ধার করেন—যদি শ্লোক-সংগ্রহকারী এবং শ্লোকের মোটামুটি অর্থপ্রদানকারী গ্রন্থকার মহোদয় ঐটুকু করিয়াই নিশ্চিত না করেন, যদি শাস্ত্রীয় মস্ত্রে বিজ্ঞান প্রদর্শন করেন তবেই এই কলিযুগে যথার্থ উপকার হয়। প্রাতে গায়ত্রী, মধ্যাহ্নে সাবিত্রী, সন্ধ্যাক্ষে স্বরস্বতী কোথাও বা ক্ষমরে শিবানী এবং ভ্রমধ্যে বৈষ্ণবী ধ্যান ইত্যাদি যে সমস্ত বিরোধ দৃষ্ট হয় গ্রন্থকার মহাশয়গণ ইহা যতদিন না সীমাংসা করিবেন ততদিন সমাজের প্রকৃত উপকার সাধিত হইবে না। হিন্দু বালককে নাস্তিকতা হইতে রক্ষা করিতে হইলে বাহাতে তাহার যথার্থভাবে শাস্ত্রের ভাব গ্রহণ করিতে পারে তাহাই করিতে হইবে। নতুবা লোকে বলিবে অর্থলোভে শাস্ত্রের বচন সংগ্রহ করা হইতেছে। আশা করি গ্রন্থকার মহাশয় গণ আপনাদের শাস্ত্রোক্ত বিধি দ্বারা তৃপ্ত হইয়া অন্তকে তৃপ্তি দিবার জন্য শাস্ত্রমত কার্য্য করাটোবার ব্যবস্থা করিবেন। এতদ্বিধি হিন্দুসমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে না।

২। “পুতুল বিয়ে” ত্রিভুজচন্দ্রপুর কায়স্থ কৃত উপন্যাস। এই পুস্তক সমালোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তবে ইহার মধ্যে যে “পরকীয়া ভাবের” শিক্ষা আছে এতৎসম্বন্ধে আমরা এই শ্রেণীর গ্রন্থকার মহাশয়দিগকে ছুই একটি প্রশ্ন করিব। পরকীয়া ভাব এক্ষণে Free-love হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা ব্যভিচারের অন্য মূর্তি। ভাগবতে রাজা পরীক্ষিত শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ভগবান্ ত্রিকক্ষ পরনারী লইয়া যে খেলা করিলেন তাহাতে তাঁহার ভগবান্দের মধ্যে কিছু দোষ কি আসিল না। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা আচরণ করিবেন নিকৃষ্ট লোকে তাহাই গ্রহণ করিবে। সাধারণ লোকেও অনেকের দ্বীতে আসক্ত হওয়ায় কি দোষের কার্য্য মনে করিবে না ? শুকদেব ইহার উত্তরে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে ভগবানের কোন দোষ আসিতে পারে না। শাস্ত্রের ভগবানের লীলামানসে চিন্তা করিয়া গোপিনীগণ কৃষ্ণের অন্তর্য্যেক্ষণ ব্যাকুল হইয়াছিলেন সেই ব্যাকুলতাটুকুমাত্র গ্রহণ করিবেন সেইরূপ ভাবেই উৎকর্ষাক্ষুটিত চিন্তে নিরন্তর ভগবানের প্রতীক্ষা করিয়া সংসার-নন্দিনীর উৎপাদ নিঃশব্দে সহ্য করিয়া যাইবেন ইহাই ধর্ম্মভাব। কিন্তু ইহা

গ্রহণ না করিয়া যদি ধুলে রক্ষা সাজিয়া বসে হয় এবং ফুলে হাসলীলা অভিনয় করা হয় তবে কি তাহা ধর্ম হয় ? অনাসক্ত হইয়া স্বামীকে অবজ্ঞা যদি করা হয় তবে কি তাহা ব্যাভিচার নয় ? ইহা কি সর্ব্বদা হেয় নহে ? এই শ্রেণীর উপন্যাস লেখক মহোদয়গণ যদি ধর্মের দিকে, পবিত্রতার দিকে, সত্যের দিকে গৃহীত রাখিয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তবেই না যথার্থ উপকার হয় ? নতুবা চোর কোশল করিয়া চুরি করিতেছে ইহা আঁকিলে কি অস্ত্র চোরের চুরি প্রবৃত্তি নিবারিত হইবে ? কামক্রোধাদির স্বাভাবিক কর্ম্মই মৃত্যু। এই স্বাভাবিক কর্ম্ম যদি চিত্রিত করা যায় তবে কি মৃত্যুনাশে প্রবেশের পথ উন্মোচন হয় না ? শাস্ত্রে সত্যের তেজ দেখাইবার জন্য রাবণ না কীচক বা জরাসন্ধ ইত্যাদির ঘটনা দেখান হইয়াছে। ইহাতে সত্যের তেজ খ্রীলোকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের সত্য উদ্দীপিত করিবার শক্তি প্রদান করে। নতুবা বিলাতী উপজ্ঞানের মত উপন্যাস লিখিয়া সমাজকে ব্যাভিচারপথে অগ্রসর করার লাভ কি ? বিলাতে যাহা ধর্ম ভারতে তাহাই যে ধর্ম হইবে ইহা কি ঠিক ? ক্ষণিক তৃপ্তির জন্য কোন কিছু করা নিতান্ত অযৌক্তিক। অন্ততঃ যে ভারতের ধর্ম-নীতি সমাজ সমস্তই মৃত্যু সংসার সাগর হইতে রক্ষা লাভ জন্য, সেই ভারতে Free-love আঁকিয়া, Free-love-এর জন্য এম এ পাস করা পুত্র বৃদ্ধ পিতা মাতাকে অবজ্ঞা করিয়া যুবতী স্ত্রী বিবাহ করিতে চলিল, পিতামাতার জন্যও অক্লান্তদয়কে জ্ঞানশাসনে শাসিত করিয়া নিজের স্বার্থ, বলি দিতে পারিল না—এইরূপ বিচারহীনতার পরিচয় প্রদান করা সংঘমী—প্রত্যক্ষদেবতা স্বরূপ পিতৃমাতৃতত্ত্ব হিন্দুর কর্তব্য নহে। পিতামাতা যাহাই হউন না কেন তুমি শিক্ষিত হইয়াও আপনার ধর্ম আচরণ মাত্র করিয়া যদি সকল ছুরতের জন্য কেবল ভগবান মাত্র আশ্রয় করিতে না শিখিলে বা শিখাইলে তবে তুমি হিন্দুজাতি-ভুক্ত বলিও না। অস্ত্র জাতির স্বধর্ম ইহা হইতে পারে। কিন্তু ভারতে হিন্দুর ধর্ম ইহা নহে। ব্যাভিচার বৃদ্ধি ব্যাভিচার দূর করাই গ্রন্থকারের কর্তব্য।

৩। নিকাস আখেরী বা পরিণাম। রায় রামাক্ষয় বাহাদুর কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। গ্রন্থকার শ্রীমৎ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয়ের জীবনী প্রকাশ করিয়া আপনিও ধূনা হইয়াছেন এবং হিন্দু সমাজেরও ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। শ্রীমৎ রামাক্ষয় বাবু এই পুস্তকে হিন্দুধর্ম-অবিশ্বাসীর নানাবিধ জটিল প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া তর্কবাগীশ মহাশয় দ্বারা তাহার সীমাংসা করিয়া

নইয়াছেন। মৃত্যু নিকটবর্তী হইলে মনে স্বভাবতঃ যে সমস্ত ভাবনা উঠে যিনি তাহা হইতে মনকে রক্ষা করিবার কৌশল দেখাইয়া দিয়া থাকেন তিনি শাস্ত্রকারদিগের মত গুরুত্বান্বিত। এই পুস্তক পাঠ করিতে করিতে যথার্থ মুমুক্ষুর যে সমস্ত বিচার আসা উচিত—আমি কি? কোথা হইতে আসিলাম? কোথায় বাইব? কি করিয়া গেলাম? আমার গতি কি হইবে? আত্মজ্ঞান প্রার্থীর এই সমস্ত প্রশ্ন, এই সমস্ত বিচার এবং তাহার সহস্র এই পুস্তকে হৃদয়ের কথাগুলো ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যাহারা চিন্তাশীল, যাহারা মৃত্যুর কঠোর যাতনা হইতে রক্ষা লাভ করিতে চাহেন এই পুস্তক ঐরূপ পাঠকের নিকট সর্বদা আদৃত হইবে। যাহারা খাওয়া দাওয়া বেশ থাকাকেই জীবনের কার্য্য বিবেচনা করেন সেইরূপ বিকারগ্রস্ত হৃদয় ভাগকারী পাঠকের রুচি ঐরূপ পুস্তকে লাগিবে না। গ্রন্থকারও ইহা ইচ্ছা করেন না সমালোচকেও ইহা ইচ্ছা করেন না। সরল ভাবায় নিজের দোষ উল্লেখ করিয়া তাহার প্রতীকার ক্ষমতা চেষ্টা আজকালকার সমাজে দেখিতে পাই না। গ্রন্থকার প্রাচীন হইয়াছেন—এইরূপ প্রকৃতির মজুবা হিন্দুধর্মের সজাগ অবস্থায় ছিল এখন বিরল হইতেছে। আমরাও বিশ্বনিয়ন্ত্রী ত্রীমতী অর্পনা দেবী ও বাবা বিশ্বনাথের দয়্যবারে মস্তকে অঞ্জলী ধরিয়া জানাইতেছি যেন গ্রন্থকারের কৃত্যোক্তি গ্রহণ করিয়া তাঁহারা এবং তাঁহাদের সেবানিরত গ্রন্থকারের অগ্রজ ত্রীমৎ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের আত্মা গ্রন্থকারকে শান্তিময় সুখময় পরমানন্দে ইহ ও পরজীবনে স্থিতি প্রদান করেন।

উৎসব ।

ওঁ ত্রী আদ্যারামায় নমঃ ।

অষ্টৈব কুরু যচ্ছ্রয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি ।
স্বগাত্ৰাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে ॥

২য় বর্ষ]

১৩১৪ সাল, আষাঢ় ।

[৩য় সংখ্যা

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

আনন্দ-লহরী

(নাচ মা আনন্দময়ি !)

(১)

নাচে রবি নাচে শশী নাচে বত তারাগণ
গাহে হৃদধুর গীত, হরে হরষিত মন ।

(২)

ভ্রমে গ্রহ উপগ্রহ ভ্রমে বিশ্বধরণী
মহাকাল চক্রপরে ঘোরে দিবা রজনী ।

(৩)

কদি মাঝে চক্ৰকরে ধরি নাচে রত্নাকর,
পবনহিলোলে খেলে স্বচ্ছতোয়ঃ সরোবর ।

(৪)

মনোসাধে ক্রতপদে ছুটিতেছে তটিনী,
প্রাণেতে পুলকভরা সুখে মধুরাগিণী ।

(৫)

গহন বিপিন মাঝে একি রঙ্গ চমৎকার !
হেলে তরু দোলে লতা খেলে দৌহে অনিবার ।

(৬)

হুণীতল রিঙ্ককর স্বধাধর-মণ্ডলে

কতরঙ্গে নাচে গায় স্বরবালা সকলে ।

(৭)

তুমি (ই) মা আনন্দময়ি ! জড় সেজে নাচ গাও

বিস্তারিয়ে দান্না তব জীবেরে ভুলায়ে দেও ।

(৮)

তুমি না নাচালে জড়ে জড়ে ত মা নাচে না

তুমি না মুটালে কথা কা'রও কথা মুটে না ।

(৯)

হৃদয় কমলে মম তালে তালে ফেলে পা

চালিয়ে স্বধার ধারা নাচ ওগো ক্রামা মা ।

ঐক্শান চন্দ্র ঘোষ, মেদিনীপুর ।

স্মরণ অভ্যাস ।

আপনাকে আপনি সোধোন করিয়া বলা হইতেছে—ত্রিতাপ-তাপিত পথিক ! তুমি কি চাও ? তুমি বড় দুঃখী, ইহাত আমি দেখিতেছি । তুমি পুরুষ হও বা স্ত্রী হও, যখন তুমি অজ্ঞান হইয়া যাও—যখন তুমি ভুলিয়া থাক, তখন হাহা হিহির ব্যাপারে মগ্ন হইয়া যাও, তখন অজ্ঞানেই বল বেশ আছে । সে কিন্তু ক্ষণিক । তুমি কিছুতেই জুড়াইতে পার না । যখন বালক ছিলে তখন কখন হাসিয়াছ, কখন কাঁদিয়াছ—হাসি কান্না অজ্ঞানমাত্র । সেই হাসি কান্না বরাবর চলিয়া আসিতেছে । কখন সুখী মনে করিতেছ, কখন দুঃখী মনে করিতেছ—ইহার মধ্যেই তুমি রহিয়াছ, ইহার হাত হইতে এড়াইতে পারিতেছ না । এক-ভাবে তুমি ঝাকিতে পারিতেছ না । তুমি যে ত্রিতাপ-তাপিত তাহা ভুলিয়া যখন কোন কিছু দেখিয়া বা শুনিয়া তাহাতে লাগিয়া পড়, তুমি ভাব “বেশ আছে ।” যখন বালক ছিলে তখন একরূপ হাসি কান্না ভুগিয়াছ, আর যৌবনে অল্প প্রকার নেশায় মত্ত হইতেছ । আবার জরা আসিবে, আবার অন্তরূপ বিপদ আসিবে, অন্তরূপ ভয় হইবে, কৈ তুমি নির্ভর হইলে ?

শাস্ত্রও এই কথা বলিতেছেন, তুমি মিলাইয়া গইও ।

বাল্যে গতে কলিতকেলিলোলে
 মনোমুগে দারদরীযু জীর্ণে ॥
 শরীরকে জর্জরতা প্রস্রাতে
 বিদ্রুতে কেবলমেব লোকঃ ॥
 অরাতুবারাতিহতাং শরীর-
 সরোজিনীং দূরতরে বিমুচ্য ॥
 ক্ষণাৎগতে জীবিতচক্রীকে
 জনন্য সংসারসরোহবগুঙ্কম্ ॥

পথিক ! এখন তোমার কথকিং জ্ঞান আসিরাছে। একটু গত আগত বিচার করিয়া দেখ, দেখিবে এই সংসারে লোকে কেবলই কষ্ট ভোগ করে। যেমন বালাকাল গত হইল; অমনি মনোমুগ কল্পনাগ্রসৃত অস্ত্রপ্রকার ক্রীড়ার জন্য লোমুপ হইল। সমুখে স্ত্রী। স্ত্রীরূপ গিরিগহ্বরে প্রবেশ করিল। দেখিতে দেখিতে পত্নীক্রীড়ায় শরীর জীর্ণ হইয়া পড়িল।

এই সংসারে কত প্রকারের শরীর দেখ। যেমন সরোবরে কত কত সরোজিনী ফুটিয়া রহিয়াছে। আর জীবন-মধুকর পয়ে পয়ে উড়িয়া ২ মধুপান করিতেছে। দেখিতে দেখিতে অরাহিমानी-পাত হইল। শরীর-সরোজিনী শুখাইল, জীবন-ভ্রমর উড়িয়া গেল। সংসার সরোবর শুক হইয়া পড়িয়া রহিল।

বড় বড় “ভারত ভারত” চীৎকারকারীরও মৃত্যুকালে নিদারুণ যাতনা হইয়াছে—কিন্তু যাহারা আত্মোদ্ধারের সহিত জগতের জন্ত খাটিয়া গিয়াছেন, যাহারা ভিতরে শান্ত হইয়া করুণা দৃষ্টে জগতকে দেখিয়া গিয়াছেন, কেবল মাত্র সেই মহাপুরুষেরাই আপনার কল্যাণ সাধিত করিয়া জগতকে কল্যাণ-পথে চালাইবার উপায় বলিয়া গিয়াছেন। আপনি আচরণ করিয়া অতকে আচরণ শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

ভাই পথিক ! তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, কি হইলে তুমি শান্ত হও ? তুমি এই সংসার-মরুভূমে ত্রিতাপ-তাপিত। ইহার জন্তই তুমি একভাবে থাকিতে পারিতেছ না। যখন হাহা হিহিতে থাক তখনও মনে করিও এখনি হহ করিতে হইবে। আগে ঠিক করিয়া লও কি চাও ? ভাল করিয়া নিজে যাহা পাইলে জুড়াইতে পার তাহা ঠিক করিয়া লও। পরে তাহাই সম্পন্ন করিবার জন্ত কার্য্য করিও।

আমি তোমায় বলিতেছি তুমি পুরুষ হও বা স্ত্রী হও, পথিক ! একটু বস্তু

তুমি চাও ! সকল মাহুঘই একটি বস্ত্র চায় । সেই বস্ত্রটি এই—‘তুমি কে ?’ তোমার শক্তি কে ? তুমি তোমার নিজ শক্তিকে দেখিরা তাহার সহিত জীড়া করিতে চাও ।

যেমন মহেশ্বর নিজশক্তি উমাকে দেখিরা নৃত্য করিয়াছিলেন, তুমিও তাহাই চাও । “নিজশক্তিযুগ্মাপ্ত মহেশইব নৃত্যসি” ।

আর যদি প্রকৃতি অভিমান করিয়া থাক তখনও বুঝিবে যে যখন তুমি তোমার জীড়া ঘায়া তোমার নৃত্য ব্যাপারে তুমি তাহার পূজা পাইয়াছ তখনই তুমি জুড়াইবে । সেইজন্য যে শক্তির পূজা সকলে করে—সেই শক্তি যাহা করেন সকলে তাহাই করিতে চায় । কি করেন তিনি ?

“শিবদ্য নর্তকী নিত্য পরব্রহ্মপ্রপূজিতা” সেই মহাশক্তি মঙ্গলময় পরমবিভূর সম্মুখে নিতাই নৃত্য করেন, আর তিনি পরমব্রহ্ম কর্তৃক প্রপূজিতা । তুমিও তাহাই চাও । সকলেই এই চায় ।

মীরাবাই তাই বলিয়াছিলেন “হে গিরিধারীলাল, হে শ্যামবরণ আমাকে চাকরাণী রাখ, আমরা তোমার সম্মুখে নৃত্য করিয়া তোমার আনন্দ উৎপাদনে ধন্য হইব ।”

ভক্তের সাধ দেখ :-

মোকো চাকর রাথোজী জামবরিয়া গিরিধারী লাল ।

চাকর রহতী, বাগ লগাতী, নিত্য উঠি দরশন পাতী ॥ ১

চাকরী ম্যার দরশন পাবো সুমিরণ পাবো খরটী ।

ভাবভক্তি জাগীরী পাবো তিন লোককী খরটী ॥২

যোদী পুচ্ছে মদন মোহন সো কথা মহিনা পায়ো ।

তিন লোক জাগীরী পায়ো নিরভর পটো লিখায়ো ॥ ৩

যোগী আর যোগ করণকো তপ করণে সংজাসী ।

রামভজনকো সাধু আয়ে বৃন্দাবনকে বাসী ॥৪

উচো উচো মহল বনায়ো বিচ বিচ রাধী বারী ।

সাবলিয়ারকে আগে নাঁচু ঠুড়ি পীতাম্বর সারী ॥৫

মোর মুকুট পীতাম্বর সো হ্যায় গলে বৈজন্তী মালা ॥

বৃন্দাবনমে দেখু চরাটে মোহনমুরলিবারা ॥৬

চোকা দেউলি আক দেউলী গোবর উঠাউ বাসী ।

সাঁঝ সবেরে জলতরী লাউ সব সন্তন কো দাসী ॥৭

মীরা কহে প্রভু-গিরিধরলাল গোয়ালুনিকো দরশন দীনো

যমুনাজীকে তীর ॥৮

এই-যে “সাবলিয়াকে আগে নাঁচু ঔড়ি পীতাম্বর সারী”—এই যে পীতাম্বরী সাড়ী পরিয়া শ্রামবরণের আগে আগে নৃত্য করা বুদ্ধি এই সেই “শিবন্ত নর্তকী নিত্য পরব্রহ্মপ্রজ্ঞিতা” করিয়া গিয়াছেন বা এখনও করিতেছেন । পুরুষের আপন শক্তি নৃত্য দর্শন ইহা অপেক্ষা আর প্রার্থনার বিষয় কিছুই নাই, আর প্রকৃতির তাহাই আনিয়া “সাবলিয়া আগে নাঁচু ঔড়ি পীতাম্বর সারী” ইহা অপেক্ষা স্বধ আর কিছুই নাই । আর সারা জগতে এই এক নৃত্যই পরম স্বধকর । রাজিকালে চারিদিক যখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন—আকাশ যখন মেঘাবৃত—মধ্যে মধ্যে মেঘের গর্জন—সেই সময়ে যখন চারিদিক উজ্জল করিয়া নবীন জলধর গায়ে বিছারিতা নৃত্য করে তখন সে দৃশ্য কে না রস পায় ? এই না সেই আদি দৃশ্য ? রামরূপী জলধরকে জানকী কানকী লতাই প্রকাশ করেন—শ্রামরূপী কালাজোধ্যরকে স্বকেন্দ্রী, নীলবস্ত্রা, অঞ্জনাঙ্গী, কৃষ্ণরামা ত্রি রাধিকা প্রকাশ করেন, আর শক্তিই শিবের প্রকাশিকা । স্বপ্রকাশের প্রকাশ এইরূপ । মাহুষ ইহাই দেখিতে চায়—ইহাই হইতে চায় ।

আপনার শক্তি সন্দর্শন—আপনার সম্মুখে আপন শক্তির নৃত্য ইহা অপেক্ষা পথিক ! আর স্বন্দর তুমি কি চাও ? যতদিন না আপন শক্তিকে আপন বিশাল হৃদয়ে নৃত্য করিতে দেখ, যতদিন না আপনি আপনাকে সীমামূন্য অনন্ত আকাশের মত বক্ষু জুড়িয়া থাকিতে দেখ—জগতের সমস্ত শক্তিই সেই সীমামূন্য শিবহৃদয়ে নাচিতেছে না দেখ, ততদিন তুমি জুড়াইতে পারিবে না । যতদিন তোমার আত্মদর্শন না হয়, যতদিন তুমি আত্মায় উপরে আত্মশক্তির ছন্দে ছন্দে নৃত্য না দেখ ততদিন তোমার স্বচ্ছন্দতা নাই ।

যশোদা কৃষ্ণকে আগ্নিনার নাচাইতেন, কালী শিববক্ষে নৃত্য করেন— কেন এই ভগবানের নৃত্য ? কেন সাধকে এই নৃত্য এত ভালবাসেন ? শক্তির চৈতন্য সহিত নৃত্য, ইহাই না আদি স্পন্দন ? পরিপূর্ণ শাস্ত্র পরমাত্মার চলনই এই স্পন্দন, এই নৃত্য । তাই গায়ত্রী “ছন্দসাংমাতঃ” । এই স্পন্দন হইতেই সৃষ্টি । এই ছন্দই আবার বেদ । এই ছন্দই আবার গায়ত্রী, উফিক্ অহুট্‌পু, বৃহতী পঙক্তি, ত্রিষ্টপু, জগতী এই সপ্তভাগে বিভক্ত । আরও আছে ব্যক্তি, কাস্তি, সত্য, বিরাট, বিভ্রাট, বিস্তারপঙক্তি, কাত্যায়নী, মহাজগতী, মহিম্যতী, নৃমতী, ভূচ্ছন্দ, ভুবচ্ছন্দ—কত অনন্ত ছন্দে এই আদিশক্তি নিরন্তর নৃত্য করেন । গায়ত্রী ছন্দে ব্রাহ্মণ, অন্যান্ত ছন্দে অন্য সমস্তের উৎপত্তি । তাই ছন্দে থাকিলে তাহাকে বলে স্বচ্ছন্দ । ছন্দভঙ্গই ব্যতিচার ।

তাগে তাগে ছন্দ যদি না হয়, তাগে তাগে নৃত্য যদি না হয়, এক হুগে সব যদি না বাজে তবে ত সঙ্গীত ভাল লাগেনা। জগতে যেখানে সঙ্গীত নাই, সেখানে রস নাই, সেখানে আনন্দ নাই। সেখানে ভগবান আচ্ছাদিত—সেখানে ভগবানের প্রকাশ নাই।

শক্তিই ছন্দ, শক্তি স্পন্দন। এক মহাস্পন্দনে জগত নাচিতেছে। তাই বলিতেছিলাম আপনার শক্তিকে দর্শন কর। কখন শক্তি সঙ্গে এক হইয়া পরম-পুরুষের কাছে নৃত্য কর, কখন পুরুষ হইয়া শক্তির নৃত্য দর্শন কর। এই শক্তির নৃত্যে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের নৃত্য হইতেছে বৃষ্টিবে।

পথিক ! যাতে তাতে নাচিলে হইবে না, ছন্দে ছন্দে নাচিতে হইবে। যখন ছন্দে ছন্দে সকল কার্য্য করিতে পারিবে তখনই তোমার সব জালা জুড়াইবে।

তাই আগে এক ছন্দে এক স্পন্দনে মনকে স্পন্দিত করিতে অভ্যাস কর। ইহার জন্য নিবিদ্ধ কর্ণ বা অচ্ছন্দে স্পন্দন ত্যাগ করিতে হইবে আর মনকে ছন্দে স্পন্দন বা উপাসনা করাইতে হইবে।

ঋষিগণ এই উপাসনা বৃষ্টিভেন, এই উপাসনা করিতেন—অপরে উপাসনা বৃষ্টিয়া করে না—প্রার্থনা করে মাত্র।

প্রার্থনা এক বস্তু, উপাসনা আর এক বস্তু। না বৃষ্টিলে উপাসনা হয় না—প্রার্থনার একটা বিশ্বাস মাত্র থাকে।

এস এস একবার উপাসনা কর। নিতাই ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে গাত্রোখান করিয়া মনকে ব্রহ্মভাবে স্পন্দিত করিবার অভ্যাস করা উচিত। সূর্য্যাদি শ্রুগণ হির দৃষ্টিতে কোন্ সীমামূলা পরম পদের পানে চাহিয়া আছে দেখিতেছ ? উহাকেই লক্ষ্য করিয়া এস এস উপাসনা কর।

ভারতের মঙ্গল চিন্তা ।

ভগবান আছেন, জগতের মঙ্গল তিনি করেন, ভারতেরও মঙ্গল তিনি করিবেন। যদি সমস্ত ভারতবাসী কোটি কণ্ঠে তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করে তবে কি ভারতের মঙ্গল সাধিত হয় না ? মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জন্ত ভারতের সমস্ত সম্প্রদায় একত্রিত হইয়া যেক্রপ ভগবানকে জানাইয়াছিল, সেইরূপ, এই হৃদ্দিনে, সমস্ত সম্প্রদায় একত্রিত হইয়া ভারতের মঙ্গলের জন্য কেননা প্রার্থনা করে। হরি নামে যদি প্রেগ শাস্ত হয় তবে কি কোটি কণ্ঠে হরিনাম হইলে ভারতের সমস্ত উপদ্রব শাস্ত হয় না ? ভগবানের নামের কি জোর নাই ?

সকলেই ত ভারতের মঙ্গল চাহেন। রাজাও ভারতের মঙ্গল চাহেন, পাদ্রীগণও চাহেন, মুসলমান ভারতের মঙ্গল চাহেন, শিক, পারশী, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম, আৰ্য্য সমাজী, কে না ভারতের মঙ্গল কামনা করিতেছেন ?

এক বনে সিংহ ব্যাঘ্রও থাকে আবার হরিণ শশকও থাকে। আপন আপন প্রাণরক্ষা করিয়াও ইহারা থাকিতে পারে। কখন কখন হিংসাও করে। ষাঁড়ও ত হিংস্র জন্তু নহে। ইহারা যদি মহুবত্ত পাইয়া থাকে তবে ঐ হিংসাত্মক বাঘ দিয়া কেননা এক সঙ্গে থাকিতে পারিবে ?

ভগবানের নাম ও রূপ বহু হইতে পারে কিন্তু ভগবান এক। সকল লোকের ভগবান এক। আপন আপন স্বভাব মত এক ভগবানকে নানাভাবে লোকে দেখে ইহাই স্বাভাবিক। সকলের চক্ষু একরূপ নহে, সকলের মন একরূপ নহে, সকলের ভাব একরূপ নহে। এক ভগবানকে পৃথক পৃথক লোকে পৃথক পৃথক ভাবে ডাকিলে ক্ষতি কি ?

অগতের প্রকৃত অমঙ্গল কোথায়, ভারতের বথার্থ অমঙ্গল কি ইহাও ত সকলে ঠিক করিয়া ধারণা করিতে পারে না। তবে নিজের বুদ্ধিতে দুঃখ প্রতিকার করিতে উন্নত চেষ্টা না করিয়া যদি সকলে মিলিয়া ভগবানকে ডাকে তবে কি কোন ফল হয় না ?

অন্য অন্য জাতি একথা শুনিবেন কি না জানিনা। হিন্দুত শুনিতে পারেন।

ভারতে ৫২ লক্ষ সাধু আছেন শুনিতে পাওয়া যায়। ভারতে হিন্দুর তীর্থ অসংখ্য। কত কোটি কোটি লোক প্রত্যাহ তীর্থ দর্শন করে। এই ৫২ লক্ষ সাধুর অনেকের মিলন হয় কুন্তমেলায়। প্রতি সাধু ভারতের মঙ্গল কামনা করিয়া যদি একবার মালা ফিরান তবে ৫২ লক্ষ কণ্ঠে ভগবানকে জ্ঞানান হয়, প্রতি তীর্থের পাওগণ, প্রতি তীর্থের মহন্তগণ, প্রতি আখড়ার সন্ন্যাসীগণ যদি নিয়ম করিয়া দেন প্রথমেই ভারতের কল্যাণ জন্য সমবেত কণ্ঠে ভগবানকে জানাইতে হইবে তবে কি এ কার্য্য অসম্ভব হয় ?

কত মহাপুরুষের নিকটে প্রত্যাহ বহুলোক সমবেত হয়েন। যিনি যে সম্প্রদায়ভূক্ত হউক না কেন যদি মহাপুরুষ প্রথমেই সকলকে ভারতের উপদ্রব, অশান্তি নিবারণ জন্য, দুই চারি কথায় লোককে বুঝাইয়া দিয়া সমবেত লোকমণ্ডলীকে নাম করান—যদি স্থানে স্থানে “জয় জয় মহিষাসুর-মর্দিনি রম্যা কপর্দিনি শৈলমূর্ত্তে” “হর হর মহাদেব শঙ্কু” “জয় জয় মহাবীর” “জয় জয় রাম জয় সীতারাম” “গৌরীশঙ্কর সীতা রাম” “হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে” এই এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে ২ সমবেত কণ্ঠে সকলকে যদি নাম করান, তবে কি ধর্ম্ম হয় না ? তবে কি ভারতের প্রকৃত কল্যাণ হয় না ? ভারতের মঙ্গল কামনা করিলেও আপনা হইতে নিজের মঙ্গল হইবেই।

তপস্যাই হিন্দুর বিশেষত্ব। হিন্দুর শাস্ত্র সর্বত্র ইহা বলেন। ভারতের প্রতি সাধু, ভারতের প্রতি মহুযা, যদি ত্রিসন্ধ্যায় ভারতের মঙ্গল জন্য একবার করিয়া মালা ফিরান, তবে সহরে কি ভারতের দুঃখ উপশম হয় না ?

উৎসব ।



ও ত্রী আত্মারামায় নমঃ ।

অষ্টৌব কুরু যচ্ছ্রয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি ।

স্বগাত্ৰাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্যয়ে ॥

২য় বর্ষ]

১৩১৪ সাল, শ্রাবণ ।

[৪র্থ সংখ্যা

উপাসনা অভ্যাস ।

বর্ষ বর্ষ ধরিয়া স্মরণ অভ্যাস, উপাসনা অভ্যাস করিতে করিতে ভাবনা যখন আবৃত্ত হইয়া যায়, যখন সর্বদাই এক ভাবনা লইয়া থাকে যায়, তখন ব্যবহারিক কার্যও প্রবাহ-পতিত মত হইয়া যায়, আর ধারণাভ্যাসী ও হওয়া যায়। ধারণাভ্যাসীর উর্দ্ধ গতি সুনিশ্চিত। পাঠ বা ভাবনা, ক্রিয়া, উপাসনা, বিচার বহু বর্ষ ধরিয়া এক নিয়মে করা উচিত। তাই উপাসনা আলোচিত হইতেছে।

হে রমণীয়দর্শন! তোমার সহিত মিলিত হইতে না পারিলে আমাদের সকলই বৃথা। বৃথা আমার চেষ্টা, বৃথা আমার ধর্ম কর্ম, বৃথা আমার জীবন, বৃথা আমার জগতে আগমন।

কে আমার তোমার সহিত মিলন করাইয়া দিবে? যাহারা তোমার নিকটে সর্বদা থাকেন তাঁহারা হই পারেন! রাজদর্শন কিরূপে হইবে, রাজার সহিত পরিচয় কিরূপে হইবে, যদি রাজার সহচর কেহ রাজার নিকটে লইয়া না যান?—যদি কোন রাজসহচর রাজার সহিত পরিচয় করিয়া না দেন?

আমি আপনি সেখানে যাইতে পারি না। তাঁহার প্রতীকে, তাঁহারি থাকেন তাঁহারাও সেই রমণীরদর্শনের মত। সেই শক্তি, সেই আনন্দ, সেই জ্ঞান, তাঁহাদেরও আছে। তাঁহার সহিত সমান হইয়াও তাঁহারা তাঁহার সেবা করিতে ভাল বাসেন। এক হইয়াও তাঁহার সহিত পৃথক হইয়া রাখিয়া তাঁহাকে ভালবাসেন। একার ভালবাসা নাই, একার প্রেম নাই। আপনাতে আপনি থাকা, আর আপনাকে আপনি আশ্বাদন করা—তাই উত্তম—শেষটিতে থাকাও আছে, আশ্বাদনও আছে, তাই ইহা আরও উত্তম। তাই এক হইয়াও বহু হওয়া।

কে তবে সেই রমণীরদর্শনের সহিত মিলাইয়া দিবে? কে তবে আমার রক্ষা করিবে? আমি কোন্ প্রতীকের উপাসনা করিব?

যখন তুমি ঠিক হইয়াছিলি তখন কে রক্ষা করিয়াছিল? স্তম্ভরস। এই স্তম্ভরসের অধিষ্ঠাত্রী মা আমার রক্ষা করিয়াছিলেন। এই পরিসুস্থান বৃক্ষতা, আকাশ নক্ষত্র, জল বায়ু, কি এক রসে যেন সরস হইয়া আছে—কোন এক রস যেন জগতকে রক্ষা করিতেছে—কোন এক সরসবতী, কোন এক সরস্বতী, যেন জগতকে রসযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। যে মহেশ্বরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কত স্থানর মনে হয় সেই অঙ্গে রস আছে বলিয়াই স্থানর। আঙ্গীর-সহি অঙ্গের প্রাণ। যে অঙ্গে রস থাকে না তাহাই প্রাণ-হীন।

অন্ন না থাকিলে দেহের রসও হয় না। যিনি অন্ন দিয়া জীবন রাখিতেছেন, তিনিই রমণীর দর্শনের সহিত মিলন করিয়া রক্ষা করিবেন—তাই সেই রসস্বরূপিণীর উপাসনা আমরা করি। বাহিরে এই জল তাঁহার মূর্তি। অন্তরে এই প্রাণ তাঁহার মূর্তি।

কে বলিল জলের সামর্থ্য নাই? কে বলে জল জড়? মাতার স্তম্ভ যখন মাতার অঙ্গে থাকে—তখন স্তম্ভ রস কোন্ শক্তি ধারণ না করে? যে জল, রস রূপে জগত রক্ষা করিতেছে, তুমি যদি দেখ উহা রসাধার স্তনের স্তায় মাতার অঙ্গ, তবে কেন বলিবে না, মা স্তন না দিলে শিশুর রক্ষা হয় না—শিশু যখন বড় হয় তখন মাতার ফোড়ে উঠিয়া স্তন ধরিয়াই পান করে, স্তন যেমন মাতার অঙ্গ জল সেইরূপ মাতার অঙ্গ—শ্রীমাতেশ্বরই জলের মধ্যে রস রূপে থাকিয়া জগতকে সরস করিতেছেন। তাই জলের সামর্থ্য আছে—ইহা শুধু জল নহে—ইহা মাতাই—তাই মাকে বলি মা অন্ন দিয়া ইহলোকে রাখিলে, রমণীর দর্শনের সহিত মিলন করাইয়া অনন্ত জীবন দিয়া দাও মা।

বড়ু জিতাপতিপতিত হইয়াছি। সংসার-মরুভূমে নীচে তপ্ত বালুকা, উপরে
প্রথর সূর্য্য, শুষ্ক তপ্ত বায়ু—তু তু ব ব হইতে আমার কর্ণ দোষে জিতাপ
আসিয়া আমার দণ্ড করিতেছে—শরীর বর্ষদিত্ত, মললিপ্ত। ছায়াময়ি—
ছায়া দান করিয়া বর্ষ শুষ্ক করিয়া দাও—জলময়ি! জলীতল জল দিয়া আমার
শরীরের মলা অপসারিত কর। আর মনের মলা? মা মনের মলা ধুইয়া
দিয়া আমার রমণীর দর্শনের সহিত মিলাইয়া দাও।

কিষ্কপে মনের মলা যাইবে—কিষ্কপে মিলন হইবে? ভাবনা—বিষয়-
ভাবনাই মনের মলা। মা—সেই রমণীর দর্শনের ভাবনা বারা আমার বিষয়-
ভাবনা ভুলাইয়া দাও। ইহাই মিলনের এক মাত্র পন্থা।

আহা কি মধুর ভাবনা! ঋতক সত্যং পরব্রহ্ম মাত্র মাসীৎ। মহাপ্রলয়
সময়ে সমস্ত জগৎ যখন শব্দমাঝে লয় হয়, আবার সমস্ত শব্দরাশি এক
মহানস্তিতে লয় হইবার অন্ত প্রধাবিত হয়—যখন লয় হইতেছে, তখন যে
স্পন্দনে জগত ভাসিয়াছিল, সেই স্পন্দন জগতকে আপন সত্ত্বায় লীন করিয়া—
ধীরে ধীরে সেই রমণীর দর্শনের বক্ষে লয় হইয়া যায়। যেমন শব্দ বটাক
ধ্বনি প্রথমে ভারি শব্দ তুলিয়া কোন সীমান্ত অতিক্রম করিয়া লয় প্রাপ্ত
হয়, সেইরূপ।

প্রকৃষ্ট রূপে লীন হওয়াই প্রলয়। স্থল স্থল বস্তৃ বস্তৃ বস্তৃ অবস্থায় লীন হইতে
হইতে শেষে সমস্ত দৃষ্ট জগত আর থাকে না—থাকে এক মহাস্পন্দন। স্থল
পৃথ্বী জল হইয়া যায়, জল অগ্নি হইয়া যায়, অগ্নি বায়ু হইয়া যায়, বায়ু আকাশ
হইয়া যায়, আকাশ শব্দরাশি মাঝে পর্য্যবসিত হয়, শব্দরাশি লয় হইয়া এক
মহাস্পন্দন মাত্র থাকে। সেই স্পন্দন ক্রমে ধীরে ধীরে সীমান্ত অনন্ত ব্রহ্মে
লয় হইয়া যায়। থাকে সেই সক্তিদানন্দ, পরম শান্ত, পরম রমণীর দর্শন। তিনিই
ঋতং তিনিই সত্যং। ঋতমেকাঙ্করং ব্রহ্ম। সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্মেতি।
পরমাত্মভাবই ঋত। ভাবের স্পন্দনই সত্য। ভাবনাই আদিস্পন্দন—আদি-
স্পন্দনই আদিভাবণ। পরমাত্মভাবই ব্রহ্ম—পরমাত্মশক্তিই যখন সুরিত
হয়েন, তখনই শব্দব্রহ্ম। ইহাই প্রণব ও বাহ্যতি। ইহার পরে ইহার
আজ্ঞাদান এক মহাশব্দকার। সৃষ্টি এই মহাশব্দকার। মহাশব্দকারের ভিতরে
এক মহাপ্রকাশ। “প্রণবণ ব্যাকৃতিভিঃ প্রবর্ততে তমসস্ত পরং জ্যোতিঃ।”
এই তমসস্ত পরং জ্যোতিঃই মহাপুরুষ স্বয়ং বিষ্ণু। মহাপুরুষে মহাপ্রকৃতি
যখন প্রকৃষ্টরূপে লীন থাকেন তখনই মহাপ্রলয়।

‘আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্ । কে ইহাকে জানিবে কে ইহাকে বলিবে ? “যন্নবেদা বিজ্ঞানন্তি মনো যজ্ঞাপি কৃষ্টিতম্” । আবার মহাপ্রলয়-বসানে সৃষ্টি আরম্ভ । মহাপুরুষ আপন প্রকৃতিকে ঐক্য করেন, এই ঐক্যই ভাবনার ঐক্য । ঐক্যে “আমি ইহা” বা “ইহা নহি” সম্বন্ধ । “আমি ইহা” যখন নিশ্চয় হয়, তখন প্রকৃতির সান্নিধ্য হয় । বাহ্য মিশ্রা ছিল তাহার পৃথক্ব হয়, তাই সান্নিধ্য । সত্ত্বগুণ আপন শক্তি লীন অনন্ত জীবপুঞ্জ দর্শনে রূপাপরবশ হইয়া যজ্ঞের সহিত সৃষ্টি আরম্ভ করিবার ইচ্ছা করেন ।

সৃষ্টি কর্তা ব্রহ্মা । ব্রহ্ম তপস্তা দ্বারা উজ্জলিত হইলে যখন পরম ভগ্নকে অবলোকন করেন তখন রাজি সৃষ্ট হয় । পরম জ্যোতি দর্শন করিয়া মহা অন্ধকারের অভ্যুত্থ হয় । কেন জগৎ সৃষ্ট হয় ?

জীব স্বপ্নশূন্য নিদ্রা অবস্থায় যখন আচ্ছন্ন তখন মহাপ্রলয় । জীবমধ্যে অনন্ত অনন্ত জীবপুঞ্জ আপন আপন কর্তব্যে অড়প্রায় ছিল । ক্রমে কর্তব্য সমূহ যখন ফলদানোন্মুখ হয় তখন ফলদানোন্মুখ কর্তব্যে জীবের আগ্রহ অবস্থা আইসে । এই আগ্রহাভিমাত্রী পুরুষই সপ্তার, একোনবিংশতি মুখ, বহিঃ প্রজ্ঞ, স্থলভূক্ । ক্রমে সৃষ্টি ।

ক্রমে রাজি, সমুদ্র, অর্ণব, সংবৎসর, দিন রাজি, সূর্য্য চন্দ্র, মহজনাদি লোক, অন্তরীক্ষ-লোক, স্বর্গ-লোক—এই সমস্তের প্রকাশ ।

এই মহাপ্রলয় ও সৃষ্টি-ভাবনা ভিন্ন সংসার-ভাবনা দূর হয় না । পরে স্থিতি ভাবনা দ্বারা উপাসনা । সপ্রণব ব্যাক্তিবৃক্ক এই বিশ্বরূপের উপাসনা ভিন্ন—এই মহাশক্তির নিকট প্রার্থনা ভিন্ন, ক্ষুদ্র পরিচ্ছিন্ন জীবশক্তি সেই অপরিচ্ছিন্ন রমণীয় দর্শনের সহিত মিলিত হইবে কিরূপে ? যে সূর্য্য অগদেক-চক্ৰ, যিনি সেই রমণীয় দর্শনকে আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছেন, তাহার নিকটে প্রার্থনা করি প্রভু ! তুমি তোমার প্রবল জ্যোতিঃ একবার সরাইয়া লও, লইয়া আমাকে আমার রমণীয় দর্শনের সহিত মিলাইয়া দাও । আমি পারি না, তুমি করিয়া দাও । হে প্রভু ! তুমি আমাদেরকে প্রাপ্ত হও, আমরা তোমার প্রাপ্ত হইতে পারি না ।

এই ভাবনা শুধি হৃদয়ে ধারণা করিয়া প্রাণকে বড় করিতে হইবে । প্রাণকে বড় করাই প্রাণায়াম । গ্রহণ করা ও পরিত্যাগ করা পুনঃ পুনঃ ভাল লাগেনা ; তাই গ্রহণ ও ত্যাগ না করিয়া, একভাবে থাকিতে চাই—তাই কুন্তকে স্থিতি ভিন্ন সেই রমণীয় দর্শনের সহিত মিলন হয় না । প্রাণকে স্থির করিলেও বাহ্য

হয়, মনকে উপাসনা দিয়া শাস্ত করিলেও তাই হয় ; আবার বুদ্ধিকে বিচার দ্বারা ব্রহ্ম সুখে লইলেও তাই হয় । প্রাণ, মন ও বুদ্ধি—এই ত্রিবিধ শক্তির সাহায্যেও মিলন হয় । যোগ, উপাসনা, আত্মবিচার, এই ত্রয় রমণীয় দর্শনের প্রাপ্তি ক্রম । বাহ্যর যাহা কঠি । একটি ছাড়িয়া একটিতে আটকাইয়া ধাক্কিলে হয় না ।

জীবনে ইহা সম্পাদন করাই মহোৎসব । উৎসব কি এই ব্যাপারে অগ্রসর করিতে পারিবে ? বাহ্যের উৎসবে আছেন, তাঁহাদের রূপায় সমস্তই সিদ্ধ হইবে ।

দুঃখকে বাড়াইতে অভ্যাস করা চাই । আমরা সকলেই ভালবাসি আপনাকে । স্বামীর অথবা স্বামীকে ভালবাসা হয় না । পত্নী নিজের সুখের অথবা স্বামীকে ভালবাসে । “নবা অরে পত্ন্যঃ কামায় পতি প্রিয়োভবতি । আত্মনস্ত কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি ।” সেইরূপ ; নবা অরে ব্রহ্মণঃ কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি । আত্মনস্ত কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি । ব্রহ্মের সুখের জন্য ব্রহ্মকে ভালবাসি না । আপনার সুখের জন্য ব্রহ্মকে ভালবাসি । প্রতি ইহা বলেন, এই যে “আপনা” বলিয়া বস্তুটি ইহাই আত্মা । এই আত্মাই সকলের মধ্যে । তুমি ইহাকে খণ্ডিত বা পরিচ্ছিন্ন মনে করিয়া কষ্ট পাও । কিন্তু যদি দুঃখ বাড়িও, তবে নিজের দুঃখ দূর করিবার জন্য বাহ্য কর, অন্যের দুঃখ দূর করিবার জন্য তাহাই করিতে হয় । ক্রম এই রূপ । কস্তার বিবাহ দিতে না পারিয়া এক জন ক্লেশে আছে । তুমি চিন্তা কর, যদি তোমার এইরূপ হইত, তবে কত ক্লেশ পাইতে ; যদি তোমার এক জন বন্ধুকে এক খানি চিঠি লিখিলে উহার সাহায্য হয়, তাহা তোমার দ্বারা অনার্য্যে হইতে পারে । রাস্তায় কোন বালক ক্ষুধার কাঁদিতেছে । তুমি যখন ঐ স্থান দিয়া বাইতেছ তখন একবার দাঁড়াও । দাঁড়াইয়া চিন্তা কর, যদি তুমি ক্ষুধার পীড়িত হও, তবে তোমার কত ক্লেশ হয় । ইহা চিন্তা করিলেই তুমি দান করিতে পারিবে । এইরূপে তোমার দুঃখ বাড়িবে । ইহাই করণ অভ্যাস । এইরূপে মৈত্রী, মুনিতা ও উপেক্ষা, অভ্যাস কর—দুঃখের সন্ধীর্ণতা দূর হইবে । তোমার আত্মাকেই সর্বত্র দেখিবে ; সর্ব জীবে দয়া আসিবে । তুমি তখন সাধনা দ্বারা আত্মতৃপ্তির সহিত আত্মজ্ঞান-লাভ-পথে অগ্রসর হইতে পারিবে । বৎসর ধরিয়া ইহা নূতন করিয়া আরম্ভ কর ভগবান মিলিবে ।

নাম সাধনা ।

কথা কওয়া, শোনা ও দেখা নাম সাধনার এই তিন অঙ্গ । নাম ও রূপের মধ্যে নাম বড় ; কারণ নামের মধ্যে রূপ আছে—সাদু মুখে ইহা ভ্রমণ করা যায় । গোস্বামী তুলসী দাসের রামায়ণেও ইহা দেখা যায় ।

দেখিয় রূপ, নাম অধীনা ।

রূপ জ্ঞান নহি' নাম বিহীনা ॥

বিচার করিয়া দেখ, রূপ নামের অধীন । কারণ নাম ভিন্ন রূপের জ্ঞান হয় না ।

সুমিরিয় নামরূপ বিদ্র দেখে ।

আবত হৃদয় সনেহ বিশেষে ॥

রূপ না দেখিয়াও নাম স্মরণ করিলে ঐরূপই হৃদয়ে ভাসে । তাহাতে প্রীতিও অধিক হয় ।

নাম ও রূপের কথা অকথনীয় । নাম ও রূপের মধ্যে নেই বড়, যাহার গুণ বেশী । নাম শব্দ ন'ত্ন । শব্দই বড় । শব্দই প্রণব । শব্দই আদি স্পন্দন । এই জগৎ প্রণব হইতেই জন্মিরাছে । বেদে ইহা শুনা যায় ।

নাম সাধনাই দুর্লভ সাধকের একমাত্র অবলম্বন ।

নামকে হৃদয়ে বা ক্রমধ্যে রাখিয়া নামকে জীবন্ত মনে ভাবিয়া লইয়া, প্রতি হৃৎকালে নামকে ডাকিয়া কথা কও—শাস্তি অমৃতভব করিবে । যে হতভাগা একবারে ইহা পারে না, সে বহুবার ইহা করিতে থাকুক, এক দিন না এক দিন, হৃৎশাস্তি অমৃতভবে আসিবেই । এক দিন আসিলেই ব্রহ্ম বাড়িবে । শাস্ত্রে ভক্তি বিশ্বাস বাড়িয়া যাইবে । তখন হৃৎকের কথা মানুষকে জানানাইতে ইচ্ছা হইবে না । নামরূপী প্রাণেশ্বরকে পুনঃ পুনঃ বলিতে ছুটিবে—ইহাই কথা কওয়া । করিয়া দেখ হইবে । ইহাই মানুষকে আশ্রয় না করিয়া ভগবানে নির্ভর করা ।

দ্বিতীয় কথা শোনা । মন্ত্র বেক্রপ ভাবেই উচ্চারণ করা—নিজের উচ্চারণিত মন্ত্র নিজের কর্ণে শুনিয়া শুনিয়া নাম জপ করা চাই । ইহা ইন্দ্রিয়-জয়ের প্রথম সোপান । সর্বদা যিনি নাম জপ করিতে পারেন—সর্বদা যিনি আপন উচ্চারিত নাম শুনিতে শুনিতে জপ করিতে পারেন, তিনি আর অস্ত্র কৃথা শুনিতে পান না । বাহিরের কথা না শুনিয়া নিজের জপ নিজে শুনিতে অভ্যাস যিনি করিয়াছেন তিনি জানেন ইহাতে কত শীঘ্র মন একাগ্র হয় ।

বাহিরের কথা শ্রবণ বন্ধ হইলেও ভিতরের চিন্তা থাকে। প্রতি চিন্তাও শব্দ সাহায্যে হয়। ভাবনা ও বাহ্য, চিন্তা ও তাহা। যেখানে ভাবনা, সেইখানে চলন। যেখানে চলন, সেইখানে শব্দ। ভাবা বা শব্দ না হইলে চিন্তা হইতেই পারে না।

• নাম রূপে আপনার উচ্চারিত শব্দ আপনি যখন শ্রবণ করা যায়, তখন বাহিরের শব্দ ও যেমন বন্ধ হয়, সেইরূপ অন্তরের চিন্তাও বন্ধ হয়। করিয়া দেখিলেই জানা যায়। ক্রমস্থিত জ্যোতি দিয়া নাম লেখ, তাহাই দেখিতে দেখিতে আপন কর্ণে শুনিয়া শুনিয়া জপ কর, অন্তর জয় হইবে।

বহু দিন জপ অভ্যাস করিতে করিতে রূপ আসিবেই। যাহারা তত বিলম্ব সহ্য করিতে পারেন না, তাহারা কল্পনার ক্রমধ্যে জ্যোতির বিন্দু কল্পনা করিয়া করিয়া তন্মধ্যে মণি স্বীপ—তন্মধ্যে কল্প-বৃক্ষ তলে মণ্ডপ কল্পনা করুন। মণ্ডপ মধ্যে জ্যোতির ইষ্ট দেবতার মূর্তি মনে মনে গঠন করুন, চাঁদের কিরণে বিজুয়ী মাথাইয়া মৃগাল স্তূভ গঠন করুন, পদ্ম চক্ষু ধারণা করুন, চরণারবিন্দ কল্পনা করুন, হইবে।

“ভূজে সৰ্বো বেণুঃ শিরসি শিখিপিজ্জং কটিতটে” চিন্তা করুন—হইবে।

জ্যোতির দেবতাকে জ্যোতির মধ্যে স্থাপন করিয়া বলুন।

হে দেব হে দম্বিত হে জগদেকবন্ধো।

হে কৃষ্ণ হে চপল হে ককটৈকসিক্কো ॥

হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম।

হাহা কদাহুভবিতাসি পদং দৃশোশ্ৰে ॥

এই ভাবে কথা কহন—পরে কল্পনার দেখিতে চেষ্টা করুন।

অংশলধিত বামকুণ্ডলতরং মনোন্নতং জলতং।

কিকিৎকুকিতকোমলাধরপুটং সাত্তিগ্রসারেক্ষণম্ ॥

আলোলাঙ্গুলি পল্লবেমুর্জলিকা মাপুস্তরং মৃদা।

মূলে কলতরোস্ত্রিভঙ্গললিতং জানে জগন্মোহনং ॥

• আবার কথা কহন।

হে গোপালক হে কৃপাভলনিধে হে সিদ্ধকন্যাপতে।

হে কংনাতক হে গজেন্দ্র করুণাপারীণ হে মাধব ॥

হে রামানুজ হে জয়জয় গুরো হে পুণ্ডরীকাক্ষ মাং।

হে গোপীজননাথ পালয় পরং জানামি ন ত্বাং বিনা ॥

আবার রূপ ! কি হৃদয়—

কল্পরি তিলকং ললাট ফলকে বক্ষঃস্থলে কৌমুভং ।

নাসাগ্রে নব মৌক্তিকং করতলে বেণুং করে কঙ্কণম্ ॥

সর্বাঙ্গে হরি চন্দনঞ্চ কলয়ন্ কণ্ঠেচ মুক্তাবলিঃ ।

গোপস্বী পরিবেষ্টিতো বিজয়তে গোপাল চূড়ামণিঃ ॥

এই ভাবে যে যাঁহা ইষ্টদেবতা, কুলক্রমে পাইয়াছেন, তাঁহারই সহিত মানসে কথা কহন, তাঁহার নাম আঁকিয়া তাঁহাকেই জীবন্ত ভাবিয়া, হৃৎকানাইতে থাকুন—এক কথার—কথা কহন, নাম জপ শ্রবণ করুন, এবং রূপ অন্ততঃ কল্পনায় দেখিতে থাকুন—এই ভাবে কথা কওয়া, শোনা, দেখায়, শাস্ত্র হওয়া যায় ইহা অসুভব করিতে পারিবেন। এই কলিযুগের ত্রিতাপ তাপিত হৃৎকান অধিকারীর অস্ত্র এতদপেক্ষা সহজ সাধনা যদি কেহ জানেন জানাইবেন। অধিক কি নাম জপ ও “মাং নমস্তুভ্য” অভ্যাঙ্গে সমস্তই হয়।

গীত ।

ধতেন্ করায় মন অগতের কারখানা ।

পেরে পরতষ, সবাই মন্ত, আপনাকে কেউ দেখেনা ॥

পরচর্চা হয় দিনে রোতে

নিন্দা বন্দ্য। কত প্রকার যার রুচি যাতে

লরে পরের কলুষ আপনার হৃদে

হরে রর কর্মকাণা ।

শাস্ত্র দেখে পণ্ডিতেরিগণ

দেখে মাত্র করে নাক শুদ্ধ আচরণ

ইথে হয় কেবল গাধার ভার বহন ।

যেমন মশালটি পথ দেখায় অস্ত্রে, চোক থাকতে আপনি কান্দা ।

আপনার ছিদ্র আগে না দেখে

পরের ছিদ্র খুঁজে বেড়ায় মনের কৌতুকে

ভেবে দেখেনা আমার আমি কে

দীন গোবিন্দ বলে উচিত র্নলে লবেনা কেউ হোঁবেনা ।

উৎসব ।

ও ত্রী আশ্বারামায় নমঃ ।

অষ্টৈব কুরু যাচ্ছে যো বৃক্ষঃ সন্ কিং করিষ্যসি ।
স্বগাত্ৰাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্যয়ে ॥

২য় বর্ষ]

১৩১৪ সাল, ভাদ্র ।

[৫ন সংখ্যা]

হংস গীতি ।

(ওমন) কুঁদের মুখে ব্যাক থাকে না ।

যথাবিধি ছাড়লে বায়ু ফেলবে কেড়ে হুয়ুমনা ॥ ১ ॥

জোরে ক'রে তালব্য ক্রিয়ায়

জিহ্বার শিরটা বাড়িয়ে নেনা :—

চুঁটির গিট টা কণ্ঠায় এনে

গর্স্তের ভিতর তোলা রসনা ॥ ২ ॥

নাকের কুটোর উপর তলায়

থাকবে ডগা রইলো জানা

(এখন) তেত্রি টেনে ফেললে বাতাস

বিদবে কুণ্ডলিনীর কণা ॥ ৩ ॥

(আছে) জিতালু হৃদলের উপর

গোলকেতে কেঁপেখান

(সেখা) টানে টানে উঠলে জিহ্বা—

করবে অধা আর রবেনা ॥ ৪ ॥

নেশায় বিভোর হয়ে রবি

• চর্ম চক্ষু আর রবেনা :—

(তখন) আধার, নাভি, হৃদয় গ্রন্থি

ছিঁড়ে বাবার ঠোর পাবেনা ॥ ৫ ॥

শুধু পায় নোরা মাথা
 গলাবাজী আর কোরোনা : —
 তিনি এরি স্থানে পাঠিয়ে দেবেন
 হুরিয়ে বাবে আনা গোনা ॥ ৬ ॥

জীবনের পরীক্ষা-আলোচনা ও প্রার্থনা ।

আলোচনা ।

অনেক বার এ পরীক্ষা দিতেছ কোনবারে কি উত্তীর্ণ হইলে ? হও নাট ।
 বালক কাল চইতে গণিমা আটম—আজ পর্যন্ত যতগুলি পরীক্ষা দিয়াছ
 কোনটিতে সকলমনোরথ কি হইয়াছে ? হও নাট ।

যদি বালক কালের পরীক্ষার বিষয়গুলি ভাল করিয়া জানিতে, আর
 জানিয়া তাহার মত কার্য করিতে, তবে যৌবনে উত্তীর্ণ হইতে পারিতে,
 তবে যৌবন সুখের হইত ; তবে যৌবন বহু দিন থাকিত, তবে কোন
 ব্যভিচার হইত না । তাহা হয় নাই—মনের মতন যৌবন যায় নাই ।
 বিবাহে সুখ পাও নাই । সংযম অভ্যাগ ছিলনা তাই আপনি পরীর নষ্ট
 করিয়াছ, শ্রীর পরীর নষ্ট করিয়াছ, সম্মান সম্মতিকে ঠিক ভাবে সংসারে
 আনিতে পার নাই ।

এখনও বাহার যৌবনের পরীক্ষা চলিতেছে সে যদি যৌবন বিষয়াসক্ত না হয়,
 সে যদি যৌবন-মগ্নে একবারে মগ্ন হইয়া না থাকে, যদি তোমার পুত্র, কন্যা ও
 যৌবনে মগ্ন হইতেছে দেখিতে পাও, তবে একটু সংযম-শিক্ষা দাও । যে
 কর্মই করিতে নিযুক্ত করনা কেন যেন তাহাদিগকে তুমি কর্মের কৌশলটুকু
 অভ্যাগ করাইয়া দিও, নতুবা পুত্র কন্যার দুঃখ-জীবন অল্প পাপভাগী তুমিই
 হইবে । কর্মের কৌশল কি পরে আলোচনা করিতেছি ।

যৌবন-পরীক্ষার বিনি অকৃতকার্য হইয়াছেন তাহার সংসার সুখের হয়
 নাই । শ্রী পুত্র কন্যা বাধ্য হয় নাট । এই যে সংসারের কলগুলি—ইহাতে
 তোমাদের কাহারও দেহ পর্যন্ত ঠিক থাকিতে পারে না । একে সংযম অভ্যাগ
 নাই, তাহার উপর সংসারে কাহারও উপর দৃষ্টি ছিল না—কেহট কোন নিয়মে
 চলে নাট ; আপন পরীর ও মন যেমন উদ্ভাস ভাবে নাচিয়াছে, শ্রী পুত্র কন্যার
 দেহ ও মন সেইএক ব্যভিচারে নৃত্য করিতেছে, সুখ পাইবে কিরূপে ? একটু
 বুদ্ধ হইলেই পুত্র ও পুত্রবধূর নিত্য অশিষ্ট ব্যবহারে—খন থাকিয়াও দরিদ্রের
 মত, রাজা হইয়াও চোরের মত আপন সংসারে আপনি থাকিবে । একে
 অসংযত পরীর বলিয়া রোগের আলা, তাহার উপর বাহা ইচ্ছা তাহাই ব্যভিচার
 করিয়াছ—কখন খাড়াখাড়া বিচার কর নাই—আপনি অখাড়া খাইয়াছ—
 পরিবারস্থ সকলকে খাওয়াইয়াছ— খাওয়াইয়া সকলের দেহকে রোগের বিলাস-

তুমি করিয়াছ বল, এ প্রোঢ়াবহার সংসারের জন্ত, জী পুত্রের জন্ত তুমি ভুগিবেনা ত কে ভুগিবে ?

“আহার” জীবন-পরীক্ষার উপকরণের মধ্যে একটি প্রধান উপকরণ । ইচ্ছামত, যথেষ্ট, শাস্ত্রনিবিদ্ধ আহার, যিনি করেন তিনি ইংরাজী শিক্ষায় বিদ্বান হইলেও কৃষিকা পাইয়াছেন । যদি ঈশ্বর-ভাবনা, মৃত্যু সংসার-সাগর পার হইবার প্রধান উপায় বলিয়া স্বীকার কর তবে পরীক্ষা করিয়া দেখিও—কদম্বা আহার বা শাস্ত্রনিবিদ্ধ আহার করিলে ঈশ্বর ভাবনার কত অনিষ্ট হয় । শুধু শরীর রক্ষা জন্য আহার পত্তভেই করে । যিনি মনুষ্য তিনি শরীর রক্ষাকে গৌণ রাখিয়া ঈশ্বর চিন্তাকে মুখ্য করিবার জন্য আহার করিয়া থাকেন । শাস্ত্র আহারের সম্বন্ধে বড় সতর্ক হইতে বলিয়াছেন । বেদে বলিতেছেন “আহারশুদ্ধৌ সযত্নাঃ, সযত্নশ্চো জবা মৃত্তিঃ” ইতি ক্রতিঃ । রাজসিক তামসিক আহার ত্যাগ করিয়া, সাত্বিক আহার কর, তবে তুমি রজ ও তমোভাব বা লম্বাবক্ষেপ দূর করিয়া সযত্নে থাকিতে পারিবে । মন যখন নিরস্তর সযত্নে থাকিবে তখন জ্ঞানচর্য্যার জ্ঞান স্বাক্ষরীভাবে তোমার জগদ্ব অধিকার করিবে । শাস্ত্র ইহাও বলিয়াছেন ন্যায়োপার্জিত ধন দ্বারা যদি তোমার আহার্য্য সংগ্রহ না হয়, তবে তুমি কখন সাত্বিক থাকিতে পারিবে না ।

যদি তোমার শিক্ষা তোমাকে মূঢ় অহংকারী না করিয়া থাকে, তবে কারণ অহংসন্ধান করিলেই বুঝিবে বাহার অন্ন গ্রহণ করা বায় তাহার প্রবৃত্তিমত তোমার নিজের প্রবৃত্তি হইয়া যায় । এই জন্য একতৃতা সাধক, বাহার তাহার দান গ্রহণ করেন না, বাহার তাহার অন্নও আহার করেন না । অর্থ যদি তোমার নিতান্ত আসক্তির বস্ত্র হয়, তবে তুমি বাহার জন্য বাধা হইয়া অর্থ বায় কর তাহার অনিষ্টই হইবে । বাহার বাড়ীতে আহার করা যায়, সেই গৃহস্থানী বা গৃহস্থানিনী যদি মনে ভাবেন, এ আপন আর কতদিন আমার বাড়ীতে আহার করিবে—তবে অতিথি যদি ধার্মিক হইলেন তিনি সহজেই বুঝিতে পারেন যে ভোজন দ্রব্য গ্রহণে তাহার মন স্বচ্ছন্দ থাকিতেছে না—বাহ্য আহার করিতেছেন তাহা যেন পাপ অন্ন ভোজন করা হইতেছে । কথাটি যদিও হৃদয় তথাপি ইহা অশুভূত সত্য । একজনের এবং আসক্তির বস্ত্র ব্যবহারে অন্যের মনে হৃদয় ভাবে কষ্ট অশুভূত হইবেই ।

শাস্ত্র এই জন্য বাহার তাহার অন্ন গ্রহণ করিতে নিবেদন করিতেছেন । শাস্ত্র-নিবিদ্ধ বাধ্য গ্রহণ ত দূরের কথা, মহাত্মারত বলেন “রাজার অন্ন গ্রহণে ভোজের হ্রাস হয়, পুত্রের অঙ্গে ব্রহ্মভোজের হানি হয়, স্ববর্ণকার ও অধীর জীৱ অঙ্গে আয়ুর হানি হয় । বুদ্ধিজীবির অন্ন বিষ্ঠার সমান, বেস্তা ও পরপুরুষাভিলাষিণীর অন্ন শুক্ল সমান । অনিবেদিত কোন কিছুই অতক্য । শাস্ত্রি পক্ষ ৩৬ অধ্যায় ।

সাধুগণ আরও বলেন “পানীর অন্ন ও পানীর দান গ্রহণ করিলে উপাসনার বিষ হয়” ।

ক্ৰতি যে বলিতেছেন “আহারভক্ষো সবভক্ষিঃ সবভক্ষো এবাশক্তিঃ” ইহা অসুভব করিবার কথা । সবভক্ষি বা চিত্তভক্ষি ভিন্ন আত্মজ্ঞান কিছুতেই জন্মিবে না । আত্মজ্ঞান যদি না হইল তবে অন্যই বৃথা হইল । চিত্ত হইতে রজ ও তম দূরীভূত হইলেই চিত্ত শুদ্ধ হইল । মন-সংযম করিতে গেলেই—মনকে একাগ্র করিতে চেষ্টা করিতে গেলেই যে মনে নানা চিন্তা উঠে ইহা পাপের ফল । অনাটিকাল-সংকত কৰ্ম সংস্কারে চিত্ত দ্রষ্ট হইয়া আছে—সৰ্বদা লব ও বিক্ষেপে ইহা ব্যাকুল । সাবিক আহার ও শাস্ত্রবিহিত কৰ্ম দ্বারা ইহাকে শুদ্ধ করিয়া পরে জ্ঞান লাভ করিতে হইবে । ইহাই জীবনের কার্য্য । এই জন্যই আহার সবন্ধে সতর্ক হইতে হইবে ; পুত্র কন্যাকেও সতর্ক করিতে হইবে ।

সতর্ক করিবার উপায় শাস্ত্র যাহা বলেন—কৰ্মের কৌশল যাহা তাহা আলোচনা করিয়া আমরা এই প্রবন্ধ শেষ করিব ।

জীবনের বহু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারি নাই । তথাপি শেষ পরীক্ষার জন্য প্রাণ পণ করিলে স্তবকল প্রাপ্ত হইবে ।

চিত্তভক্ষি ত নাই । মৌখিক জ্ঞানের আলোচনায় তোমার কোন গতি লাগিবে না । গীতা সেই অন্য অশুদ্ধচিত্ত মনুষ্যকে কৰ্ম করিতে বলিতেছেন । কৰ্ম অর্থে শাস্ত্রবিহিত লৌকিক ও বৈদিক কৰ্ম । এখন কৰ্ম বিপর্য্যয়ের দিন । তথাপি চেষ্টা করিলে আমরা শ্রীভগবানের কৃপাপাত্র হইতে পারি । চেষ্টা করিলে তিনি সুবিধা করিয়া দিয়া থাকেন ।

মনে করা হউক তোমার কৰ্ম

(১) জপ পূজা সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্য কৰ্ম

(২) অধ্যয়নাদি

(৩) অধ্যাপনাদি

(৪) আহার, ভ্রমণ শয়নাদি

এই যে চারি প্রকারের কৰ্ম ইহার মধ্যে চতুর্থটি লৌকিক, অন্যগুলিকে বৈদিক কৰ্ম যে দান বস্ত্র তপস্তা ইহার মধ্যে কেলা যায় ।

যে কৰ্মই কেন করনা কৌশল করিয়া কৰ্ম করিতে হইবে । কৌশল দুইটি ।

(১) কৰ্মের কৰ্ত্তা আমি নহি ।

(২) আমার কৰ্ম ও আমার শক্তিতে হয় না । তোমার শক্তি ভিন্ন আমি কৰ্মও করিতে পারি না । প্রথম কৌশলটি জ্ঞানমার্গে, দ্বিতীয়টি ভক্তি-মার্গে । জ্ঞানমার্গের কথা ছাড়িয়া দিয়া ভক্তিমার্গে কৰ্মকৌশল আলোচনা করাই কর্তব্য, কারণ চিত্তভক্ষি ভিন্ন জ্ঞানালোচনা বৃথা । আর চিত্তভক্ষি হইয়াছে একরূপ সাধকও বিরল ।

বিশেষতঃ সন্ধ্যাবন্দনা জপ পূজা করিতেছি কিন্তু আমি কৰ্ত্তা নহি—“তোমার কৰ্ম তুমি কর না লোকে বলে করি আমি” এ কথা অসুভব করিয়া বুদ্ধিবার লোক বিরল হইয়া পড়িয়াছে ।

প্রার্থনা ।

প্রার্থনা ।

হে প্রভু ! হে অগতির গতি ! আমি এত দিন কৰ্ম করিলাম, কিন্তু সৰ্ব্ব কৰ্মে তোমায় মনে রাখা অভ্যাস করিতে পারিলাম না। “তুমিই যে আমার হৃদয়ের রাজা।” “তুমিই যে আমার কর্তা,” “আমি যে কর্তা নই” এই কথা এখনও অত্যন্ত হইল না, হে অগতির গতি ! আমার গতি বিধান কর। তুমি কৰ্মের কোণল বলিয়া দিতেছ, আমি আমার অনানি-নকিত পাপ-সংস্কার বশে, তোমায় ডাকিতে বসিয়া, তোমায় ভূগিয়া তোমায় পূজা করি ; তোমায় নাম জপ করি। তোমায় নিকটে কন্ম-নিষ্পাত্ত জন্য শক্তি প্রার্থনা না করিয়া, আমিই আমার শক্তিতে কন্ম করিতেছি বোধ করিয়া ফেলি—হে দয়াময় ! কবে আমার নিরন্তর মনে থাকিবে আমি কিছুই নই—আমি কর্তা নই, আমি তোমার দ্বারে কাপাল, আমি তোমার দ্বারে অতিথি, আমি তোমার দাসের—দাসের ও অবোগা ? তোমায় ছাড়িয়া আমার চক্ষু কর্ণাদি কত বাহিরের বস্তু দেখে—দেখিবার কালে একবারও মনে করে না। হায় ! তুমিই আমার ইন্দ্রিয় সংবন করিয়া দাও ! তুমিই আমার শক্তি প্রদান কর। আহাৰ্য্য বস্তু নিবেদন করিয়াও আমি তোমায় ভুলিয়া আহাৰ্য্য করি। প্রভু ! আমি বড়ই পাপী ! পাপী বলিয়াই এত যাতন্য পাই, পাপী বলিয়াই হুঃখ পাই। সকল প্রকার হুঃখ, সকল প্রকার মনোকষ্টই পাপের ফল—ইহা তোমারই কথা। হায় ! কত যাতন্য পাই কিন্তু যাতন্যও সব সময়ে স্মরণ রাখিতে পারি না—এত হুঃখেও হাহা হিহি করিয়া ফেলি—আহা প্রভু সেই অন্য আপনাকে আপনি ভিরঙ্কার করি—আবার সেই অপ-রাধ করি।

হে ভগবান ! কত দিনে আমার এই হাহাকার বুটবে !

পুনঃ পুনঃ অপরাধ করিতেছি, পুনঃ পুনঃ যাতন্য পাইতেছি তবুও স্মরণ অভ্যাস হইতেছে না। প্রভু ! কত দিনে তোমায় প্রতিদ্বন্দে স্মরণ করিতে পারিব ?

হে ভগবান ! কাতর না হইলে তোমায় ডাকা হয় না, তোমায় সন্ধ্যা পূজা হয় না। এতবার কাতর করিয়া দিতেছ—সব কাড়িয়া লইতেছ তথাপি যেই—সেই আছি—তথাপি কাতরতা স্থায়ী হইতেছে না। বুঝিতেছি তোমায় ডাকিবে মন। মনই যদি কাতর না হইল, মনই যদি আপন সংস্কার-জনিত চিন্তায় ভগমগ্ন রহিল, মনই যদি অসংলগ্ন চিন্তা-তরঙ্গে বিলাসী লোকের মত হাহা হিহিতে রহিল, তবে জপ পূজা কে করিল ? জপ পূজা মালা কিরান মুখের কথাতেই রহিল—সত্য বাহা চলিল তাহা মনের সংসার চিন্তা। বল প্রভু ! আমার কি হইতেছে। আমি মনকে বশ করিতে পারিতেছি না। প্রভু ! আমি চেষ্টায় ক্রটি করিব না। হে কন্মকল দাতা ! তুমি আমার শাস্ত্রীয় কন্ম নিষ্পন্ন করিয়া দাও তত্ত্বের আর আমার কেহ নাই।

শাস্ত্রমত শরীর ও বাক্যকে স্পন্দন করিতে বলিতেছে। শাস্ত্রকর্মই তোমার আজ্ঞা। তোমার আজ্ঞা পালন করিতে আমার সামর্থ্য নাই। শুধু ইচ্ছায় কি হইবে প্রভু! শক্তি যে নাই—তুমি শক্তি না দিলে আর ত কেহ দিতে পারে না। শক্তিরূপে তুমিই কর্ম করিয়া দাও আর যেন আমি কখন আপনাকে কর্তা বলিয়া না ভাবি। প্রতিশ্রুতি দেন জগদ্বন্দ্বী তোমাকে স্মরণ করিতে পারি, যেন বুঝিতে পারি তুমিই করিতেছ, যেন বুঝিতে পারি যাহা করিতেছি সমস্তই তোমার শাস্ত্র দ্বারা হইতেছে, আমি কিছুই নই।

তোমার শক্তিতে কর্ম করি, তুমি কর্তা আমি তোমার দাস প্রতি শ্রুতি, প্রতি রূপে যেন আমার ইহা মনে থাকে। আমার চেষ্টা তোমার নিষ্পত্তি—এই হউক।

জ্ঞান ও ভক্তির যোগ।

আমি যখন মনকে অঙ্গীকার না করি তখন আমার অবস্থা কি? ব্রহ্ম বধন মারাকে অঙ্গীকার না করেন তখনকার অবস্থার সহিত কি ইহার তুলনা করা যাইতে পারে?

মন যে নিরন্তর সঙ্কল্প বিকল্প তুলিতেছে ইহা কি আমার অহুমতি লইয়া তুলিতেছে অথবা আমার নিকটে থাকার ইহার মধ্যে সঙ্কল্প বিকল্প উঠিতেছে? চূষক কোন ইচ্ছা প্রকাশ না করিলেও গৌহ ইহার নিকটে আসিলেই ইহা কার্য্য করে। ক্ষুদ্রিকের কোন ইচ্ছা না থাকিলেও জবা নিকটবর্তী হইবামাত্র ক্ষুদ্রিক লোহিতবর্ণ হইতেছে। চূষক ও গৌহ উভয়েই জড়। ক্ষুদ্রিক ও জবা উভয়েই জড়। কিন্তু আমি চেতন আমার মন জড়। ব্রহ্ম চেতন ব্রহ্মের মাত্রা জড়। মনটা ভাবনা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, মাত্রাও ব্রহ্মের ভাবনা। আমাতেই ভাবনা উঠিতেছে সত্য কিন্তু আমিই যে ভাবনা তাহা নহে। ভাবনা হইতে আমি পৃথক। তবে ভাবনা এত শক্তিরূপে যে আমার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ করিয়া ইহা সর্ব্বের সর্ব্ব হইয়া কার্য্য করিতে পারে।

কিন্তু আমার অস্তিত্ব একবারে লোপ হইবার নহে। ইহা কখন ঘরনা যাইবেও না। বরং ভাবনা—বাহ্যর প্রত্যাপ এত অধিক তাহা নষ্ট হয়—অন্ততঃ কতক কতক সম্বন্ধের জন্য ইহা নষ্ট হয় কিন্তু আমি কখন নষ্ট হই না।

ভাবনা জড় হইয়াও—আমার তুলনার নথর হইয়াও ইহা যে আমাকে আচ্ছন্ন করিতে পারে ইহা কিরূপ? ইহাত প্রত্যেক করি ভাবনা পরন্তর বেগে চলিতেছে—মস্তকে ব্যতন হইতেছে, শরীর নিত্য অবসন্ন হইতেছে—আমি যেন নাই। আমরা আত্মবিস্মৃত হইয়া চিংকার করিতেছি, অনাস্ত হইতেছি, নিদারুণ ব্যতনা অহুত্ব করিতেছি। কতক্ষণ এই তুফান তুলিয়া ভাবনা আপনিই ক্রান্ত হইয়া পড়ে। কখন কখন আমি দেখি বহু ভাবনা উঠিতেছে সত্য, আবার যখন ইহাদিগকে তাড়াইয়া দিতে চেষ্টা করি তখনও

পারি না কখনও বা পারি । যখন পারি না তখন ভাবনার উৎপাদ দেখিয়া চূপ করিয়া যাওয়া সহ্য করি । সহ্য করিতে করিতে কতক্ষণ পরে ভাবনা শান্ত হইয়া যায় । কখন আমি বল পূর্বক ভাবনা হটাইয়া দিতে পারি । দিবার পরে একটা আনন্দ হয় । এ আনন্দেও যেন আমি আবদ্ধ হই । বলি আজ বেশ আছি । কিন্তু এই বেশ থাকার যে আনন্দ টেহাও আনন্দ-বিস্মৃতি । কারণ আমি আমার প্রিয়তম পরমাত্মার সচিৎ নিত্য মিলিত না হওয়া পর্য্যন্ত জানি কিছুতেই আমার চটল না । যে আনন্দ বেশ আছি বলিয়া ভুল করিয়াছিলাম তাহাও মনের প্রতারণা মাত্র । প্রতারণিত হইয়া আনন্দবিস্মৃত হইয়াছিলাম । আমি সর্বদা গভীর । গত প্রকার সুখ আছে বা দুঃখ আছে—এমন কি সংস্কৃতজনিত সুখও আমায় ভুলাইতে পারে না, সমাধিসুখও আমার ভুলাইতে পারে না ; কারণ বাহ্য অবিকল্পিত নহে তাহা আমি চাই না । বাহ্য বস্তিত তাহা আমি চাই না । বাহ্য পরিচ্ছেদ আছে তাহা আমার প্রিয় নহে, সমাধি হইতে যখন বৃহ্মান আছে তখন সমাধিও আমার প্রিয় নহে । তবে সমাধি যদি আমার আনন্দাধীন হয়—যখন ইচ্ছা করিব যে মুহূর্ত্তে ইচ্ছা করিব সেই মুহূর্ত্তেই সমস্ত ভাবনা দূর করিয়া আমার প্রিয়তমের সহিত মিলিতে পারিব—আবার ইচ্ছা হইলে বাহ্য তাহার সহিত রঙ্গ করিব আমার এ অবস্থা বাঞ্ছনীয় বটে । আমি স্বাধীন যদি হইতে পারি তবেই আমার চির-আনন্দ থাকে । যখন ইচ্ছা করিলাম সমস্ত সঙ্কল্প দূর করিয়া দিয়া, সমস্ত সংসারের খেলা ধূলা সাজ করিয়া, আমার প্রিয়তমের সহিত মিলিলাম, ইহা যখন আমার ইচ্ছাধীন হয়, এ বিষয়ে বাধা যদি কেহ না দিতে পারে, তবেই আমি আমার প্রকৃত অবস্থায় থাকি । এই অবস্থাই আমি চাই । সংসার থাক, ভাবনা থাক, দেহ থাক, সবই থাক, আমার কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু আমি স্বাধীন থাকিব । যখন ইচ্ছা এই দেহ পর্য্যন্ত দূর করিয়া কেহিয়া দিতে পারিব—যখন ইচ্ছা সর্ব লোকে ঘাইব, কারণ আমার গতি সর্ব স্থানে অক্ষুণ্ণ । এই স্বাধীনতা আমার প্রার্থনীয় ।

এই স্বাধীনতা কি লাভ হয় ? কিভাবে লাভ হয় ? শাস্ত্র মত কার্য্য করিলে কি ইহা পাওয়া যায় ? ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উঠিয়া সন্ধ্যা পূজা করিলে হয় ? মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যাকালে, সন্ধ্যা অভ্যাস করিলে হয় ? কিন্তু সন্ধ্যার কোন ভাবনা যদি আমার মন, আমাকে করিতে না দেয়, অথচ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উঠিয়া খুব জোর করিয়া আবৃত্তি মাত্র করিয়া যাই তাহাতে বিশেষ কিছুই হয় না তাহাত

এত কাল দেখিতেছি। যোগাদি দ্বারা মনের উপর একটা ছোর হস্ত তাহাও দেখিতেছি কিন্তু ইহাও চির দিনের জন্য হয় না। আর ভাবনার উৎপীড়ন সহ্য করিয়া থাকিতে থাকিতে, যোগাদি না করিয়াও, একটা স্বাধীনতার অবস্থা আনিয়া দেয়, যখন আমি পরমাত্মার কথা যতদূর ইচ্ছা ভাবিতে পারি সন্ধ্যার ভাবনা ভাবিতে পারি তখন যেন কতকটা স্বাধীনতা পাঠ। কোনট ভাল—পূর্ব জোর করিয়া যোগ করিয়া কখন সক্ষম কখন অক্ষম চেষ্টা ভাল, না যখন দেখিলাম ভাবনাকে আয়ত্ত করিতে পারিতেছি না তখন সন্ধ্যা পূর্ণা যোগাদি না করিয়া ভাবনার উৎপীড়ন লক্ষ্য করিতে করিতে সমস্ত সহ্য করিয়া ভাবনাকে ক্রান্ত করিয়া পরে আপনার কার্য্য করা ভাল ?

যদি সেহ ছাড়িতে হয় কোনটাতে উপকার বেশী হইবে? রোগের যাতনা যখন নিতান্ত প্রবল হইবে তখন সন্ধ্যা করিবে কে? যোগ করিবে কে? কিন্তু সহ্য করাটা যদি অভ্যাস হইয়া যায়—ভাবনা যাঁহা করে কক্কর আমি স্বাধীন হইতে পারিতেছি না বটে, উহাকে দূর করিতে পারি না বটে—কিন্তু পরাধীন হইয়াও উহার সমস্ত উৎপীড়ন সহ্য করিতেছি—আর নিঃশব্দে সমস্ত দেখিতেছি—মৃত্যুকালে কি ইহা কোন উপকার দিতে পারিবে?

কি উপকার দিবে—যাতনা দিতে দিতে শেষে আমাকে মারিয়া ফেলিবে—আমি বতই কেন করি না আমাকে আত্মবিস্মৃত করিয়া মোহগ্রস্ত করিবেই। মৃত্যুটা মহাবিস্মৃতি—ভারি আত্মবিস্মরণ। বিস্মৃতিই যদি হইল তবে সহ্য করিবে কে?

এক উপায় আছে—ভাবনার যখন উৎপীড়ন হয় তখন সহ্য করিতে করিতে আমার প্রিয়তমকে ফাঁক বুঝিয়া জানান এই অভ্যাসই নিতান্ত আবশ্যিক। সমস্ত যাতনা কালে যদি স্মরণ করিয়া তাঁহাকে বলা যায় 'আমি পারিতেছি না,' তবে জীব সেই সময়ে পরমাত্মতাব প্রাপ্ত হইতে পারে। জ্ঞানের সাধনার সহিত ভক্তির যোগ এই রূপ।

কথাটি পাইলাম হৃৎকের দ্রষ্টা থাকিয়া প্রিয়তমকে ডাকা। সন্ধ্যা জিহ্বা ইত্যাদি শুধু আবৃত্তিতে বিশেষ কিছুই হইবে না। কিন্তু সন্ধ্যার ভাবনা করা আবশ্যিক বা সৃষ্টিক্রম বিতিক্রম ও সংহারক্রম ভাবনা করা আবশ্যিক। এই ভাবনা যখন মনের উৎপীড়নে সম্পন্ন হয় তখন আবৃত্তি বন্ধ করিয়া উৎপীড়ন সহ্য করিতে করিতে প্রিয়তমকে ডাকা কর্তব্য। জ্ঞান ও ভক্তির যোগ এইরূপ।

উৎসব ।



ওঁ ত্রী আশ্বারামায় নমঃ ।

অষ্টৈব কুরু যচ্ছ্রয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষাসি ।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে ॥

২য় বর্ষ]

১৩১৪ সাল, আশ্বিন ।

[৬ষ্ঠ সংখ্যা]

বর্ষায় পথিক ।

গগনে ঘন ঘটা নিঝুম রাত ;
চকিত দামিনী ক্ষণ ভায় ।
বিজন বন ভূমি অজানা পথ—
পবন স্থনিছে বেদনায় ।
নিবিড় তরু শির অঁধারি ঘোর
বরষা নেমে এলো সরোবে ।
রজনী সখী তারে ভেটিল যতনে,
কাঁপিল তলু হিম পরনে ।
সুধাব কারে আজি গৃহেরি পথ ?
ধূসরে আবৃত বন কায় ।
গভীর গরজন গহন তদূরে
আছাড়ি পড়িছে যাতনায় ।
এ ঘোর ছদ্মিনে কে আছে বল মোর ?
পথিকে লইবে পরিচয় ।

বিহগকুল আজি কুলায়ে লুকানিত,
 প্রকৃতি ভীষণ অভিনয় ।
 কেহ কি নাহি তবে বিপদ বন্ধ,
 প্রবাসী ছেন পথিকের ?
 মুছাতে অশ্রু, ঘুচাতে বাতনা—
 জীবন আশ্রয় অতিথের ।

শ্রীহরিশঙ্কর চক্রবর্তী

ভারতে দুর্গাপূজা

১

বিদ্যাহে, ধীমহি, প্রচোদয়াৎ ।

পূজার সমস্ত আয়োজন ত ভারত বৃড়িয়াই হয় । শুধু মাহুবে নয় ভারতের
 প্রকৃতিতেও । প্রকৃতির পূজা পরে বলা বাইবে অগ্রে মাহুবের কথা বলা
 বাউক ।

পূজা এখনও হয়—কোথাও ঘটে পটে, কোথাও মূর্তি গড়িয়া । কোথাও
 মানসে । হিন্দুর পূজা বখানামাধা বিধিমতই হয়, তথাপি হিন্দু বাহিরে, তথাপি
 হিন্দু আজ ভিতরে ঢুকিতে পারে না । কেন পারে না ? কেন হিন্দু আজ
 ঠিক ঠিক বিশ্বাস করিতে পারে না দেবতা জীবন্ত, পূজা স্বাভাবিক ?

কেন পারে না ইহাই ত জিজ্ঞাস্ত । জগৎ জননীর পূজার কেন হিন্দু
 ছুটিয়া আসে না, কেন হিন্দু প্রাণভরা আগ্রহে, অলস উৎসাহে মার জন্ত
 সর্বস্ব দিতে পারে না, কেন হিন্দু বাজে নাচতামসায় খরচ করে বেশী, আর
 পূজার বেলায় করে বিস্তশাঠা ?

পিতা পিতামহের খাতিরে বা তাঁহাদের নাম রক্ষার জন্ত বা নিজের নাম
 চোল মারিয়া জাহির করিবার জন্ত বা লোক নিন্দা ভরে প্রতিমা গড়িয়া পূজা
 করে—কিন্তু নিত্য সাংসারিক বুদ্ধিতে পূজা করে—না করিলে পাছে
 অমঙ্গল হইয়া যায়—কেন এই জ্ঞাতি ভরে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয় ? দেবতা
 জীবন্ত ইহাতে সম্বোধ করে কেন ?

দেবতা দেখা দিয়া থাকেন, দেবতা উদ্ভাৱ করেন এই বিশ্বাস গেল কেন ?
 স্মরত বাজা পূজা করিয়া অল্প দিনেই শত্রুকুল নির্মূল করিয়াছিলেন, নিজ

রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আর মৃত্যুর পরে স্বর্গাদেব হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়া সাবর্ণিক মনু হইয়াছিলেন—তুমি আমি পূজা করিয়া কিছুই লাভ করিতে পারি না কেন ?

সমাধি বৈশ্বকে দেবী বর দিয়াছিলেন—

বৈশ্ববর্ষ্যবরা যন্ত বরোহমন্তোহতিবাঙ্কিতঃ ।

তং প্রযচ্ছামি সংসিদ্ধো তবজ্ঞানং ভবিষ্যতি ॥

বৈশ্ব দিব্যজ্ঞান চাহিয়াছিল বৈশ্ব তাহাই পাইয়াছিল । কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাকালে শ্রীভগবান অর্জুনকে দুর্গার ধ্যান করিতে বলিয়াছিলেন, অর্জুন দুর্গার রূপ ও গুণ কীর্তন করিয়া মনকে দুর্গাজ্ঞানে আবদ্ধ করিয়া ধ্যান করিলেন - অর্জুন দুর্গার দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, যুদ্ধে জয় লাভ করিয়াছিলেন । দেবগণ অম্বর হস্তে লাক্ষিত হইয়া বহবার শ্রীমাতেশ্বরীর আশ্রয় গ্রহণ করেন, আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহারা অম্বরদিগকে পরাস্ত হইতে দেখেন— ইতিহাসে এই সমস্ত আছে কিন্তু তোমার আমার ভাগ্যে ত দর্শন লাভ হয় না ? কেন হয় না ইহাই জিজ্ঞাস্ত ।

যাহারা হিন্দুর শত্রু তাহারা বলিবেন শাস্ত্র মিথ্যা । শাস্ত্র কল্পনা—মিথ্যা । গল্পে পূর্ণ, আর যাহারা শাস্ত্রে শ্রদ্ধা করেন তাহারা বলিবেন শাস্ত্র মিথ্যা নহে শাস্ত্রের ইতিহাস কল্পনা বাক্য নহে, দর্শন এক শাস্ত্র যাহা বলিতেছেন তুমি তাহাই কর অগৎ-জননীর সাহায্য তুমি পাইবে ।

যাহারা অবিখ্যাসী তাঁহাদিগকে বলিবার কিছুই নাই । যাহারা বিখ্যাসী তাঁহাদিগকে বলি প্রথমেই বিদ্যাহে । প্রথমেই জ্ঞান জানিলেই ধ্যান হইবে । ধ্যান হইলেই দর্শন হইবে । তুমি স্থল হইয়া থাকিয়া সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শক্তিময়ী দর্শন করিবে কিরূপে ? এতি অড়বস্ত হইতে ও যে উর্দ্ধাধঃ-সকারী শক্তিপূজা নিরন্তর বাহির হইতেছে ইহা দেখিতে গেলেও তোমাকে কত পরীক্ষা করিতে হয় আর শক্তিময়ীকে দেখিতে যে পরীক্ষা আবশ্যক তাহার কিছুই না করিয়া বলিবে দেবতা নাই—ইহা কি প্রভাকরকে হাতে গড়া বলিব না ?

শাস্ত্র বলেন যাহার পূজা করিবে তাহাকে অগ্রে জ্ঞান । এই জ্ঞান পরোক্ষ জ্ঞান । শাস্ত্রেই ইহা আছে—তুমি তাহাই বিচার করিয়া জ্ঞদরে আলোচনা কর ।

দুর্গা নামের ভিতরে যে ভাব—দুর্গা নাম যে এক তাহাতে পাই—ইনি

দুর্গাম্বরকে নাশ করেন—ইনি দুর্গ অর্থাৎ শঙ্কট হইতে জ্ঞাপ করেন, ইনি মহাবিষ্ণু, মহাত্ম্য ভববন্ধন, শোক, দুঃখ, নরক, বনশস্ত্র, জনন মরণ এই সমস্ত ধ্বনন করেন তাই ইঁহার নাম দুর্গা ।

দৈত্যনাশার্থং বচনো দক্ষাঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ।

উকারে বিয়নাশস্ত বাচকো বেসমন্ততঃ ।

হেঁফো রোগৰ বচনে গম্ভ পাপৰ বাচকঃ।

ভদ্র শত্রুঘ্ন বচনশ্রীকার: পরিকীর্তিত: ।

স্বভাসি প্রবণাৎ যন্তা এতেন্তনিসিন্দিতং ।

ততো চুর্ণা হব্যে: শক্তির্হরিনা পরিকীৰ্তিতা ॥

পাওয়া গেল হুর্গা ভগবানের শক্তি। অগত শক্তি হইতেই জন্মিতেছে। শক্তি মধ্যে যে শক্তিতে বিশ্ব নাশ হয় তাহাই হুর্গা। সকল বিশ্ব, সকল বিশক্তি নাশ করেন তাই হুর্গা। সকল বিশ্ব নাশের জন্য হুর্গা পূজা। শ্রীভগবান রামচন্দ্র অকালে এই পূজা করেন—রাবণ বধ জন্য। অস্ত্র সেবতা তখন সমাধি-নিদ্রায় থাকেন তাই অকালে বোধন আবৃত্ত্য হইয়াছিল।

শাস্ত্র বাক্য মিথ্যা নহে, তোমার আমার পূজা হয় না। পূজার পূর্বের কার্য ধ্যান—ধ্যানের পূর্ব কার্য জ্ঞান, জ্ঞানের পরের কার্য প্রার্থনা, আহ্বান, পরে সমাধির পূজা। কোনটি হয় ?

পূজা হয় না সভ্য নতুবা জাতির উন্নতি থগে না কেন ? লোকে বলে
অন্ত জাতি ত পূজা করে না তাহারা ত বেশ আছে । তাহারা বেশ থাকিবে
না কেন ? যে জাতির যাহাতে অধিকার সে সেই কর্ত্ত কক বেশ থাকিবে ।
কুহুই বা বান্দরে পূজা করে না তা বলিয়া কি তাহারা দুর্কল হইয়া যাইবে—
তাহাদের অধিকাণের কার্য তাহারা করে—করিয়া ভাল থাকে—তোমার
অধিকারের কার্য তুমি কর, ভাল থাকিবে । না কর কষ্টে পড়িবে ।

পূজাতে তোমার অধিকার আছে। করিতে হইবে—তাই আলোচনা
কিমে পূজা হয় ? কোথায় সেই মেধা ঋষি যিনি এই জাতিকে আবার পূজা
করাইবেন ?

বাঁহারা ক্ষমতাবান, তাঁহারা ঐশ্বর্যের সন্ধানে প্রাণপণ চেষ্টা করেন। আমাদের তত বল নাই তবে বাঁহা পারি তাহাই করিব। আমরা মায়ের নাম লইয়া— তাঁহার মূর্তি হৃদয়ে বসব্দর পারি আনিয়া ঐ মন্ত্রক্লিণী মূর্তিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি—মা! হুঃখহারিণি। দুঃখিতনাশিনি। মা সংসারার্ণবতান্নি। বড়

শব্দে পড়িয়াছি মা। তুমি বলিয়া দাও কেন তোমার পূজা হয় না? কি করিলে মা তোমার পূজা হইবে?

এত বড় এই পূজার ব্যাপার এই ব্যাপারেও হিন্দু প্রাণে প্রাণে মাতেন—না—ইহাই ত হুঃখ। ইহা এই অস্ত্র পণ্ডিত-মণ্ডলীর আলোচনা। পণ্ডিতেরা আলোচনা করেন না কিরূপে জীবন্ত পূজা হইবে? সেই অস্ত্র মূৰ্খ লেখকে বাহা জানে তাহাই লিখিয়া বসে। আমরা তাঁহার নাম লইয়া বাহা পারি শাস্ত্রালোচনাই করি। আশা রাখি বাহারা যথার্থ কথার “চাপরাশ” পাইয়াছেন তাঁহারা যেন হুঁগাপূজাকে বল প্রদান করেন।

আর এক কথা বলিতে ইচ্ছা হয়—হুঁগা পূজা ত হয় না সত্য, কিন্তু কোন্ পূজা হয়? প্রণব বড় গুপ্তমন্ত্র। ইহাও ত চিঠির মাথার, সান্তার ধারে, মালুকের হাতে বুক উঠিয়াছে। যেমন “পতিই পরম দেবতা” ত্রীলোকের হৃদয় ছাড়িয়া মাথার খোঁপায় উঠিয়াছে প্রণবও সেইরূপ উঠিয়াছেন। কিন্তু এই প্রণব এই গায়ত্রীই ব্রাহ্মণের পরীক্ষা। কে কতদূর ব্রাহ্মণ আছেন তাহার পরীক্ষা যে যতদূর প্রণব হৃদয়ে ধারণা করিতে পারেন যে যতদূর সন্ধ্যার ক্রিয়াগুলির সহিত গায়ত্রীর অর্থ চিন্তা করিয়া ভরষা হইতে পারেন।

তাই বলিতেছি শুধু মন্ত্র নিলে কি হইবে? সন্ধ্যাপূজা হওয়া চাই।

পূজার প্রধান সামগ্রী জ্ঞানও ধ্যান। বাহাকে জানি তাঁহার ধ্যান হয়। বাহার ধ্যান হয় তিনি আমাদের কাছে তাঁহার স্থানে আকর্ষণ করেন।

বিদ্বাহে ধীমহী প্রচোদয়াৎ—বড় প্রয়োজনীয় এই তিনটি।

হুঁগা কে জান, হুঁগার ধ্যান হইবে। ধ্যান হউক হইলেই মা আমার আকর্ষণ করিবেনই। দেখা দিবেনই—দিয়া আপনার ধামে লইয়া যাইবেন।

মানস ব্যাপারে আর এক বিপত্তি হয়। প্রার্থনা করিয়া, আহ্বান করিয়া আনিয়া পূজা না করিলে কোন্ লোক হুঃখিত না হয়? ৫৭ বটা মানস ব্যাপার দ্বারা বাহাকে ডাকিলে; এত বহু করিয়া বাহাকে আনিলে তাঁহার সমাদর করিলে না তিনি থাকিবেন কেন?

তুমি আমি জানিতে চাই হাত ধরিয়া কি কৈলাসে লইয়া যাইবেন? এত বড় কথা তাঁহার একান্ত ভক্ত বলিতে পারেন। আমরা লোকের বিক্রম অগ্রাহ্য করিয়া বিশ্বাস করিলেও এতদূর বলিতে পারি না। বাহা অশুভব সীমার আনিতে পারি তাহাই বলিতে চাই, অস্ত্র কথা বিশ্বাসে রাখি।

তিনি আমাদের বুদ্ধিকে যৌক্তিকভাবে লইয়া যান। গীতার শ্রীভগবানও

ইহা বলিয়াছেন “নদামি বুদ্ধযোগং তাং যেন মামুপযাস্তি তে” ।- আমি বুদ্ধিকেই আকর্ষণ করি বুদ্ধিকেই প্রেরণ করি । বুদ্ধি যার মোক্ষমার্গে গেল তাহার যাইতে আর রহিল কি ?

জিজ্ঞাসা ছিল কিরূপে তাঁহার কাছে বাওয়া যায় ? উত্তর ধ্যান করিলে । ধ্যান কিসে হয় ? তাঁহাকে জানিলে । তবে প্রথমে জানা চাই—জানিয়া ধ্যান চাই, তবেই তাঁহাকে পাওয়া যাইবে ।

আমাদের হৃদয় সন্দেহে ভরা । আমরা জিজ্ঞাসা করি তাঁহার কাছে গেলে কি আমার সকল স্বর্থ ভোগ হইবে ? আমার কি লব আকাজক্ষা মিটিবে ?

এ সব কথার উত্তর দেওয়া যায় না । আমরা জানি সংসার বড় ক্রেশের স্থান, মৃত্যু বড় যাতনাময় । জানি সংসারে কোথাও জুড়াইবার স্থান নাই । বাহ্য স্বর্থ দের মনে করি তাহা হুদিনেই ফুরাইয়া যায় । হুদিনের অন্ত কোন বস্তু চাই না । একরূপ ভোগ করিতে আঁগ চায় না । যদি বিশেষরূপে জানিতে পারি এই স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, টাকা, বাড়ী, গাড়ী, বাগান—এই অর্থোপার্জন—এক কথায় এই কামিনী কাকন হুদিনের অন্ত—বসি কেহ আগে আগে ইহা বৃষ্টিতে পারেন, এত পরিশ্রম বাহার জন্য করি সে হুদিন পরেই অন্যের হইবে, আমার কাছে থাকিবে না—যিনি ইহা আগে আগে বৃষ্টিরাছেন—এই স্ত্রী মরিয়া অন্যের হইবে, এই পুত্র মরিয়া অপরের হইবে, এই ধন আবার অন্যে ভোগ করিবে—তবে তিনি কখনই এই নখর বস্তু লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না ।

কিন্তু লোকে এত অন্ধ যে ইহা মনে আনিতে চায় না । ভগবান তথাপি লোককে বুঝাইয়া দিতেছেন । ধনী দরিদ্র হইতেছে—তাঁহার কত সখের কত সাধের গাড়ী, ঘোড়া, রাজ্য রাজতন্ত্রা অন্যের হইতেছে—ইহা দেখিলে আগে কেমন অস্থির হয়—তাহা বাহার হইতেছে সেই বৃষ্টিতেছে, অন্যে দেখিয়া নিখিতে পারে না ।

এই পৃথিবীতেই ত দেখা যায় বাহ্য এক দিন আমার ছিল তাহা আজ অন্যের হইয়াছে । আমরা একটু দেখিলেই বৃষ্টিতে পারি যে এই স্ত্রী, এই ধন অন্যের হইয়া যাইবে—কিন্তু অত্যাশক্তি বশতঃ মনকে পাকে প্রকারে বুঝাইয়া দি যে স্ত্রী মরিলেও আমার থাকিবে । মিথ্যা কথা । এক মাত্র সত্যী স্ত্রী বলিতে পারেন তাঁহার স্বামী চির দিন তাঁহার থাকিবে । নতুবা বিধবার যে কালে বিবাহ হয় সে কালেও এই অন্তরে এক জনের বড় আদরের স্ত্রী

আবার অন্যকে আদর করে, অন্যের আদর নেয়। তবে মরিলেও যে কামিনী কাকন নিঃশেষ থাকিবে ইহা যে বিশ্বাস করিতে চায় সে বড়ই মোহগ্রস্ত। কিন্তু যিনি জানিতেছেন এসব কিছুই থাকিবে না—ইহারা আমার সঙ্গে যাইবে না যিনি প্রাণের অন্তরালে ইহা আনিতে পারিয়াছেন তিনি ব্যবহারিক কার্য ঠিক করিয়াও ভিতরে এই প্রণয় করিবেন তবে আমার কে আছে? কে আমার আপনার? কে আমার সঙ্গে যাইবে?

যে আমার জননে মরণে সখা, যে আমার শ্রমানে রাজদ্বারে দেখা দেয়, যে আমার বিপদে সম্পদে হাত ধরে, যে আমার কষ্ট দেখিলে সহিতে পারে না, যে আমার সুখী দেখিলে আনন্দ করে, যে আমার সর্বদা ভাল, সেই আমার আপনার—সেই আমার পিতা, মাতা, ভাই, সখা, ভগ্নী, ভ্রাতা, পুত্র, কন্যা। একাধারে সব। সেই আমার আছে—তারে ছাড়িয়া আর যাঁহাকে আমার আমার বলি তাহারা আমার নয়। আমিও তাহাদের নয়। তবুও যে বলি সে কেবল ভুলে। ইহারা বেশধারী অথচ এমনই মোহ যে ভাল করিয়া বুঝি না ইহারা বেশধারী কিরূপে?

যে দুর্গাকে পূজা করিতে চাই সেই দুর্গা আমার আপনার। একি করনার কথা বলিলাম? দুর্গাকে যিনি জানিয়াছেন তিনিই বলেন এই দুর্গাই ব্রহ্ম, এই দুর্গাই প্রণব, এই দুর্গাই মহাশক্তি, ইহা করনা নহে, ইহা সত্য। এই দুর্গাই বরণীয় ভগ্নী। এই দুর্গাই সাকার নিরাকার। এই দুর্গাই সত্যী, সীতা, রাধা লক্ষী সরস্বতী মহাকালী, মহাকাল, রাম, কৃষ্ণ, শিব ব্রহ্ম—বেখানে যত শক্তি আছে সমস্তই ইনি।

বহ্নৌ সা দাহিকা শক্তিঃ প্রভাশক্তিঞ্চ ভাস্করে ।

শোভা শক্তিঃ পূর্ণ চন্দ্রে জলে শক্তিঞ্চ নীতলা ॥

শস্যপ্রসূতি শক্তিঞ্চ ধারণা চ ধরাহু সা ।

ব্রাহ্মণাশক্তি বিপ্রেষু দেবশক্তিঃ অরেষু সা ॥

তপস্বিনাং তপস্যা সা গৃহিণাং গৃহদেবতা ।

মুক্তিশক্তিঞ্চ মুক্তানাং মায়্যা সাংসারিকসা সা ॥

মজ্জাকানাং ভক্তিশক্তির্ময়ি ভক্তিপ্রদা সন্মা ।

নৃপাপাং রাজ্যলক্ষীন্ড বণিজাং লভ্যক্লপিনী ॥

ইত্যাদি। শক্তিই পূজার বস্তু নহে। এই শক্তি যে শক্তিমানের, যে শক্তিমান ও শক্তি জড়িত হইয়া জগতে খেলা করিতেছেন তাহার পূজাই করি।

এস এস যদি দুঃখ ঘূর করিতে চাও, যদি ভারতে আবার অশ্রুনাশিনীর হাসি ভরা মুখ দেখিতে চাও, যদি সত্য সত্যই মাকে আবার ভারতে আনিতে চাও, তবে আর একবার ‘বিদ্রোহে বীমহি প্রচোদরাং’ অভ্যাস কর । নিশ্চয়ই মা আসিবেন ।

যাহাকে প্রতীকে উপাসনা করিয়া সুখ পাও, যে স্বদেশ ও পরদেশকে দুর্গা না বলিলে উপাসনা করিতে পার না—যে স্বদেশের ও পরদেশের উপর দুর্গার ভাব আরোপ করিয়া বল

সুমনুসুমিত ক্ষমদল শোভিনীঃ
সুহাসিনীঃ সুমধুরভাবিনীঃ
সুখদাং বরদাং মাতরং

যে স্বদেশকে ও পরদেশকে দুর্গার ভাবে ভাবিত করিয়া বল :—

অনন্ত কোটি কণ্ঠ কল কল নিনাদ করালে

যে দুর্গা সত্য সত্যই স্বদেশ ও পরদেশ, যিনি সত্য সত্যই সহস্রবীৰ্য্য, সহস্র-
হস্তা, যে স্বদেশকে ও পরদেশকে দুর্গা ভাবে জীবন্ত করিয়া বলিতে হয় মা
তুমিই আমার ঈশ্বরী

অং হি দুর্গা দশপ্রহরনধারিণী
কমলা কমলদলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদাহিণী
নমামি ত্বাং—নমামি মাতরং

বলিতেছিলাম বাংলার প্রতীকোপাসনার এত সুখ—এস এস একবার তাঁহাকে
সাক্ষাতে উপাসনা কর । রবিগণ এই উপাসনা শিখাইরাছেন, রাজগণ এত
উপাসনা করিতেন—তুমি আমি করি এস—আমাদের সকল ভয় দূর হইবে—
সকল বিপদের শাস্তি হইবে ।

বলিতেছি যদি জীবন্ত দেবতার পূজা চাও তবে প্রথমে দেবতাকে জান ।
দেবতাকে জানিয়া নিত্য একান্তে বসিয়া সাধনা দ্বারা তাঁহাকে হৃদয়ে সজাগ
রাখিতে অভ্যাস কর । এই সাধনা অন্যতম জ্ঞান জানাইতেছেন তিনি কে ?
বলিতেছেন :—

সর্গে বৈ দেবা দেবীমুপতপ্তাঃ । কাহদি ত্বং মহাদেবী ? সাংস্রবীদহং
ব্রহ্মবরুণিনী । মন্তঃ প্রকৃতি পুরুষাহংস্রকং অগচ্ছূনাং চাহ শূন্যং চ ।
অহমানন্দানাং হনন্দাঃ । বিজ্ঞানাং বিজ্ঞানেহম্ । ব্রহ্মাহব্রহ্মণী বেদিতব্যো
ঈত্যাহংস্রকণী শ্রুতিঃ ॥

ভাবার্থ এই—দেবতাগণ দেবীর নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন মহাদেবি! আপনি কে? দেবী বলিলেন আমি ব্রহ্মবরুণিণী, আমি। হইতেই প্রকৃতিপুরুষাত্মক জগৎ, শূন্য অশূন্য উদ্ভিষ্টাছে। আমি আনন্দবরুণিণী—আনন্দবরুণিণী। আমি বিজ্ঞান—অবিজ্ঞান, আমিই ব্রহ্ম আমিই অব্রহ্ম। অপর্য্যক্ৰান্তি হইয়াই বলেন।

• ঐহিক ধ্যান করিতে হইবে তাঁহার স্বরূপ জানা আবশ্যক। জানা না হইলে ধ্যান হয় না। ধ্যান না হইলে দেবীর নিকটে যাওয়া হইবে না। দেবীর আগমন হইবে না।

বশিষ্টদেব বলেন

পূজনং ধ্যানমেবাত্মন্যন্য নন্তস্য পূজনং ।

তস্মাৎ জিভুবনাধারং নিত্য ধ্যানেন পূজয়েৎ” ॥

অন্তরে ধ্যান করাই এই দেবের (আত্ম দেবের) পূজা। ইহা ব্যতীত ইহার পূজার অন্য ক্রম নাই। আর জিভুবনের আধার এই দেবীকে সর্বদা ধ্যান দ্বারা পূজা করিবে।

বাহ্য পূজার পূর্বে মানস পূজা আবশ্যক। বিনা মানসপূজায় কোন পূজা সিদ্ধ হয় না। ধ্যানের জন্যই জ্ঞান আবশ্যক। সেই জন্য প্রতি মহাদেবীকে দেখাইতেছেন। এস এস একবার চিন্তা কর নিরাকার সাকার বাহ্য কিছু সমস্তই এই মহাদেবী। অহং পঞ্চ ভূতাজ্ঞপকভূতানি। অহং অখিলং জগৎ। বেদ অবেদ বিদ্যা অবিদ্যা—অজ্ঞা অনজ্ঞা—অধ উর্দ্ধ তীর্থাক্ষুদ্র বহু আদিভা বিশ্বদেব মিত্রাবরুণ ইন্দ্র অগ্নি অশ্বিনীকুমারদ্বয় বাহ্য কিছু জগতে মঙ্গল আছে এক আমিই তাহা ধরিয়া ধরিয়া রহিয়াছি।

যে অনন্ত শক্তির উপরে এই জগৎ ন্যস্তমান। যে চিৎ শক্তি—যে অমুভব শক্তি—সকল বস্তুর অস্তিত্ব, যিনি না থাকিলে কোন বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না, তিনিই এই মহাদেবী। যিনি মূর্তি ধারণ করেন, যিনি অমূর্ত - এই দেহ যিনি; মন যিনি, মনের সঙ্কল্প বিকল্প যিনি, লব বিক্ষেপ যিনি, যিনি সকলে আছেন—ঐহীকে লইয়াই সকল তিনিই এই মহাদেবী। শ্রীমাতেশ্বরীকে জানিয়া তখন দেবতাগণ বলিলেন।

নমো দেবৈষ্য মহাদেবৈষ্য শিবাতৈ সত্যতঃ নমঃ ।

নমঃ প্রকৃটৈষ্য ভদ্রাতৈ নিয়তাঃ প্রণতামৃতাম্ ॥

দেবগণ পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন—

তামগ্নিবর্ণাং তপসা জগন্তীং বৈরোচনীং কৰ্ম্মকলেষু জুষ্টাম্ ।

দুর্গাং দেবীং শরণ মহং প্রপদ্যে স্তুত্বাং নাশয়তে তমঃ ॥

কে এই মহাদেবী?—এই বিশ্বরূপ ঐহিক—যিনি বৈষ্ণবী, যিনি ব্রহ্মমাতা, যিনি সরস্বতী, যিনি অদ্বিতি, যিনি সাক্ষদ্বিভা, যিনি শিবা, যিনি মহালক্ষ্মী যিনি সর্বসিদ্ধিপ্রদা—এস এস তাঁহাকে জ্ঞান, তাঁহাকে প্রণাম কর। এস এস এই বিশ্বমাতাই স্বর্গে মর্তে। এই বিশ্বমাতাই আত্ম শক্তি। এষাৎশক্তিঃ।

এবং বিশ্বমোহিনী পাশাছুপ ধরুর্দ্বাং ধরা । এষা ত্রিমহাবিদ্যা । যিনি ইহাকে জানেন তিনিই শোক হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন ।

ব এবং বেদ স শোকং তরতি । এস এস ইহাকে নমস্কার কর— বল—নমস্কে অস্ত্র ভগবতি মাতর স্বামণাকু সর্কতঃ । বল মা তোমাকে নমস্কার করিতেছি মা আমাকে সর্কত পালন কর । অষ্টবস্ত্র একাদশ কুঙ্গ্র দ্বাদশ আদিত্য তুমিই । অম্বর হইতে, পিশাচ হইতে আমাদের রক্ষা কর । তুমিই সবারজ্জম । তুমিই প্রজাপতি, ইজ্র ময় ; তুমিই গ্রহ নক্ষত্র জ্যোতিষ্কমণ্ডলী, তুমিই কলাকাষ্ঠাদি কালরূপিনী তোমাকে আমি নিত্য প্রণাম করি । তামহং প্রণোমি নিত্যম্ ।

তাপাপহারিণীং দেবীং কৃষ্ণমুক্তিপ্ৰদায়িনীম্

অনন্তাং বিভ্রাং শুদ্ধাং শরণ্যাং শিবদাং শিবাম্ ।

এস এস এই আকাশরূপিনী বীতিহোত্রসমম্বিতা অর্ধেন্দ্রলসিতা দেবীকে সর্কার্থসিদ্ধি জন্য বীজ মন্ত্র দিয়া উপাসনা কর । এস এস ইহাকে জানিয়া ধ্যান কর । এস এস আনন্দময়ী, জ্ঞানময়ী, বায়বী, সূর্য্যচন্দ্রস্বরূপিনী আদিত্য পথ-গামিনীকে হৃদ পুণ্ডরীকে ধ্যান কর ।

হৃৎপুণ্ডরীকমধ্যস্থং প্রাণসূর্য্যাসমপ্রভাম্

পাশাছুপধরাং সৌম্যাং বরদভরহস্তকাম্ ।

জিনেত্রাং রক্তবসনাং ভক্ত কাম হৃদাং ভজে ।

নমামি বামহং দেবীং মহাভরবিনাশিনীম্ ।

বড় ভয় উপস্থিত হইরাছে—এস এস এই মহাভরবিনাশিনীকে হৃদয়ে ধারণ কর—ধারণ করিয়া নির্ভয় হইয়া যাও । শশানে মশানে তোমার কোথাও ভয় থাকিবে না । মায়ের স্বরূপ হুজের । ব্রহ্মাংহদরো ন জানন্তি—ব্রহ্মাদি ইহার স্বরূপ জানেন না । ইহার অস্ত্র নাই তাই অনন্ত—ইহাকে গ্রহণ করা যায় না তাই অলক্ষ্য—ইহার জন্ম উপলব্ধি করা যায় না তাই অজা, তিনি একাই সর্কার আছেন তাই তিনি একা—

অতএবোচ্যতেহজ্ঞেয়াহনন্তাহলক্ষ্যাহৈক্যকানেকৈতি ॥

বস্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী তুমি, শব্দের জ্ঞানরূপিনী তুমি । তুমি চিত্ররী, চিত্রদাতীতা—মূর্ত্ত্যের ও মূর্ত্ত্যাক্ষিনী তোমা ভিন্ন অন্য কিছুই নাই । তুমি হুগী তুমি হুগীমা, তুমি হুগীচার বিঘাতিনী মা ! আমরা ভবতীত হইরাছি—সংসারার্ণব তারিণী আমরা তোমার নমস্কার করিতেছি ।

নমামি ভবতীতোহহং সংসারার্ণবতারিণীম্ বেদ এই ভাবে “বিশ্বহে” অর্থ জানাইতেছেন । পূজার প্রথমেই অগ্রে তীহার নিরাকার সাকার রূপ চিত্রা কর, নিত্য কর, করিয়া ধ্যান কর—নিশ্চয়ই তিনি আসিবেন নিশ্চয়ই হৃদয়ে উদয় হইবেন ।

ঋতি, পূরণ, ভজ বাহা শিক্ষা দিলেন তাহাই সত্য । শাস্ত্র সত্য বলিরাছেন । তুমি করিয়া দেখ, সত্য কথা বৃথিতে ক্লেষ নাই ।

তবে এস ভারত—একবার হুগী পূজা করিয়া হুগী পূজা কর ।

ঈশ্বরি বলেন “ উভে প্রাজ্ঞাপত্য ” দেবতা ও বীর সন্তান অশ্বুরও তাঁরই সন্তান। এই হর্গা আপন সন্তান কে যে আপনি বিনাশ করিতেছেন সন্তান হুট হুটলে বিনাশ ও করিতে হইবে। তুমি যে পারনা—তুমি জাননা তাই।

আরও একটু উপরে উঠিলে দেখিবে আশনি আপনাকে লইয়া খেলা ভিন্ন জগতে কিছুই হইতেছে না।

যে হর্গাকে জগৎ বলিতেছ, জগৎ প্রসবিত্রী বলিতেছ, জগৎপাতীত বলিতেছ—যিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই, তিনিই মূর্তি ধরিয়া আপনায় এক অংশকে, আপনায় আর এক অংশ দিয়া দলিত করিতেছেন। দেবতার জন্য অশ্বুর বিনাশ করিতেছেন। আর দেবতাদিগের বিলাসিতা, দেবতাদিগের আলস্য হইলে অশ্বুরকে বর দিয়া বাড়াইয়া দিতেছেন এইত বরাবর চলিতেছে, তবু দৃষ্টিতে বলিবার ভাবিবার অনেক থাকে। সব কথা বলা যায় না। বলিতে পারা ও যায় না।

কথা ছাড়িয়া কাজে আসাই উচিত। পূজা সম্বন্ধে। অবসরও আসিবে। একটু ভাল করিয়া মাকে জানিয়া মাকে ডাকিতে অভ্যাস করিয়া রাখিলে কি মন্দ হইবে? করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি?

যখন ঐ প্রাণভরা মূর্তি—ঐ দশ হস্তে দশপ্রহরণধারিণী, চণ্ডমুখ মন্দিরী, রক্তবীজাশনি, মহিষাসুরমন্দিরী রম্য কণ্ঠিনী—যখন ঐ মাটিতে গড়া মূর্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইবে—যখন মার সেই মূর্তির পাণে চাহিয়া চাহিয়া পূজক দেবদেব মাকে ডাকিবে—যখন বেদমন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে—যখন চারি দিকে সমস্তই শুষ্ক, সমস্তই নির্মূল, সমস্তই পবিত্র বস্ত্র দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সাধক কাতর প্রাণে মাকে আসিতে বলিবে—তখন—তোমার প্রাণে যদি মা আসিতে পারেন তবে ঐ ধূপ ধূনা গুণ্ডল গন্ধে স্নগন্ধীকৃত মণ্ডপস্থিত পবিত্র মূর্তিতে মা না আসিবেন কেন?

জগৎ যদি একটা ভুল শিক্ষা দিয়া থাকে তবে কি আপনায় বস্ত্র না দেখিয়া—লোকের বাহিরের চাকচিক্য দেখিয়া বাহিরের জাঁক জমক দেখিয়া, বাহিরের স্বাধীনতা দেখিয়া, বাহিরের সুখ দেখিয়া তাহাদের অনুকরণে ছুটিয়া বাইতে হইবে? আর বলিতে হইবে—বেদে যে কালী হর্গার নাম আছে তাহা প্রক্ষিপ্ত। গীতা প্রক্ষিপ্ত, বেদ প্রক্ষিপ্ত, যোগবাশিষ্ট প্রক্ষিপ্ত, অধ্যায় রামায়ণ প্রক্ষিপ্ত, ভাগবত প্রক্ষিপ্ত, পুরাণ প্রক্ষিপ্ত, তন্ত্র প্রক্ষিপ্ত—কেই বা এত প্রক্ষেপ করিল আর যাহা প্রক্ষেপ করিল তাহাই বা এত সুলভ কিরূপে হইল? গীতা কি মহাত্মারত হইতে নিকৃষ্ট? না অধ্যায়রামায়ণ লিখিবার শক্তি অন্য কোন ব্যক্তির আছে? অথবা যোগবাশিষ্ট লেখার কথা দূরে থাক—আজ কাল কার কোন পণ্ডিতের যোগবাশিষ্ট বুঝিবার শক্তি আছে—যোগ বাশিষ্ঠের সত্য উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য আছে—না যোগবাশিষ্ট যে সাধনা করিতে বলিতেছেন তাহাতে পৌছিবার সামর্থ্য আছে? তবে তুমি যেই হওয়া কেন তুমি প্রক্ষিপ্ত বলিলে লোকে শুনিবে কেন? তুমি কর দিন সত্য কথা ঢাকিয়া রাখিবে বল? তোমারই ত সাংসারের সব সত্য বলিয়া

আপনাদের শত্রু আপনাদের ধর্ম আপনাদের আচার ব্যবহারকে পদ দলিত করিতে ছুটিয়া ছিলে ? এখনও দুই চারি স্থানে একটু আধটু অহুকরণ চলিতেছে—অহুকরণ কর দিন থাকিবে ? দেবতাকে আহুত ভাব কত দিন মোহিত করিয়া রাখিতে পারে ?

তাই বলি সময় আসিয়াছে একবার দেখা উচিত—একবার করা উচিত ।

এস এস কি করিতে হইবে একবার আলোচনা কর—করিয়া কাজ কর । অভ্যাস কর । পূজার সময় সত্য সত্যই অপূর্ণ দেখা যাইবে । মূর্তি বড় সুন্দর লাগিবে । ঐ মূর্তিই যে দাস্ত অনন্ত এক সঙ্গে, বৃদ্ধা যাইবে ।

এই দেখ শরত কাল আবার আসিল । দিক নির্মল হইল, নদী তড়াগের জল প্রসন্ন হইল । শেকালিকা কুটিল—পদ্ম ভাদিল বড় সুন্দর হইল । প্রকৃতিও পূজা করিতে ছুটিল । পূজা স্বাভাবিক দেখ । বলিতেছি শরৎ কাল “আবার” আসিল । এই “আবার” কথার মধ্যে কতকি যেন রহিয়া গেল । কত স্মৃতি যেন এই কাল বহন করিয়া আনিল । “আরও আবার আবার করিয়া কেহ কিছু চাহিবে না ” “এইত সবাই চায় ” “এইত সবাই তেমনি সাজে সাজিয়া বাহির হইল ”—মা আগমন কালে মা কাহারও প্রাণে আবেগ ঢালিয়া দিলেন—কেহবা সুখের কল্পনা করিল । থাক্ এ কথা আর বলা গেল না ।

যে কাঁদে কাঁছুক, যে হাসে হাসুক শরৎ কাল তেমনি সাজিয়াই আসিল ।

আকাশ সর্বাঙ্গে শোভা বিস্তার করিয়া দাঁড়াইল । দিনের বেলা ঘন নীল আকাশ—তার তলে অতি শুভ্র তুলার পর্কত । কিছু দিন পূর্বে বর্ষার ধূসর বর্ণের জল ভরা মেঘ আকাশে আকাশে শব্দ করিয়া ছুটিয়া বেড়াইত । আরও পূর্বে গ্রীষ্মকালে শুধুই নীল আকাশ ছিল । মেঘের কচিং আবির্ভাব তিরো-ভাব হইত ।

সমস্ত গ্রীষ্ম বর্ষা ধরিয়া প্রকৃতি কি করিয়াছিল ? একথা আজ আমরা জোর করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারি । এ শুধু কবির কল্পনা নহে । এত দিন আমরা বাহ্যকে জীবন্ত বলিয়া উপাসনা করি—যে জলের কাছে আমরা প্রার্থনা করি, যে আদিত্য পুরুষকে আমরা জিসন্ধ্যার অর্থ্য দিয়া থাকি, যে আদিত্যমণ্ডলমধ্যবর্তী কুমারী বৃষভা বৃদ্ধা মূর্তিকে আমরা ধ্যান ধারণার আনিতে চেষ্টা করি, বাহ্যকে আশ্রয় করিয়া আমরা মৃত্যু সংসার-সাগর পার হইতে চাই—এত দিন শত চীৎকার করিয়াও ঐবিদিগের সত্য কথা ঐবি বংশধরেরা গ্রহণ করে নাই । আজ এতকাল পরে হুলদর্শী জগতের চক্ষু খুলিতেছে । জগৎ আর কিছুই জড় বলিতে প্রস্তুত নহে । আমাদের ত্রি জগদীশ বহু দীর্ঘায়ু হউন । তাঁহার পরীক্ষণক সত্য কথার জড় বিজ্ঞান চেতন বিজ্ঞানে আসিতে পারিলেও পারিতে পারিবে । ইংরুপো কি হইবে বলা যায় না ; আমাদের ঘরের বালক বালিকা ঐবিদিগের বাক্যে অশ্রদ্ধা করিবে না । নাস্তিকদিগের সাক্ষান কথার প্রত্যয় করিবে না । জল বায়ু আকাশ পৃথিবী অগ্নি—সবাই চেতন । সকলের মধ্যে প্রাণ আছে । আরও

একটু স্বীকার করিলে দেখিবে সকলের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা আছেন। এক মহাশক্তিমান পুরুষ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের দৃশ্য প্রত্যেকে প্রবিষ্ট হইয়া সকলকে ধরিয়া রহিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন উপাধিতে তিনি ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি ধরিয়াছেন। প্রকৃতিতেও পূজা হয়। আপনাকে আপনি পূজা। স্বরমন্য-
“মিবোহন্নম”। মোটামুটি জানা হইল। প্রত্যহ ইহার চিন্তা চাই। চিন্তা করাই সাধনা। তবে শাস্ত্র লভন করিয়া চিন্তা করার কোন লাভ নাই। তাই সাধনার সঙ্গে “ভাবনা” আবশ্যিক। বেক্রপ অভ্যাস চলিবে তৎক্ষণাৎ বাহ্য আবশ্যক তাহাও আলোচনা করা যাউক।

শেষ রাত্রিতে উঠিতে অভ্যাস করা চাই। পূজার স্থান পৃথক থাকা চাই। বিছানার বসিয়া হয় না। বাহিরে ভিতরে তুচ্ছ চাই। শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান চাই। হস্ত মুখ ধৌত করা চাই। নতুবা আলস্য অড়াইয়া থাকিবে। সব করা দ্বার আর ভ্রমণ জননীকে ডাকিবার জন্য একটু পবিত্র স্থান কি রাখা যায় না? দ্বার—করিয়া লইলেই হয়। যাহাদের এতটুকুও হয় না—তাহাদের চেষ্টা নাই। বাড়ীর সকলের যদি এক ইচ্ছা হয় তবে সহজেই হয়। যেখানে হয় না সে সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত। যাহাদের সঙ্গে হয় সেই সঙ্গ করা উচিত। সকল সাধু কার্যে “মরিয়া” হইতে হয়। মৃত্যুত নাই—তবে লোকের হাস্য বিক্রমে সাধু পথও ত্যাগ করিতে বাহারা প্রস্তুত তাহারাই কাপুরুষ, তাহারাই আত্মপ্রবঞ্চক, দেশের কণ্টক। ইহারাই স্বার্থের জন্য স্বদেশকে, স্বমাতাকে অন্যের ক্রোড়ে তুলিয়া দিতে পারে। বল চাই—সাধু কার্যে বল আবশ্যিক। সত্যের জন্য গ্রাণ দাও, স্বর্গ আছেই।

আসনে স্থির ভাবে উপবেশন করিয়া একবার হর্গাকে চিন্তা করিয়া লও। চক্ষু নিম্নীলিত কর—অন্ধকার ঠেকিবে। ইহাও হর্গা—যে মন চঞ্চল হইতেছে, যে শরীর অস্থির বোধ করিতেছে এই শরীরাত্মস্বরবর্তী প্রতি জীবাত্ম, এই স্বাস শ্রবাস এই আগন্ত অনিচ্ছা এই আকাশ বায়ু জল আগমন মূর্ত্তিকা—বাহ্য আছে, যাহা: দেখিতেছি বাহ্য ভাবিতেছি—সে ভিন্ন কিছুই নাই। বাহ্য মনে আসিতেছে—বৃক্ষলতা মাধুৰ্য পণ্ডিত নক্ষত্র আকাশ সূর্য্য আলোক অনিচ্ছা বুদ্ধ বিগ্রহ দেবতা অস্থির বাহ্য আছে সমস্তই সে। এই মন। মনও সে। তাহার সত্যর আমায় আমি টুকু হারাইয়া গিয়াছে। কে কাহার পূজা করিবে? তথাপি পূজা করিতে হইবে—ডাকিতে হইবে। মা আমার আপনিই দেবতা আপনিই মন্ত্র আপনিই সাধক। আপনিই পারিতেছেন আপনিই পারিতেছেন না—স্বপ্ন দ্বঃখ—কিছুই নাই—পারিলেও নাই না—পারিলেও নাই—সর্বদা আনন্দ।

এই আনন্দে কণ্ঠ করিয়া যাও হউক না হউক এ কথা এখানে নাই। ফল কামনা এখানে নাই—একটুতেই স্বপ্ন একটুতেই দ্বঃখ এখানে নাই—আপন ভাবেও থাকা হইল—কণ্ঠও চলিল। বড় স্তূপের অবস্থা ইহা। আলোক অনিচ্ছা অড়তা চিন্তা অচিন্তা সব মিলিয়া এক অপূর্ণ স্তূপের অবস্থা আনিয়া দিল। লক্ষ্যাবলম্বনা বড় স্তূপের হইয়া গেল—শরীর যেমন থাকে

কিছুই ক্ষতি হইল না—ভাল নাই মন্দ নাই, এ কথা আর অসিল না—জপ পূজা বেশ চলিল। মূর্তি বেশ করিয়া আসিল। ধ্যান বেশ চলিল। ধ্যান করিতে করিতে মূর্তি ছাড়িয়া তুভু বস্ব ব্যাপী কি এক সীমা শূন্য শক্তির চিন্তা আসিল—তুধু শক্তি নহে—যাহার এই শক্তি যাহার এই বরপীর তর্গ বেন নেই বরপীর ভর্গের উপর মন চড়িয়া বসিল।

সমুদ্র তীরে উপািস্ত হইবা মাত্র সমুদ্রের ভিতর হইতে এক স্নন্দর পদ্ম ভাসিয়া উঠিল—সেই পদ্মের উপর বসিবা মাত্র তীরের দিক হইতে স্নন্দর তরঙ্গ মনোহর পদ্মকে সমুদ্র মধ্যে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। তরঙ্গে তরঙ্গে হেলিতে ছলিতে স্নধা সমুদ্র মধ্যবর্তী মণিষীপে পৌছাইয়া দিল। সেখানে স্নন্দর স্নন্দর সাধকের সহিত বসিয়া অপূর্ব অপূর্ব ভাবে পূজা হইল। সবই সে—সবই তার খেলা—আমিও সে—তবুও বেন সেবা করা হইতেছে। অদৈত হইরাও বৈতভাবে জপ পূজা ব্যবহার চলিল। ক্রমে শাস্ত্র অবহার ধ্যান করিতে পারা গেল—সাকার নিরাকার যাহার যাহা কুচি-মূর্তিতে ভাবেতে যতক্ষণ ইচ্ছা থাকে গেল। জপ পূজা সাজে এইরূপ ধ্যান অভ্যাস করিতে করিতে ভিতরে বাহিরে, একাকি বা লোক সঙ্গে সেই একই বহু হইয়া আপনার সহিত আপনি বন্ধ করিতেছে এই ভাব আসিবে। অস্থায়ী বিষয়ে, ক্ষণ স্থায়ী সাংসারিক ভাবে আস্থা থাকিবে না—তথাপি সাংসারের কর্ম চলিবে মুক্তির দিকেও অগ্রসর হওরা যাইবে। নিত্য কর্ম এই ভাবে অভ্যস্ত হউক শাস্ত্র বিধি লঙ্ঘন না করিয়া সন্ধ্যা পূজা জানিয়া—তাহাকে জানিয়া তাহার ধ্যান অভ্যাস হইতে থাকুক। পূজার শুভ মুহূর্ত আসিতে বিলম্ব নাই তখন ভাল করিয়া পূজা হইয়া যাইবে।

আমরা এতক্ষণ যাহা বলিতেছিলাম তাহা সংক্ষেপতঃ এই—

“দেবে পরিচর্যো নাস্তি বদপূজাকথন্তবেৎ”

যাহার সহিত পরিচর্য নাই তাহার পূজা হয় কিরূপে? পরিচর্য কোথাও শুনিয়া কোথাও দেখিয়া।

শুনিয়া যে পূজা তাহা বিশ্বাসে। দেখিয়া যে পূজা তাহা ভক্তিতে। হিন্দু দেখিয়া—পরিচর্য করিয়া, পূজা করেন। তাই মূর্তির এত আদর।

যাহার মূর্তি নাই, তাহার মূর্তি তুমি গঠন কর কিরূপে? তুল কথা তাহার মূর্তি নাহুবে গড়ে না। তিনি আপনি মূর্তি ধারণ করেন—ভক্তের জন্য। “ভক্ত চিন্তামুসারেণ জাগতে ভগবান্ অজঃ” যিনি অজ—যাহার জন্ম নাই—তিনি ভক্তের চিন্তাতৃপ্তির জন্য মূর্তি গ্রহণ করেন। মূর্তি না দেখিয়া বিশ্বাসী এক ভাবে চলে—সংসার করাই ইহাদের মুখ্য কথা, বিশ্বাস রাখিয়া একটু পবিত্র ভাবে সংসার করিয়াই যার। বিশ্বাসী এই পর্যন্ত করে। ইহাদের নিরাকার হইলেও চলে। কিন্তু ভক্তের নিরাকারে চলে না। ভক্ত যাহার জন্য তুচ্ছ সংসার তুচ্ছ করে—যাহার জন্য সমস্ত ভোগেচ্ছা বিসর্জন দেয় তাহাকে সর্বোস্ত্রিয় দিয়া ধরিতে চায়। সে কেমন দেখিতে—সে কত স্নন্দর, সে কেমন কথা কয় ইহা না হইলে ভক্তের চলে না। তাই

শ্রীভগবান ভক্তচিহ্নে উদয় করেন। বাহিরে প্রকট হইয়া কথা কহেন। জীড়া করেন। অনন্ত শক্তি অনন্ত থাকিয়াও সান্ত মূর্তিতে দেখা দিয়া ভক্তের মানসরঞ্জন করেন। মূর্তি মানুষের কল্পনা নহে। সাধকের হিতের জন্য ব্রহ্মরূপ কল্পনা। এক কল্পনা কে করে? লোকে ভুল বিশ্বাস বলে মানুষ ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করে। বড় ভুল কথা। ব্রহ্মই আপন রূপ কল্পনা করেন। কপ সামর্থ্যে। যিনি সর্বশক্তিমান তাঁহার কি একটা মূর্তি ধরিবার সামর্থ্যও নাই? তুমি প্রিয়ের মনোরঞ্জনের জন্য কত সাজিয়া শুজিয়া দেখা দাও আর তিনি? যে তাঁহার জন্য মরিয়া বাইতেছে তাহাকে তাহার মনোমত ভাবে দেখা দিতে পারেন না? এতটুকু শক্তিও যে ঈশ্বরের নাই সে ঈশ্বরকে আবার পূজা করে কে? সে নিরাকার কি আবার ঈশ্বর—না একটা ফাঁকা কল্পনা—এবাটা ফাঁকা বানান কথা?

এস এস এই কুবুজি, এই মোহের কথা ছাড়িয়া আজ পূজার দিনে পূজা করি এসে জ্ঞান ধ্যান ও পূজা হউক। ইহাতে তাঁহাকে সন্তোষ করা যাইবে। তাঁহার সন্তোষই প্রার্থনা। তবু তাই বলেন—

দুর্গা দুর্গেতি দুর্গেতি দুর্গা নান পরং মনুম্ ।

যো জপেৎ সততং চণ্ডীং জীবন্যুতঃ স মানবঃ ॥

মহোৎপাতে মহারোগে মহাবিপদে সন্তটে ।

মহাভঃখে মহাশোকে মহাভয় সমুখিতে ।

যঃ স্মরেৎ সততং দুর্গাং জপেৎ যঃ পরমং মনুম্ ।

সজীব লোকে দেবেশি নীলকণ্ঠ্য মাধুরাং ॥

আজ বড় শুভ দিন। এস এস মার পূজা কন্যা—কুত্র কুত্র অভিমান বিসর্জন দিয়া কুত্র কুত্র “আমি ভাল” “আমি বুদ্ধিমান” “আমি চরিত্রবান” আর “সেই চরিত্র হীন” এই সমস্ত বিরোধ বাক্য ত্যাগ করিয়া—সবাই মিলিয়া এক প্রাণ হইয়া হিংসা ঘেঁষ ত্যাগ করিয়া জননীর পূজা করিবে আইস। এস এস—ঐ গুন মা ডাকিতেছেন। ঐ গুন পূজার বাজনা বাজিতেছে মা আসিয়াছেন—মা মওপে।

আর কি “ভাই ভাই ঠাই ঠাই” এর সময় আছে? এই সময় একবার বাড়ীর ভিতরে গর্ত ধারিণী জননীর পূজা করিয়া লও। দেখ দেখ তোমরা ভাই ভাই ঠাই ঠাই বলিয়া মা যে বড় বিবস। এস দেখি একবার জীবন্ত জননীর পূজা করি?

কখন জীবন্ত পূজা করিয়াছ? যে পূজার বৃত্তিতে পারা যায় মা সন্তট হইয়াছেন? মা হাসিয়াছেন? এস এস আজ ত সময় আসিয়াছে।

যদি কখন গর্ত ধারিণী জননীকে সন্তট করিতে চেষ্টা না করিয়া থাক তবে একবার এই পূজার সময়ে সাক্ষাৎ সন্ধ্যা মাতৃ পূজা কর। একবার মাতার পূজা মাতার পূজা বধু সবাই মিলিয়া নৃতন বস্ত্রাদি আনিয়া মাকে প্রদান কর। মাতাকে ভাল করিয়া আহাৰ্য্য দ্রব্য প্রদান কর। জীবনের বড় একটা কার্য্য হইয়া থাকিবে—যদি স্বহস্তে একবার মাতৃ সেবা কর। এ

দেবী জগৎ জননী গ্রহণ করিবেন। তোমার এ পুণ্য তোমার ইহ ও পর-
জীবনের মূলধন স্বরূপ থাকিবে। একবার করিয়া দেব ইহাতে লজ্জা কি ?
যদি জিজ্ঞাসা কর পুত্রগণ ও পুত্র বধূগণ কোথাও কি মার পূজা করিয়া-
ছিল ? ছিল ঠৈ কি ।

মা যাইতেছেন পিতালয়ে। পিতা বজ্র করিবেন। কন্যার নিমন্ত্রণ
চর নাই। কন্যা বিনা নিমন্ত্রণে পিতালয়ে যাইতেছেন। কোন প্রকার
বক্তালাভার নাই—মা বিনা সজ্জার যাইতেছেন—বিবাহে মুখ শশী ঢাকা
পড়িয়াছে। পিতা জামাতার উপর ক্রোধ করিয়া বজ্র করিয়াছেন—জামাতাকে
বর্জ্য ভাগ দিবেন না।

মাতা চলিয়াছেন—পথে পুত্রের সহিত দেখা হইল। পুত্র মাতার বেশ
দেখিয়া আশ্চর্য্য হইরাছে। জিজ্ঞাসা করিল মা এ বেশে কোথায় যাইবে ?
বস্ত্র মধ্যে বাঘ ছাল আর অলঙ্কার মধ্যে রুদ্রাক্ষের মালা। মা পিতালয়ে
যাইতেছেন তাহাই বলিলেন। পুত্রের প্রাণে বাধা লাগিল। পুত্র বলিয়া
উঠিল “বাপ ঘরে বাবে কিবা বাঘ ছাল পরে।” না না আমি সন্তান থাকিতে
এ বেশে তোমার যাইতে দিব না। মা ভূমি একবার আমার আলয়ে আইস।
মা পুত্রের কথা শুনিলেন। তখন পুত্র রুদ্রাক্ষের মালা পরিবর্ত্তে—মণিমুক্তা
বিজড়িত বহু অলঙ্কারে দেহ সাজাইয়া দিল। বড় সুন্দর বস্ত্রে মাকে সাজাইল।

আজ পুত্রের মনে আনন্দ ঘরে না। প্রকৃত আনন্দের ধর্ম্ম এই যে সে
আনন্দ বিতরণ করিতে ইচ্ছা হয়। পুত্র মাকে সাজাইয়া অন্তঃপুরে গিয়াছেন—
মার পুত্র বধূকে দেখাইতে। বধূ আসিল পুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন—দেখ দেখি
মা কেমন সাজিয়াছেন ? বধূ বড় ভক্তি ভরে প্রশংসা করিল—করিয়া বলিল
—মার আমার সজ্জা হয় নাই। পুত্র চমকিত হইল—বলিল এত প্রশংসনে
সাজাইলাম তবুও তোমার মনে ধরিল না ? না হয় তুমি একবার সাজাইয়া
দাও। বধূ ভরাপ্রাণে উদ্যানে গেল। বড় সুন্দর করিয়া অর্ঘ্য সাজাইয়া
তখন আনন্দে উন্মত্ত হইয়া মায়ের চরণে অর্ঘ্য দিল দিয়া বলিল রাজ্য জবা
চরণে না দিলে কি আর মার সজ্জা সম্পূর্ণ হয় ? “ও চরণে জবা বিনা সাজে
কিহে কত ?” তখন কত আনন্দ উঠিল। তাই বলিতেছিলাম—যদি কখন
মার পূজা না করিয়া থাক তবে মার পুত্র ও পুত্র বধূ মিলিয়া একবার মাকে
পূজা করিয়া আনন্দ ভোগ কর—তোমাদের ঠাই ঠাই দূর হউক।

সত্যাই এবার পূজা হইবে। বিপদকাল উপস্থিত না হইলে মা আসেন
না। বিনা বিপদে মার পূজা হয় না। বিপদের আর থাকি কি আছে ?
জল প্রাবনে দেশ ভাসিয়া গেল, হৃর্ত্তিকে চারি দিকে মৃত্যু রোল উঠিল, ভূমিকমল,
প্লেগ, ম্যালেরিয়া, বিপদের বাকী কি ?

মা আসিবেন—এইরূপ সময়েই মা চির দিন আসিয়াছেন। যখন সৃষ্টির
আদিতে কিছুই ছিল না—সমস্ত এক ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল তখন
পরমাত্মা প্রথমে এই পূজা করেন। আবার যখন চারি দিকে জল—মূল
কোথাও ছিল না—তখন জলশারী নারায়ণের কর্ণমল হইতে মধু টেকট

নামক ছুই দৈত্য নারায়ণের সহিত পদ্মবাসী ব্রহ্মার হিংসার্থ গমন করে। ব্রহ্মা সেই সময়ে পূজা করেন। ইহাই দ্বিতীয় পূজা। আবার ত্রিপুর দানব' বিনাশ সময়ে দেবাদিদেব জননীর পূজা করেন ইহাই তৃতীয় পূজা। মার চতুর্থ পূজা ইন্দ্র সমাধা করেন। ইন্দ্র লক্ষ্মী ব্রহ্ম হইয়াছিলেন। মার পূজা করিয়া স্বর্গ রাজ্য অধিকার করেন। ইহার পরে দেববিগণ এই পূজা প্রচার করেন। এই পর্য্যন্ত মার যে পূজা হইয়াছিল সে পূজা মার চিত্ররীমূর্তির।

আবার কত কাল গেল। আবার অগস্ত্যের গুহা খসিল। সুরত রাজ্য ও সমাধি ঠৈশা রাজ্য ও গৃহ হইতে বিভাঙিত হইয়া বনে আসিলেন। সেখানে মেঘা ঋষি মিলিল। ঋষির নিকটে তাঁহার। শক্তিকে জানিলেন। জানিয়া চিত্ররীকে ঋগ্বী মূর্তিতে ডাকিলেন। মা আসিলেন—মা বর দিলেন। উত্তরে দণ্ডা হইয়া গেলেন। মার অকাল বোধনের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। বাস্তবিকিতে নামের এই পূজার কথা নাই, অন্য পুরাণে আছে। সকল যুগে একরূপ হয় না। তোমার ইতিহাসের মত ইতিহাস তাঁহার। লিখিতেন না। মোটের উপর প্রকৃত কথা এই যে কল্পে কল্পে পার্থক্য আছে। পুরাণে পুরাণে এই অন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার পার্থক্য দেখা যায়। ইহা দেখিয়াই অল্পে বুদ্ধি লোক ভাবে সব প্রেক্ষিত। এই সমস্ত নাস্তিক ভাব ত্যাগ কর। বেদ, পুরাণ, ভক্ত নিজের অমুভব বাহ্য বলিতেছে—বাহ্যর সীতিমত ইতিহাস পাওয়া বাই-তেছে তুমি ইংরাজী মত লইয়া যদি বল সব প্রেক্ষিত তোমার কথা বিখা-সের যোগ্য কিদে ? তবু যে এত দিন লোকে তোমার কথায় শ্রদ্ধা করিতে বাইতেছিল সেটা মোহে—তোমার বাহিরের চটকে। এখন তোমার কথা ও কাজে এক দেখিতে না পাইয়া লোকের মোহ ভাঙ্গিয়াছে—তুমি আপনার শাস্ত্রকে ভক্তি করিতে পারনা—আপনার মনে ও যুগে এক নও—তোমার কথা মত লোকে চলিবে কেন ? লোকের চক্ষে কয় দিন ভুল। দিয়া রাখা যায় ? তুমি নিজের কিছুই দেখিলে না—গয়ের চাকচিকা বাহিরের সজ্জা দেখিয়া ছুটিয়া গিয়াছিল—সে চটক ভাঙ্গিয়াছে। বাহ্যর অমুভব করিতে দিয়া-ছিলে সেই এখন তোমার কথাই বলিতেছে। আহা!য়ের পরে পান খাওয়া উচিত ইহাও ইহুয়ে'পে আশ্রিত হইতে চলিল। প্রধান প্রধান সব আচার ব্যবহার ঠিক। পূজাত মহৎ ব্যাপার। বড় প্রাণতরা জিনিষ ইহাতে আছে, এখন এস মার পূজা কর।

আগমনী ।

(১)

প্রভাতে অরুণ রাগে
জাগিছে নবীন প্রাণ ।
আগমনী গাহিব না
গাহিব কি গান ?

(২)

নবশ্যাম দুর্ধা শিরে
শিশির মুকুতা নোভে ;
বুঝিবা সে রেহ অঐশ্বর্য ।
আগমনী গাহিব না
গাহিব কি আর ?

(৩)

গাহি আছি আগমনী,
এসো দেবী বীণাপানি,
কবিকণ্ঠ সুনোভিনী
কুসুমিত হার,
আগমনী গাহিব না
গাহিব কি আর ?

(৪)

এসো বিদ্যা, এসো বাণী,
এসো লক্ষ্মী, এসো রাণী
কেতে কেতে তরা শস্য ভার ।
আগমনী গাহিব না
গাহিব কি আর ?

(৫)

এসো, ভক্তি, এসো প্রীতি,
এসো এসো সুখ স্মৃতি—

শারদীর অতুল শোভার ।

আগমনী গাহিব না

গাহিব কি আর ?

(৬)

এসো শক্তি, এসো ধৃতি,

এসো বুদ্ধি দাক্ষী সতী,

মনোরাগ্যে সম্রাজ্ঞী আমার,

আগমনী গাহিব না

গাহিব কি আর ?

(৭)

এসো রাজ রাজেশ্বরী,

অন্নপূর্ণা কেমহরী,

বঙ্গলক্ষ্মী বরিজী আমার ।

আগমনী গাহিব না

গাহিব কি আর ?

ঐহরিন্দ্র চক্রবর্তী

হিমাচলে উমা-আগমন ।

নগরাজমহিষী নিশাশেবে স্বপ্ন দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন । বহুদিন পরে প্রাণের তনুটিকে নিম্নাবশেষ অবলোকন করিয়া অধীর হইয়া পড়িলেন । হিমবান্ সন্ধ্যা তাঁহার এমন পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । রাণী কহিলেন, “নগরাজ, আজ আমি প্রাণের উমাকে স্বপ্নে দেখিয়াছি । যা আমার অলঙ্কারে অতিবিস্তৃত হইয়া আমাকে কহিতেছেন ‘মা, তুমি কেমন করিয়া এমন নিদ্রা হইয়া আমাকে ভুলিয়া থাক । আমি যে তোমার বড় বন্ধুর, বড় আদরের বন ছিলাম । আমি যে মা বিনা আর কিছুই জানিতাম না, আমি যে মা ছাড়া আর কাহাকেও চিনি না । তা, আর কি তোমার দুঃখিনী মেয়ের ববর করবি না ।”

বলিতে বলিতে গিরিরাণী বাষ্পনিরুদ্ধকণ্ঠ হইলেন, আর বলিতে

পারিলেন না । কণকাল পরে অশ্রু মার্জনা করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন :—

“গিরি, গৌরী আমার এল কই ?

ওই যে সবাই এসে দাড়া’য়েছে হেলে,

(শুধু) হৃদ্যমুখী আমার প্রাণের উমা নেই ?”

“দেখ শরদাগমে নভোমণ্ডল মেঘনির্ম্মুক্ত হইয়া শোভা পাইতেছে । বর্ষা-বারিবিধৌত ধরিজী নবপত্রপুণে সজ্জিত হইয়া কি অপূৰ্ণ ত্রী ধারণ করিল । দেখ, শ্রোতস্থিনীর জল নির্গল হইয়াছে, কুহুদ কল্লার পরিব্যাপ্ত সরোবরে হংসকারগুণাদি জলবিহঙ্গকুল পরমানন্দে ক্রীড়া করিতেছে । অসখা শেফালিকা অতসি ও অপরাজিতা জুটিয়া পুষ্পপ্রিয়া উমাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে । পুষ্পসৌরভবাহী মন্দবাসু ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে ও ধীরে ধীরে বৃক্ষশাখা আন্দোলিত করিয়া কুসুম বৃষ্টি করিতেছে । মধুর কণ্ঠ বিহঙ্গ-কুলের কাকলিতে কানন প্রদেশ মুখরিত হইয়া উঠিল । এমন সুখের পরতে শরদিন্মুনিভাননী না আমার কোথায় ? গিরি, আমি মিনতি করিতেছি, তুমি আমার প্রাণের উমাকে আমার কোড়ে আনিয়া দাও ।”

পর্যন্তরাজ বিচলিত হইলেন ।

“মহীভূতঃ পুত্রবভোহপি দৃষ্টিঃ

তদ্বিরপত্যো ন জগাম তৃপ্তিম্ ।”

বসন্ত কালে অসংখ্য প্রকার পুষ্প প্রাফুটিত হইলেও ভ্রমরকুল যেমন আশ্রয়কূলেই বিশেষ আগ্রহ হইয়া থাকে, তেমনি বহু পুত্র কন্তা থাকিলেও হিমবানের চক্ষু যেন সেই কন্তাটিকে দেখিয়া দেখিয়া তৃপ্তি পাইত না ।

যাহাকে দেখিয়া দেখিয়া নয়ন তৃপ্ত হইত না । যাহাকে কণকালও মেজান্তর করিলে প্রাণ অস্থির হইত, তাহাকে তুলিয়া সখংসর কেমন করিয়া অভিগাহিত করিয়াছেন, গিরিরাজ তাহাই তাবিয়া অস্থির হইয়া উঠিলেন । কিছুই বলিতে পারিলেন না, উমার কাৰ্য্যাবলী স্মরণ করিয়া তাঁহার নেত্র অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল ।

তাঁহাকে নিতম্ব দেখিয়া রাণী আবার কহিলেন, “মহারাজ, উমা আমার বড় অভিমানিনী ; আমরা এতদিন তার সংবাদ লই নাই, যা আমার আর কি এ পুরে আসিবে ? যে দিন পার্বতী কৈলাসে প্রস্থান করিয়াছে, আমি সেই দিন হইতেই দিন গণনা করিতেছি । ঋতু, মাস, পক্ষ,

দিন গণনা করিতে করিতে আর আমার ধৈর্য ধারণ করা অসম্ভব হইয়াছে ।
 প্রভু, তুমি, বাও,

“বাও বাও গিরি, আনগে গৌরী

উমা অভিমান করেছে।

আমি শুনেছি শ্রবণে, নারদের বচনে,

উমা মা, মা, বলে কৈদেছে।”

উমা ‘মা’ ‘মা’ বলে কৈদেছে একথা মায়ের গ্রাণে শেলসম বাজিল ।
 কাঁদিয়া কাটিয়া গিরিরাজকে বুঝাইয়া মেয়ে আনিতে পাঠাইলেন এবং
 আপনি উঠিয়া তাঁহার অস্ত্র নানারূপ দ্রব্য সামগ্রীর আয়োজন করিতে
 লাগিলেন ।

(২)

হিমাচলপুরে মহোৎসবের আয়োজন হইতে লাগিল । পুরবহির্ভাগে
 নির্মিত অপূর্ণ ভোরণ সকল পার্শ্বে, সপন্নব পূর্ণকুন্ত সকল স্থাপিত হইল ।
 নানাবর্ণের পত্রপুষ্পে পুরবাসীগণের বিচিত্র গৃহ সকল পরিণোভিত হইল ।
 নোহুলামান কুন্তুমমালা হইতে চতুর্দিকে সৌরভ ছড়াইয়া মলয়ানিল ক্রীড়া
 করিতে লাগিল । হিমবান্ আদেশ প্রচার করিলেন,

“উমা আসিবার পথ কর মনোহর ।

উচ্চনীচ কাটিয়া করহ অগ্রসর ।

দিব্য দিব্য গন্ধ বৃক্ষ ভোগহ দুসারী ।

মঙ্গল আচার কর নাচুক অঙ্গুরী ॥”

তানলয়পরিণত মধুর গন্ধকরলকীতের সহিত অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে
 লাগিল । উচ্চনীচ স্থান সকল সমতল করান হইল ও সম্ভ্রপরিষ্কৃত পথ
 ঘাটে, চন্দনের ছিটা দিয়া ধুলিশুদ্ধ করা হইল । রাজবস্ত্রের উভয় পার্শ্বে সারি
 সারি কদলী বৃক্ষ ও তরিয়ে পূর্ণকুন্ত শোভমান হইল । গৌরী আগমন দর্শন
 আশার জনগণ হর্ষাধিত হইয়া কোলাহল করিতে লাগিল ও অমূল্য পথপানে
 তাকাইয়া রহিল । পুরনারীগণ হর্ষোৎসর্গে দণ্ডায়মান হইয়া সিংহবাহিনীর
 পথের দিকে চাহিয়া পরস্পর অপর্ণার স্তণাবলী প্রসঙ্গে দিবস অতিবাহিত
 করিতে লাগিলেন । সকলে আনন্দে আপনা ভুলিয়া কেবল উমার প্রতীক্ষা
 করিতে লাগিলেন ।

অকস্মাৎ শব্দ হইল, ‘ঐ আসিতেছেন,’ অমনি তুহল কোলাহলে চতুর্দিক

ভরিয়া গেল ; “ঐ আসিতেছেন, ঐ দেখা বাইতেছে,” বলিতে বলিতে সকলে ‘আনন্দধ্বনি’ করিতে লাগিল, গভীর বাস্তবধ্বনি হইতে লাগিল। মেনকা গৃহমধ্যে বসিয়া ভাবিতেছেন। আহার নিদ্রা ভুলিয়া প্রাণের উমার আশায় বসিয়া আছেন। বাল্যকালে উমা কি ভাল বাসিতেন, কি বাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন, কি খেলা খেলিতে খেলিতে আহার ভুলিয়া বাইতেন, জননী স্নেহমধুর তৎসনা করিয়া অব্যয় করিয়া আনিয়া আদর করিয়া আহার করাইতেন। গিরিরানী বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছেন। আনন্দাশ্রিতে অকণ একেবারে ভিজিয়া গেল। এ চিন্তা কি সুখের! আমি যাহাকে ভালবাসি, বাহার কণিক সুখের স্তম্ভ প্রাণপাত করিতে পারি, বাহার হাসিমুখ দেখিলে আমি সংসার বিষৃত হই, আমার সেই বড় আদরের ধন, বড় স্নেহের রতন, আজ বহুকাল পরে আবার আমার কোলে আসিবে। রানীর রহিয়া রহিয়া হর্ষোৎকম্প হইতেছে, আনন্দাতিশয়ো ক্ষণে ক্ষণে স্বর স্বর করিয়া মুক্তা ফলের স্তায় অশ্রুবারি পতিত হইতেছে কিছুতেই চাপিয়া রাখা বাইতেছে না।

‘ঐ দেখা বাইতেছে,’ ভুলিয়া উমা-জননী অতিমাত্র ব্যতিবাস্ত হইয়া প্রাসাদনিধরে আরোহণ করিতে ছুটিলেন। অবিরল নেত্রজলে দৃষ্টি আচ্ছাদিত হইল, মেনকা কিছুই দেখিতে পাইলেন না। কতবার চেষ্টা করিলেন কিছুতেই অশ্রুজল বাগণ মানিল না।

গিরিরাজ-মহিষী শিলাপৃষ্ঠে শয়ন করিয়া বিহ্বল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার কেশপাশ আলুথালু হইয়া পড়িল; রানী অর্ধৈক্য হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া এক রমণী সাত্বনা দিতে আসিলেন। তিনি কহিতে লাগিলেন, “রাজেশ্বানি, অশ্রুজল সযতন করুন। আপনার প্রাণের সৌরী আজি পূজ্যস্বর ক্রোড় লইয়া সিংহবাহনে আসিতেছেন। দূরে, বহুদূরে, দিক্চক্রবাল রেখার অতি নিকটে মহা আলোক-জ্যোতি প্রকটিত হইল; আমরা বিশ্ব-বিস্ফারিত লোচনে সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম; ক্রমে লোহিতজ্যোতিরভ্যন্তরে অস্পষ্ট রেখা সকল প্রকাশিত হইতে লাগিল; এবং ধীরে ধীরে ক্রীটকুণ্ডলহারশোভিত দুর্গাশক্তি ও বৃগলতনয়ের শক্তি সিংহপৃষ্ঠে পরিস্ফুটমান হইল। আমি ইহা বচক্ষে দেখিয়া আসিরাছি,—মা, আপনি উঠুন, রোদন সযতন করিয়া এখন প্রাণের উমাকে বরণ করিয়া গৃহে আনয়ন করুন।”

তুনিতে তুনিতে গিরিরানীর সংজ্ঞালোপ হইল। কন্তুবীহ্বাসিত শিলাপৃষ্ঠে আলুপালুকেশা, বিভ্রান্তবেশা রাণী পড়িয়া রহিলেন। এ দিকে বহির্ভাগে মুহূৰ্হুহঃ স্রবধ্বনি হইতে লাগিল; তুমুল ঝড়কোলাহলে পৃথিবী কম্পিত হইল, পৌরস্ত্রীপণ আচার লাজ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। গৃহে গৃহে নদল হুচক শব্দ ও দ্রুতধ্বনি হিমাচল পুরবাসীগণের আনন্দ জ্ঞাপন করিতে লাগিল।

এমন সময়ে উমার এক বাণ্যসখী আসিয়া রাণীকে বলিলেন; ‘মা উমা ভোমার ঘরে, আর ভূমি এখনও শয়ন করিয়া আছ ?’

‘মা তোল গা তোল বাক মা কুন্তল

ঐ এল পাখাণী তোর ঈশানী।

সুগল শিশু ল’রে কোলে “মা কই আমার” বলে

ঐ এল তোর শশধরবদনী ॥

ত্রিভুবন ধনো, ত্রিভুবন মানো,

তোর মেয়ের তুলনা নাই গো রাণী,

আমরা ভাবিতাম ভবের প্রিয়ে, আজ তুনি তোর মেয়ে,

উমী নাকি ভবের ভয় হারিনী।

ধরিলি যে রত্ন উদরে, তোর মতন সংসারে

ওগো রত্নগর্ভা এমন নাই গো রাণী ॥”

“কই আমার উমা কই” বলিয়া পাগলিনীর নায় গিরিরাণী ছুটিলেন।

“আলু থালু কেশ, পাগলিনীর বেশ, অবিরল ধারা বহে নরনে।” এমন ভালবাসা, এমন ঐকান্তিক ভালবাসা বাহার হয়, তাহার বাড়ী সিংহবাহিনী আপনি আসিয়া থাকেন। গিরিরাণীর নায় বাহার সকল চিন্তা, সকল ভাবনা, সকল আশা আকাঙ্ক্ষা; কর্ত্ত্ব ধর্ম জ্ঞান ঈশানীতে সমর্পিত, তাহার প্রাণ ঈশানীর জন্য কাঁদিয়া উঠিলেই, তিনি তাঁহাকে নিকটে আসিয়া দর্শন না দিয়া থাকিতে পারেন না। উভয়ে উভরকে বাহুপাশে বদ্ধ করিয়া, পরস্পরের স্বক্কে মত্তক রক্ষা করিয়া অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। স্বপেক্ষ পরে মেনকা তনরাকে বক্ষে ধারণ করিয়া আদরে মুখচুষন করিয়া কহিলেন।

“ও মা, মনে পড়ে এতদিনে।

এলি মা ভবনে,

পিতা মাতা আকুল ভব, দরশন বিনে।

কুশল বল মা শুনি, ছুড়াক তাপিত প্রাণী,
কোলে আর মা ভবরাণী, মা বলে বদনে ॥

মহিষী আবার কহিলেন, ‘উমা, আজ মা বলে মনে পড়িল কি ?’ স রানি নি নিদ্রা নাই নহনে আমার—তোর কথা ভেবে ভেবে যে আমি পাগলিনী হইলাম । হতভাগিনী জননীকে কি এমন করিয়া তুলিয়া থাকিতে হয়, তোকে যে পলকের তরে নরনাশ্ত্রাণ করিলে আমার শ্রল্লহ জ্ঞান হইত, ওগো পাষণ-নন্দিনি, তোর দে সব আর মনে নাই ।’ তিনি কত করিয়াও কত কথা কহিয়াও যেন কিছুতেই তৃপ্ত হইতে পারিলেন না । জননীর কথা শ্রবণ করিয়া গৌরী কহিলেন, “মা, আজ আমার তাপিত প্রাণ শীতল হইল । তোমাকে ছাড়িয়া আমি কোথায়ও স্থির চিতে থাকিতে পারি না । তোমার ঘেহ, তোমার ঐতি, ভালবাসা, মনে করিলে আমি সংসার তুলিয়া যাই । কি করিব মা, বাহার হাতে আমাকে সমর্পণ করিয়াছ, তিনি যে আমা বই আর কিছুই জানেন না । সে যে আমার চোখে চোখে রেখেও শাস্তিতে থাকিতে পারে না । আমি যে তার সম্পূর্ণ অবলম্বন ;

“দিতে হয় মা মুখে তুলে,

নর তো খেতে যার গো তুলে,

ক্যাপার দণা ভাবতে গেলে, আমাতে আর আমি নাই ।”

সে যে খাইতে খাইতে আমার দিকে তাকাইয়া খাইতে তুলিয়া যায়, মা,
“তুলিয়ে যখন এলাম ছলে,

ভেসে গেল নরন কলে,

একলা পাছে যার গো চলে,

আপন হারা এমন কই ॥”

মা আমি বেশী দিন এখানে থাকিলে কি জানি কি বিপদ হয় । আমি তিন দিন এখানে থাকিব । যত দিন তোমার তনয়াকে মনে থাকিবে, যত দিন আমার জন্য শরনাগমে তোমার প্রাণ ঈদ্রিয়া উঠিবে, ততদিন আমি ,
প্রতি বৎসর তোমাকে দেখিতে আসিব ।

রানী হর্ষোৎফুল্ললোচনে প্রীতিপ্রকুল মনে ভবরাণীর পূজার আয়োজন করিতে যত্নবতী হইলেন ।

শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘটক বি, এ ।

উৎসব ।

ওঁ ত্রী আত্মারামায় নমঃ ।

অন্তেষ কুরু যচ্ছ্রয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি ।

স্বগাত্ৰাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্যয়ে ॥

২য় বর্ষ]

১৩১৪ সাল, কার্তিক ।

[৭ম সংখ্যা

হংস গীতি ।

ঘোড়শী ।

(১)

কে তুমি আনন্দময়ী শিবনাতিপদ্মোপরে ।

পাশাছুপ ধনুর্জাণ ধরা তোমার চারিটা করে ॥

কেন এতো রূপের ছটা

কেন তোমার বসন আঁটা

কেন অলঙ্কারের ঘটা অছি কার অপেক্ষা করে ।

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর

ঈশ্বর-আসনোপর

আবরণ শক্তি বুদ্ধি, পুরুষ ধরো আপন জোরে ॥

আমার কণ্ঠ কর রোধ

প্রেকান্তক নিজ বোধ

হ'রে বাক্ অন্তের শোধ, স্থিতিব্রহ্মপরাংপরে ॥

(২)

এ সব মিথ্যা মাত্র ছায়া ॥

কবির বাক্য আটা যেমন কলনাতে কায়া ॥

দুল নুঙ্গ বলে প্রবীণ

যাতে হয় তাতেই লীন

আসুচে বাজে হজে হবে দৃষ্টবস্তই যার ॥

সারকথা ।

(১)

জ্ঞান লাভ ভিন্ন পরমানন্দে নিত্যস্থিতি কখনই হইবে না। আর তাহা যদি না হইল তবে জনম মরণ স্রোত নিবারণ করা গেল না, দুঃখও অতিক্রম করা গেল না ; আর জীবনের উদ্দেশ্য বিফল হইল। তাই বলা হইল

কুরুতে গঙ্গাদাগরগমনং
ব্রতপরিপালনমথবা দানং
জানীবিহীনে সৰ্বমেনে
মুক্তির্ভবতি জন্মভেদে ॥

(২)

মৃত্যু অতিক্রম করা যায়। নিত্য আনন্দেস্থিতিই মৃত্যুশূন্য অবস্থা। মৃত্যুই যদি অতিক্রম করা না গেল তবে জীবনে কোন প্রয়োজন ছিল না। মৃত্যুতে বড় ঘটনা। তাই মৃত্যু চাই না। কেহ যে মরে তাহাও দেখিতে পারি না। এমন জদয়-বিদায়ক আর কিছুই নাই। মূৰ্খ লোক এবং জীলোকের বাহ্য মনে জগৎ তাহাই আজ বলিতেছে—সকলে মরে তুানও মরিতে তার অন্য ভাবনা কি? জগতের লোকের বুদ্ধি স্রী বুদ্ধি হইয়া গিয়াছে। “জীবুদ্ধি প্রলয়করী” তাই ইহা কলিযুগ। অবিগণ পুরুষ ছিগেন। মৃত্যু অতিক্রম করিতে হইবে। তাহার উপায় তাহার বলিয়া দিয়া গিয়াছেন। মৃত্যু অতিক্রম অন্য বাহা করিতে হয় তাহাই এই জীবনে করিয়া যাও। তাড়ম্ব বাহা করিতেছ সমস্তই বুধা, ভাবিয়া দেখ। সমস্ত জীবন ধরিয়া ত গাধার মোট বহিলে। কত ক্লেশ করিয়া ধন উপায় করিলে স্রবভোগ করিলে কবে? একটা কথা জুলিয়াছ—জী পুত্র প্রতিপালনটা কর্তব্য, ভারত উদ্ধারটা কর্তব্য। কেন কর্তব্য? প্রতিপালনটা কিরূপ হইল? উদ্ধারটা কাহাকে বলতেছ? তোমার চক্ষের সম্মুখে শত শত লোক মরিতেছে, তুমি বাঁচাইতে চেষ্টা করিতেছ, পারিতেছ না, পুত্র কাতর হইয়া মৃত্যুকালে বলিতেছে “পিতঃ আমাকে বাঁচাও”। তুমি বুদ্ধ গর্দভের মত ডাক্তার আনিতেছ ঔষধ খাওয়াইতেছ, শেষ অবধি গর্দভও মরিতেছ? হায়! জগৎ বড় মূৰ্খ হইয়া গিয়াছে।

যদি মৃত্যু অতিক্রম করা না যায় তবে কি বেদাদি শাস্ত্র এত করিয়া বলেন :—

- ১। তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্ত পশ্য বিজ্ঞতে অরনার।
- ২। তস্মাৎ য এতৈতর্ধ্যৈনিত্যাং দেবং জ্ঞোতি।
স দেবং পশ্যতি সোহমৃতকং গচ্ছতি সোহমৃতকং গচ্ছতি ॥
- ৩। অস্ত্রে ধ্যেবমজ্ঞানস্তঃ ক্রহান্যোভ্য উপাসতে।
তেহপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুঃ প্রতিপরায়ণাঃ ॥

- ৪। তেবামহং সমুচ্ছন্তা মৃত্যুসংসারসাগরাং ।
ভবামি ন চিত্তাং পার্থমথ্যাবেশিতচেতসাম্ ॥
- ৫। অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যু-সংসার-বন্ধনি ।
- ৬। মৃত্যুঃ সর্বত্রল্লাহং ।
- ৭। ভরমিরণমোক্ষায় মামাপ্রিতা যতস্তি বে ।
- ৮। জন্মমৃত্যুজরাষ্ঠ্যৈবৈবিশুভোহমৃতমশ্রুতে ॥
- ৯। জন্মবন্ধবিনিমুক্তা পদং গচ্ছন্ত্যানাময়ম্ ।
- ১০। মোহমৃতভায় কল্পতে ।
- ১১। অমৃতকৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন ।

মৃত্যু অতিক্রম না করিয়া যদি তুমি এখান হইতে ত্যাগিত হইলে তবে তুমি কথিয়া গেলেন কি ? বিষয় সম্পত্তিতেই বা কি হইল, হাড়ি কলসী কাঁকাইয়া পাকা গৃহিণী হওয়াতেই বা কি চইল ? উদ্ধার করিলে কাহাকে ? বুদ্ধদেব এই জন্য সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন। তুমি কোন বোদ্ধ বে বুদ্ধদেবের মৃত্যু অতিক্রম করার উপদেশ বাদ দিয়া বোদ্ধ ধর্ম পালন কর ? হায় ! জগৎ নিত্য পতিত অবস্থায় আসিয়াছে ! বাহ্যর জন্য সংসার করা, ধর্মপথে চলা, রাজ্য পালন করা তাহা যদি অপ্রয়োজ্য না করিলে তবে ত তোমার সমস্তই বুঝা । তাই বলা হয় “অন্ধা চলতা হোয়। কাঁহা চলতা হোয় ? চলতা হোয় বাবা !”

(৫)

জ্ঞান লাভ কর। মৃত্যু বা অজ্ঞান অতিক্রম করিবে। এই জন্মেই।

জ্ঞান দুই প্রকার। ভগবান আছেন—সর্বত্র আছেন—সাকার নিরাকার উভয় মূর্তিতে আছেন। সর্বত্র আছেন—সর্ববস্তুর মধ্যে আছেন। সর্ববস্তুর ব্যাপিরা আছেন। ভিতরে বাহিরে আছেন। এই শাস্ত্রবাক্য বিচার বৃত্তি দ্বারা স্থির নিশ্চয় কর এক প্রকারের জ্ঞান লাভ হইল।

ঈশ্বর প্রকারের জ্ঞানে আমিই সেই ভগবান সেই আত্মা সেই ব্রহ্ম নিশ্চয় কর।

(৬)

ধেনন অবস্থায় আটস না কেন—আবার কাঁচিয়া সাধনা কর—শাস্ত্র উপলক্ষ্যন করিও না—নিজের মনের মত উপাসনা করিও না, শাস্ত্র মত চল মৃত্যু অতিক্রম হইবে।

রাজর্ষি জনক ।

(১)

রাজর্ষি জনক সংসারে থাকিয়াও ব্রহ্মজ্ঞ হইয়াছিলেন। সংসারও দেখিতেও জ্ঞানলাভও করিয়াছিলেন।

কিভাবে এই অবস্থা লাভ হইয়াছিল ? একদিন তিনি যুগ্মা করিতে বনে

গমন করেন । বনভূমির মধ্যে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া তিনি সমস্ত লোককে
 বিদায় দিয়া একাকী বনের মধ্যে ভ্রমণ করেন । তখন তিনি অকস্মাৎ
 কতিপয় সিদ্ধপুরুষের আশ্রয়বিচার শ্রবণ করেন । শ্রবণ করিয়া তিনি যে
 বিচার দ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন তাহাটী যদি তুমি আমি অভ্যাস করিতে
 পারি আমরাও জ্ঞানলাভ করিয়া আপন স্বরূপে অবস্থান করিতে পারিব ।
 বিবসর সংসারের পারে ঘাইয়া অমরত্ব লাভ করিতে পারিব । আর আমা-
 দিগকে সংসার বাতনা ভূগিতে হইবে না । আর জনন-মরণ ভয়ে ভীত
 হইতে হইবে না । আর পুত্রকলত্রাদিবিয়োগে অস্তির হইতে হইবে না ।

এই বিচার কিরূপ তাহা শুনিতে কাহার না লোভ হয় ?

রাজা জনক বিচার দ্বারা মনকে সমাধিস্থ করিয়াছিলেন । সমাধি বলিলেই
 আমরা হতাশ হই । কিন্তু ইহা যোগীর সমাধি নহে ইহা বিচার সমাধি ।
 যোগবশিষ্ঠ বড় জোর করিয়া বলিতেছেন, সামান্ত বিবেক বাহার আছে,
 সংসারের আশা যত্নাৎ বে ভোগ করিয়া সংসারকে হৃৎখময় বৃদ্ধি আছে সেই এই
 বিচার সমাধি লাভ করিতে পারে । কিন্তু এক ঋষিক বিচার দ্বারা পান
 করিয়াই যদি জিজ্ঞাসা কর “বাবা ! বল পেলি রে” তবে কিছুই হইবে না ।
 কিছা বিচার কর বলিয়া যদি সফ্যা অপ কিছা পাঠি বাদ দাও তাহা হইলেও
 হইবে না । সমকালে সমস্ত অভ্যাস কর—হইবেই । মনকে নিরস্তর উপদেশ
 করিতে করিতে এই সমাধি লাভ হইবে । সর্বদা মনের সহিত কথা কহিতে
 কহিতে মন প্রবুদ্ধ হইবে । মন প্রবুদ্ধ হইলেই মন আপন সত্তা সেই চৈতন্য-
 পুরুষ প্রাপ্ত হইয়া স্বরূপে অবস্থান করিবে ।

আহার, নিদ্রা, শয়ন, ভ্রমণ সকল সময়েই মনকে জানাইতে থাক—
 মন তুমিই সংসার করিতেছ, তুমিই দুঃখী হইতেছ, তুমিই অভাব অভাব
 বলিয়া চীৎকার করিতেছ, তুমি রোগে শোকে কাতর হইতেছ, তুমিই মৃত্যু
 ভয়ে ভীত হইতেছ, তুমিই সংসারের আশার অলিতেছ ।

কিন্তু তুমি ওরূপ হও কেন ? রোগ শোক দেহের, মৃত্যু জন্ম দেহের,
 ক্লদা তৃষ্ণা দেহের, আশ্রয় সহিত জনন মরণ, মৃত্যু ভয়, ভাবনা, সংসার
 ইহাদের ত কোন সম্পর্ক নাই । এই যে সমস্ত সমস্ত মন ভুলিতেছ ইহাতে
 আমার আশ্বা করিবার কি আছে ? জগতের সমস্ত বস্তুই ত দুঃখগন্ধি—এখানে
 আকাঙ্ক্ষার বস্তু ত কিছুই নাই । হর্ষ বিবাদের কি আছে এখানে—কিছু
 পাই নাই কিছু পাইয়াছ ইহা এই অসার সংসারের বস্তু সব্বক্ষে প্রয়োগ
 কিরূপে হইতে পারে ? আশ্রয় ত পূর্ণ । ইনি আবার পাইবেন কি ? তিনি
 নির্ভর তাঁহার আবার ভয় কি ? কিছু আছে তাহাও ভাল, নাই তাহাও ভাল ।
 ক্লদা হইতেছে তাও ভাল, না হইতেছে তাও ভাল । সংসার বনলাইয়া দাও,
 ক্রেশ বা হর্ষ কিছুতেই কিছু বোধ হইবে না । গত ও ভবিষ্যৎ কিছুতেই
 কিছুই চিন্তা করিবার নাই, উপস্থিত যাহা আসিবে করিগী যাও । কোন
 কিছুর ইচ্ছা করিবার তোমার নাই অনিচ্ছা করিবারও নাই । যাহা আসে
 আনন্দ বাহা হয় হউক তুমি উপাশীন ভাবে উপস্থিত সমস্ত করিয়া যাও ।

স্বপ্নই বা কার চঃখই বা কার ? তুমি ইহাদেব নও ইহারও তোমার নহে । কেন সুখ কত কি ভাবনা কর ? মন তুমি ভাবনা ত্যাগ কর—স্বপ্ন হইয়া যাও । এ দেহও তোমার নহে ইহাও থাকিবে না বিশেষ থাকুক বা যাক্ তাহাতেও তোমার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই ।

এই যে বিচার এই বিচারটি সর্বদা মনকে বলিতে হইবে । যেমন একজন লোকের সহিত কথা কও সেইরূপ একান্তে বসিয়া মনোমুগ্ধতার সহিত এই কথা কহিতে হইবে—এইরূপ ভাবে কথা কহিতে হইবে । অভ্যাস কর তখন তোমার বিচারবত্তী প্রজ্ঞা জন্মিবে, জন্মিয়া প্রজ্ঞাপ্তি দেবী যেমন লীলাকে জীবমুক্তি দিয়াছিলেন তোমার বিচারবত্তী প্রজ্ঞাও তোমাকে জীবমুক্তি দিয়া দিবেন । সর্বদা এই বিচার কর—মন যেন একজন মানুষ বাগককে উপদেশ করার মতন তুমি কথা কহিরা,—বেশ শব্দ করিরা কথা কহিরা—এই বিচার অভ্যাস কর, জনক রাজার মত জীবমুক্ত পাকিরা সংসার করিতে পারিবে ।

লাভলাভ আধিবাধি জন্মমৃত্যু সকলেই তুমি নির্ভর ।

(২)

এই যে বিচারের কথা বলা হইল ইহা একদিন করিলে হইবে না, দুই দিনে না, তিন দিনে না, যত দিনে না হয় তত দিন ধরিয়া অভ্যাস কর । করিরা দেখ কত নিশ্চিন্ত হইয়া যাইবে । বিপদে বিপদ বোধ নাই, সম্পদে সম্পদ বোধ নাই, মৃত্যু আসিবে তাহাও ভয় নাই, স্বর্গ পাইবে তাহাও হর্ষ নাই । কিছুতেই বিচলিত হইতেছ না । পরম শান্ত অবস্থা ইহা । স্বরূপে অবস্থান ইহা । স্বরূপে অবস্থান করিরা—অনন্ত সীমান্ত হইয়াই কেন্দ্র স্থানে আসিরা মূর্তি ধরিয়া অগং লইয়া মন লইয়া খেলা ইহারই নাম । অনাস্থার আস্থা, অনিচ্ছার ইচ্ছা, অনাসক্তির আসক্তি এই বিচার অভ্যাস দ্বারাও জন্মিবে ।

এই বিচার বড় শুভ । কিন্তু ইহার অপব্যবহারে ইহাও থাকে না—অন্ত কিছুই থাকে না মানুষ হয় নাস্তিক ।

সদ্ধাবন্দনাদি সমস্তই করিতে হইবে প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যাক্ষে সদ্ধাবন্দনাদি করিরা এই বিচার অভ্যাস করিতে হইবে ।

আর ভক্তিযোগের সহিতও ইহার বিরোধ নাই । প্রথমতঃ নিজের শক্তিতে কিছুই হয় না ইহাত পরাক্রান্ত সত্য । এই অস্ত্র তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর—প্রভু আমার দ্বারা কোন কার্য্যই হয় না তুমি আমার শক্তি দাও আমি সদ্ধা করি বা অপ করি বা পাঠ করি তোমার আজ্ঞা বলিরা, ইহা দ্বারা কি হইবে কি না হইবে আমি জানি না । সেইরূপ ধ্যান করি তাহাও তোমার আজ্ঞা বলিরা—পারি না তথাপি তোমার আজ্ঞা বলিরা তোমার সাহায্য চাহিরা করিরা যাই ।

আবার আত্মবিচার করি তাহাও তোমার আজ্ঞা বলিরা । বিচার করিবার সামর্থ্য আমার নাই । আমি তোমার আজ্ঞামত তোমার কথা দিয়াই মনকে প্রবুদ্ধ করি ।

(৩)

হে ভগবান! তোমার কৃপা কি জানিনা। মনে হয় তোমার আজ্ঞামত চলিতে টেক্ষ। কবাই তোমার কৃপার পরিচয়। আবার তোমার আজ্ঞামত কার্য্য করাই তোমার কৃপা। কি করিলে কি হয় জানি না। ক্লেশ করিতে হইবে জানিনা, কিন্তু যথাসময়ে তোমার আজ্ঞামত কার্য্যে প্রবৃত্ত হই আর বলিতে থাকি, আমি আবার আসিলাম আমি কর্ণে প্রস্তুত হইলাম এখন তুমি আমার কর্ণ নিষ্পত্তি করিয়া দাও। আমার শক্তি কিছুই নাই—আমার টেক্ষ মাত্র আছে তোমার শক্তি দ্বারা আমাকে চালাইয়া লও।

সন্ধ্যা, জপ, পাঠ, ক্রিয়া, ধ্যান, আত্মবিচার যখন বাহাতে মন লুপ্ত থাকে তাহাই কর। কিন্তু বিচার ভিন্ন অন্য কিছুতেই মন পরম শান্ত অবস্থা লাভ করিতে পারিবে না। শান্ত অবস্থায় যখন মন আসিবে তখন মনকে চূড়াল শিখরজ সাজিতে বল, হরণার্কসী সাজিতে বল, সীতারাম সাজিতে বল, ব্রাহ্মকৃষ্ণ সাজিতে বল, — ইহা বড় আনন্দে সাজিবে, সাজিয়া রাধা হইয়া কুট সেবা করিবে, সীতা হইয়া ব্রামভজন ভজনা কর, পার্শ্বসী হইয়া শিব পূজা কর, চূড়াল হইয়া শিখরজকে জীবযুক্তি দাও—দেখিবে তোমার আনন্দে স্থিতি হইয়া ঘাইবে। তুমি তখন সর্গদা সমাধিময় থাকিয়াও বাবহারিক কার্য্য করিয়া রাজর্ষি জনকের মত বিনেহ নগরের রাজা হইবে।

আবার যখন ইচ্ছা বাহার পূজা কর তাহাই হইয়া তৎস্বরূপে অবস্থান করিবে। শুধু মহাকাশ নহে, কিন্তু চিত্তাকাশ ও চিদাকাশ সমস্তই তোমার আয়ত্ত্বাধীন হইবে। ইহাই তোমার জীবনের উদ্দেশ্য। ইহা সম্পন্ন না করিয়া যদি সংসার ত্যাগ করিতে হয় তবে আমার মত নরগর্ভিত আর কে আছে।

এই জন্য জপ, ধ্যান ইত্যাদি নিয়মমত করিয়া আত্মবিচার লইয়া পাক।

আত্মবিচার ভিন্ন তুমি বাহাতে স্থিতি লাভ করিতে চাও তাহা হইবে না। আত্মবিচার ভিন্ন জরা মরণ অতিক্রম করা যাইবে না, আত্মবিচার ভিন্ন ভক্তি লাভ হইবে না। আত্মবিচার ভিন্ন কিছুই হইবে না। আর জীবযুক্ত হইয়া বাহা পাও তাহাই পাওয়া—সুস্তির বাহা পাইলে তাহা আবার হারাইবে। চূড়াল জীবযুক্ত হইয়াই চিরদিনের জন্য পাইয়াছিলেন।

ব্রাহ্মসঙ্গ মনের সহিত কথা কহিতেন গানে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়—সাধক যাজ্ঞেই মনকে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। ভগবানকে ডাকিবে মন—মনই যদি আপন তালে নাচিতে ব্যস্ত থাকিল তবে তুমি জপ ধ্যান আত্মবিচার করাও কাহাকে ? তাই মনকে উপদেশ দিয়া প্রবৃত্ত কর। সর্গদা মনকে বিচার শোনাও। সর্গদা পাগলের মত আপন মনে আপনি কথা কও। একান্তে ইহাই অত্যাশ কর। প্রাতে মধ্যাহ্নে শুভ জলে স্নান করিয়া সন্ধ্যা দি ক্রিয়া শেষ করিয়া আত্মবিচার কর। পরিশ্রান্ত হইলে আবার ধ্যান কর, শ্রান্ত হইলে আবার জপ কর ইতি।

রুক্মিণী ।

বালিকার কৃষ্ণপ্রেম ।

বালিকা রুক্মিণীকে লইয়া সখীগণ বহুপ্রকার জীড়া করিত। মিথিড় মেঘপ্রভা কুন্তলরাজিতে বিচিত্র কবরী নির্মাণ করিয়া নানা কুন্মে কুন্মে করিত; লগাট দেবে সিন্দূরবিন্দু অঙ্কিত করিয়া দিয়া, প্রদোষকালে মেঘনির্ম্মল আকাশ প্রান্তে পূর্ণচন্দ্রের পেঁতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া থাকিত। কখনও বা অলকা তিলকার অপরূপ সাজে সাজাইত এবং সুরভি কুন্মে মনোহর মালা গাঁথিয়া গলে পরাইত। কত বা মঠেশ্বরীময় হর্ষতলে সিংহাসনে বসাইয়া উজ্জ্বলভাসময় মনোরমনিখচিত অলঙ্কার সকল যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিত, রূপের প্রভাৱ নন্দন কলসিয়া উঠিত, আবার কপাচিং বা গৈরিকবসনে অপূর্ণ লাবণ্যময়ী বালিকার দেহলতা আবৃত করিয়া যোগিনী মূর্তিতে সাজাইত। নিকুঞ্জ-কাননে রুক্মিণীকে যখন সখীগণ পুষ্পভরণভূষিতা করিয়া কুন্তরী সাজাইত, বালিকার রূপের স্নিগ্ধ্যোতিতে কুন্তল আলোকিত হইয়া উঠিত।

সখীগণ কত গান গাহিত, কত কাব্যোক্তিহাসের মনোমুগ্ধকর প্রসঙ্গ লইয়া আমোদে মত্ত হইত, কত বুদ্ধবিগ্রহের গল্প করিত, কত রাজা ও রাণীর সুখদুঃখের কথা লইয়া সুখে কালযাপন করিত। রুক্মিণী যেন তাহাদের প্রাণ। তাহারা রুক্মিণীকে ছাড়িয়া এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারিত না, ছায়ার ন্যায় সর্বদা তাহার অনুগমন করিত। পিতামাতার বড় আদরের রুক্মিণী সর্বজনপ্রিয়। আচার ব্যবহার, কথাবার্তা, আদর আপ্যায়নে, প্রজ্ঞা ভক্তিতে যুগপৎ সকলের বেহ এবং প্রীতি আকর্ষণ করিত।

ভীষ্মক-হৃদি লোকমুখে কৃষ্ণ কথা শুনিয়া শুনিয়া কেমন একটা আকর্ষণ অনুভব করিত। রুক্মিণী সখীগণকে শ্রীকৃষ্ণ গুণগান করিতে অহুরোধ করিত, আর কৃষ্ণবিষয়ী কথা উঠিলে নীরব নিম্পন্ন হইয়া তাহা শ্রবণ করিত। বালাসখিবৃন্দ নানা প্রকারে তাহাকে সজ্জিত করিলেও রাজনন্দিনী মালা চন্দন এবং অলকা তিলকা বড় ভালবাসিত। ভিখারী আপন মনে রাক্ষস বাহিরা স্বরলহরী তুলিয়া শ্রীকৃষ্ণনামামৃত বিকীর্ণ করিতে করিতে বাহিত, শুনিতে শুনিতে বালিকার রোমাঞ্চ হইত, নিতান্ত অতিভৃত্য ন্যায় প্রাণ ভরিয়া তাহা গান করিত।

মায়াময়ী পুতনা কিরূপে স্তনধুগলে তীব্র বিষ মিশ্রিত করিয়া বালক কৃষ্ণের প্রাণনাশ করিতে প্রয়াস করিয়াছিল এবং কিরূপে আপনাই বিনষ্ট হইয়াছিল; কালীয় কি প্রকারে রাখাল বালকগণের সর্বনাশ সাধন করিয়াছিল ও শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে তাহার মৃতকে পদাঘাত করিয়া তাহার দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন; তৃণাবর্ত্ত-বধ, বকাসুর বিনাশ, কংসের চাতুরী এবং ধনুর্ধ্বজ-চ্ছলে কৃষ্ণানয়ন এবং তাহার প্রাণ সংহার চেষ্টা করিয়া কংস কিরূপে আপনার

বোধোপায় পরিকৃত করিয়াছিল—সখীগণ যখন এই সব প্রসঙ্গ বলিতে থাকিত তখন ভীষ্মক কুমারীর অপূৰ্ণ ভাবাবেশ হইত । স্তনিতে স্তনিতে বালিকা এমনই মোহিত হইয়া যাউত, যেন ত্রীকৃষ্ণের বাণ্যগীতার ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ হইয়া তাহার নবনের সম্মুখে ভাসিয়া বেড়াইত, কত বা সৰ্ব্বশোভাময়ীর পূৰ্ণচন্দ্র, বিনিমিত্ত বদনমণ্ডল গম্ভীরভাবে ধারণ করিত, কখনও বা অলঙ্কৃত ক্ষুদ্র ওষ্ঠঃ মৃদুচন্দ্রো দ্বৈবদ্ভিন্ন হইয়া হিরাকাশে চপলা চমকের ন্যায় অপূৰ্ণ শোভার মুগ্ধ করিত ; আবার কদাচিত্ত বা নীলোৎপলনিভ বৃহৎ নীল চক্ষু হুটী অগ্নে ভরিয়া বাইত ।

মহারাজ ভীষ্মক তনয়ার পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া বিশেষ প্রীত হইলেন । উপবৃদ্ধ বস্ততে অহুরাগ প্রত্যক্ষ করিলে কেই বা সন্দেহ না হয় ? কস্মিনী বৃদ্ধ পিতার পূজার পাত্র, পুষ্পপত্রাদি যথাস্থানে রাখা করিতেন । শুচি এবং সংযত হইয়া গৃহ-প্রতিষ্ঠিতা কাণ্ড্যায়নীর নিকট বৃত্তকরে কার্যমনোবাক্যে কৃষ্ণাহুরাগ বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করিতেন । প্রতাহ সখীগণ-পরিবৃত্তা হইয়া ভক্তি গদগদ-চিত্তে পাষণময়ীর অর্চনা করিয়া যাউতেন এবং অশ্রুধ্বজ কণ্ঠে বলিতেন “মা, আমার সৰ্ব্ব স্বীকৃতি অৰ্পণ করিয়াছি । জননি, অহালিকে, লজ্জানিবারণি, অধমা তনয়ার সৰ্ব্বদোষ ক্ষমা কর মা । পায়ণি, আমার মান, সত্ত্বম, লজ্জা তোমার চরণে সমর্পণ করিলাম ।”

কস্মিনী ক্রমে ক্রমে সখীসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে যত্ন করিল । বৃদ্ধ কক্ষতলে উৰ্দ্ধনয়নে করুণ কণ্ঠে কহিত “ঠাকুর ! তুমি অন্তর্ধানী এই আশাতেই আমি বাঁচিয়া আছি । ভক্তি করিয়া পূজা উপহারে তোমাকে সন্তুষ্ট করিব, সে শক্তি আমার নাই । প্রভু, দীন্যর করুণ ক্রমশঃ কি একদিন তোমার সিংহাসনতলে পৌছিবে না ? আমি সকল সুখাশা পরিহার করিয়া তোমার চরণে আমার মনঃ প্রাণ সমর্পণ করিলাম ।”

ক্রমে ক্রমে কস্মিনী কৃষ্ণাহুরাগিনী হইয়া পড়িলেন । কৃষ্ণ-কথার তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ হইত । সখীগণকে অনবরত কৃষ্ণনাম গান এবং কৃষ্ণগুণাবলী বলিতে অনুরোধ করিতেন । কস্মিনী চারিদিকে কৃষ্ণময়-দেখিতে আরম্ভ করিলেন ।

পিতাপুত্রে ।

অন্তঃগমনোন্মুখ লোহিত রবির উজ্জ্বললোকে ধরিজী সুবর্ণভূষণে বিভূষিতা । বিদূৰ্দ্ধনগরের রাজপ্রাসাদসমীপস্থ বৃক্ষাবলী হইতে পক্ষিগণ নানাশব্দে নীড়াতিমুখে ধাবমান হইল । সুব্রাজ কুম্ভী অনেকক্ষণ অবধি পিতার প্রতীক্ষা করিতেছেন । চিন্তিত এবং অন্যমনস্ক সুব্রাজ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া বাতায়ন-পথে রাজপথের দিকে তাকাইয়া আছেন । কোলাহলময় বিদূৰ্দ্ধ নগরীর সান্ধ্যশোভা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল । কত লোক, কত উদ্দেশ্যে কত দিকে ধাবমান হইতেছে ; হস্তাশ্রয়হীন জনাকীর্ণ রাজবন্দ

বহিরা জনশব্দবাসী নিশ্চিন্তমনে আপনার কার্যে চলিয়াছে। এমন সময়ে, মহারাজ ভীষ্মক ও তদীয় মহিষী সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

সকলে সুখাসীন হইলে সুবরাজ কহিলেন “মহারাজ আমি চেদিরাজের নিকট অশেষ প্রকারে সংকুচ হইয়া আসিয়াছি। বীৰ্য্যবান্ শিশুপাল আমার সুখের জন্য বহু আশ্রয় করিয়াছেন, আমার কণিক তুষ্টির জন্য রত্নময় গৃহাদি নির্মাণ করাইয়া বিবিধ ভোজ্য ভোজ্য বস্ত্র দ্বারা আমাকে পরিতোষ করাইয়াছেন। আমি ধনুর্ধরাগ্রগণ্য চেদিরাজের সেই সমস্ত প্রবৃত্তি স্বরণ করিয়া, প্রতিদান না করিতে পারিয়া অত্যন্ত লজ্জিতভাবে দিন বাপন করিতেছি।”

মহারাজ ভীষ্মক লিজ্জাশা করিলেন কি করিয়া তিনি এই আতিশয়ের জন্য তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে চাহেন।

রক্ষী কহিলেন ‘মহারাজ, আমি শিশুপালকে বিনাশে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে বাসনা করিয়াছি। রাজ-অভিগির উপযুক্ত সম্মান তাঁহাকে প্রদর্শন করিয়া, আমাদের সর্বলাভগাম্য, অশেষগুণযুক্তা রক্ষিনীকে তাঁহার করে সম্প্রদান করিতে মানস করিয়াছি। মহাবল পরাক্রান্ত ক্ষত্রিপ্রভেট চেদিরাজ রক্ষিনীর অধরূপ ভর্তা হইবেন, সন্দেহ নাই।

রাজা—চেদিরাজ শিশুপাল রক্ষিনীর উপযুক্ত বর সন্দেহ নাই, এবং তিনি তোমার প্রতি বৈরূপ সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে পুরস্কৃত করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য; কিন্তু রক্ষিনী সম্প্রদান বিষয়ে আমি এখন কিছু বলিতে পারি না।

রক্ষী বিষম্ব হইলেন; কহিলেন আমাদের সহিত শিশুপালের চিরকালের মিত্রতা; রক্ষিনী সম্প্রদান করিলে তাহার ভিত্তি সুদৃঢ় হইবে সন্দেহ নাই। বিশেষ উপকারীর প্রত্যাশকার করা কাজ ধর্ম্ম। শিশুপাল আমার মহোপকারী বন্ধু; রক্ষিনী বিবাহের উপযুক্ত হইয়াছে। তাহার বিবাহ দিতেই হইবে। দ্বাহাকে অনাকোচ সমর্পণ করিতে হইবে, তাহাকে কেননা শুদ্ধহৃদে প্রদান করিয়া মোহর্দ দূর করি বুদ্ধিতে পারি না। মহিষী এইবার কথা কহিলেন। তিনি পুত্রকে সংযোজন করিয়া কহিলেন “বৎস রক্ষী, রক্ষিনী বিবাহোপযুক্তা হইয়াছে, তাহার জন্য আমরা চিন্তিত হইয়াছি। রক্ষিনী এখনও বালিকা, বিবাহের কথা হইলে বৃহৎ নীল চক্ষু দুইটি আমার চক্ষুর উপর স্থাপন করিয়া চাহিয়া থাকে, আমি তাহা দেখিয়া সকল জুলিয়া বাই। সখী চকলা কহিল ‘রক্ষিনী দ্বারকানাথ ত্রীকুক্ষেব বিষয় শুনিতে বড় ভালবাসে, কৃতকথা শুনিতে শুনিতে তাহার বিশাগলোচনদ্বয় জলে ভরিয়া যায়, পথিক পথ দিয়া কৃতকথন গান করিতে করতে যার, তাহা শুনিতে শুনিতে বালিকা সংসার বিম্বত হয়।’ আমি মনে করিতেছি রক্ষিনীকে কৃতকথনে অর্পণ করিব। কোণে অধীর হইয়া রক্ষী কহিল “জননি, কৃতকথা কি আমার ভগিনী বিবাহ করিবার উপযুক্ত? মধ্যাহ্ন সূর্যের প্রভাত ন্যায় বাহাদুরের কুলের প্রতিভা, তাহার কি না গোপের নব্বনকে কন্যানান করিবে? কুহুর কি কখনও

যজ্ঞের হবি ভোক্তাদের উপযুক্ত ? মগধপাতি ভরাসক্কের ভয়ে যে মথুরা ছাড়িয়া পলায়ন করে, সেই কাপুরুষকে কন্যাবান করিবে মা ?”

মহারাজ ভীষ্মক কহিতে লাগিলেন “বৎস কন্বী, অধীর হইও না । বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করিলে পরিণামে সন্তাপ পাইতে হয় না । বিশেষতঃ কম্বিনী তোমার বড় আদরের, বড় প্রিয় । খনে, মানে, বিত্তাবুদ্ধিতে, তেজঃ এবং বীৰ্য্যে শ্রীকৃষ্ণই এখন সম্ভ্রষ্ট । বালক কৃষ্ণ কত দৈত্যদানব বিনাশ করিয়াছেন, এবং ধনুর্ঘোষে মহাবল কংসকেও বধ করিয়াছেন । নীলোৎপলদল-শ্যাম কৃষ্ণহস্তর মূর্ত্তিটি কি মনোহর । তাঁহার করে কম্বিনীকে প্রদান করিতে পারিলে আমি আপনাকে সৌভাগ্যবান মনে করিব ।”

যুবরাজ ক্রোধাধিত হইলেন । পিতাপুত্র অনেক কথা হইল । শেষে রাজা কহিলেন—“অজ্ঞা, বাগবিত্ত্য প্রয়োজন নাই । আমি স্বয়ং ব্যপণে সমগ্র রাজস্বদণ্ডীকে নিঃস্বপন করিয়া আনিব । সমাগত কৃপালগণ মধ্যে যাহাকে টঙ্কা কন্যা বরণ করিবে । তাহাই ক্ষত্রিয়গণের চিরস্থান প্রাপ্য ।”

কন্বী উত্তীর্ণা গেলেন । সমস্ত কণা গোপনে প্রিয় বন্ধু শিশুপালকে জ্ঞাপন করিলেন এবং তাঁহাকে বরবেশে সাজিয়া আসিতে নিষিদ্ধ করিলেন । তিনি যেরূপে পারেন তাঁহার হস্তেই সর্ব্বশোভাময়ী কম্বিনীকে সম্ভ্রদান করিবেন বিশেষ করিয়া লিখিয়া দিলেন ।

ব্রাহ্মণ সন্দেশ ।

“সখি, শ্রীকৃষ্ণ বিনা যে সব সুনামের দেখি ” কম্বিনী কাদিয়া কহিলেন “আমার উপায় হবে কি ?” “আমি যে তাঁর শ্রীচরণসেবায় মনঃপ্রাণ সকলই সমর্পণ করিয়াছি ।”

সখিগণ প্রমাদ গণিল । যুবরাজের আরক্তিম নহন দেখিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছিল । এদিকে কম্বিনীকেও আর ফিরাটবার উপায় নাই । তাহার কৃষ্ণ ধ্যান, কৃষ্ণ জ্ঞান, কৃষ্ণ চিন্তা—পৃথিবী কৃষ্ণময় চটয়াছে । তাহার অস্থরে কালসোনা, বাতিরও নবনীত বরণ । কৃষ্ণপ্রেমাবহুলা কম্বিনী কখনও কাদিয়া কাদিয়া কহিতেছেন—

অংসানবিতবামকুণ্ডলভং মনোহরভ্রলভঃ

কিকিং কৃকিতকোমলাধরপুটং সার্চি প্রসারেক্ষণম্ ।

আলোলাঙ্গুলিপন্নৈর্মুরলিকা মাপুরঃসু মুদা

মূলে কল্পতরোত্ত্রিভঙ্গললিতং জানে জগন্মোহনম্ ॥

রাজ-নন্দিনী কত কি ভাবিতেছে, কত কি কহিতেছে । ঠাকুর যেন সব কথাই শুনিতেছেন ।

সন্ধ্যা সমাগত । সমস্ত দিন কিরণ প্রদান করিয়া সূর্য্যদেব বিজ্রামোক্ষেণ্য অন্তর্গিরি অভিবুখে রথ সঞ্চালন করিলেন । পশ্চিমাকাশ হিঙ্গুলবর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিল । ধীরে ধীরে দুটি একটি করিয়া নক্ষত্র আকাশপথে উকি মারিতে লাগিল । সন্ধ্যার সমছায়া বিদূর্ভ নগরী আচ্ছাদিত করিল । দেবমন্দির

হঠাৎ কীশব, বণ্টা, শঙ্খ প্রভৃতি আরত্নিকের সমর সূচনা করিতে লাগিল ।
তখন কল্পিনীর প্রিয়সচরী চকলা কহিল—

রাজকুমারি, শুনেছ কি ? যুবরাজ তোমার জন্য শিশুপালকে সংবাদ
প্রেরণ করিয়াছেন । শিশুপালকে যখন পতিরূপে বরণ করিতে হইবে,
“তখন আর বুঝা কীনা কাটার ফল কি ?”

অপর সখী চপলা কহিল—আজ্ঞা হ্যাঁ, আমাদের সখীর মন যে
ছারকানাথ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে, তাহা কি যুবরাজকে কেহ
বলিয়াছে ?

চকলা—মহারাজ এং মহারানী আপনারাই কহিয়াছিলেন, তাহাতে
কুমার ওতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া কহিলেন “আমি বেদ্রপে পারি কল্পিনীকে শিশু-
পালকে সম্মান করিব, শিশুপাল আমার প্রাণের বন্ধু ।”

চপলা—ওমা, তবে কি হবে ?

চকলা—মহারাজ কহিলেন ‘আমি সমস্ত নৃপতিমণ্ডলীকে একাকিনী
স্বয়ংবর বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়া আমন্ত্রণ করিব । কন্যা আপনার অভীষ্টবর
মনোনীত করিবে ।’ কিন্তু কুমার তাহাতে রাজী হইলেন না । শিশুপালের
সহিত কল্পিনীর বিবাহ দিতে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ । সখি, আমি বুঝিতে পারি
না, এ বিপদে কি করা উচিত ।

শুনিতে শুনিতে কল্পিনীর কমল নয়নে জলধারা বহিল । তিনি কহিলেন
“সখি, বাঁহাঙ্গ নাম অরণে বিপদ দূরে যায়, আমি তাঁহার পদে অরণ লইয়াছি ।
আমি কি ছার শিশুপালের ভয়ে ভীত ?

“শত জন্ম পরে যদি পাই লো তাঁহারে ।

করিব তাহাই সখি প্রতিজ্ঞা আমারে ।”

আমি যদি কাহ্নমনোবাক্যে কখনও দেব সেবা করিয়া থাকি, আমি যদি
কখনও ভাস্ক পূর্বক গুরু-অর্চনা করিয়া থাকি, তবে সেই ব্রতোপবাস নির্যম
এবং সংবদের ফলে আমি আমার প্রাণব্রতকে লাভ করিব । নতুবা,

“নিভা ব্রত উপবাস করি আচরণ ।

দেহ ক্রীল করি দিব প্রাণ বিসর্জন ॥

তখন সখীগণ মিলিয়া পরামর্শ করিতে বসিয়া গেল । বহুকথা হইল ।
শেষে চকলা কহিল ‘রাজকুমারি, শ্রীকৃষ্ণকে একখানি প্রিয়রজাপক পত্রে
তোমার অবস্থা জ্ঞাপন কর । তিনি অনাথের নাথ, তোমার প্রতি সদয়
হইলে এই বিপদ হইতে তোমাকে উদ্ধার করিবেন ।’ ‘আমি আমাদের
অনুগত সুদেব ব্রাহ্মণকে তোমার লিপি-বাহক করিয়া পাঠাইব ; ব্রাহ্মণ
অর্থলোভে নিশ্চয়ই স্বীকৃত হইবে ।

অপর্যায়ী করিল 'ঠিক বলেহিস্ ডাই'; শ্রীকৃষ্ণ বিপদ-ভরবারণ; তাঁকে সংবাদ দিলে নিম্নেরই এ বিপদে তিনি রক্ষা করিবেন।

তখন সকলে মিলিয়া পত্র লিখিতে বসিয়া গেল, এবং বহুচেষ্টার পরে অক্ষয়লালে অভিব্যক্তি হইয়া রাজকুমারী পত্র সমাপন করিল,

“আমি শুনেছি পুরানে ও রাজ্য চরণে যে জন অরণ লয়,
তুমি বিবম সঙ্কটে আসিয়ে নিকটে দেও হে তারে পদাশ্রয়।
এই বিপদ সময় হইলে সময় যদি আমারে না তারিবে,
তবে এই জিতুবনে দয়াময় নামে চিরকলঙ্ক রহিবে।

বালিকাগণের অগ্রনদে এবং বিলক্ষণ পারিশ্রমিকের আশায় ব্রাহ্মণ সম্মত হইল। বহুচেষ্টা করিয়া পদব্রজে দ্বারবতী পৌঁছিল। সেখানে ব্রাহ্মণের অব্যাহত দ্বার, স্তত্রাং হৃদেবকে কষ্ট করিতে হইল না। দ্বারকানাথ ব্রাহ্মণের বহু প্রকারে সেবা এবং পরিচর্য্যার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। পত্র-পাঠ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সুখমণ্ডল সম্ভার হইয়া উঠিল, তিনি নিকটস্থিত মহাবীর সাত্যাকিকে কহিলেন “আগামী কলা চতুরঙ্গ সেনাদলে বিদর্ভে যাইতে হইবে, তুমি তাহার বন্দোবস্ত কর।”

বরবেশে শিশুপাল।

চেদিরাজ-সভার আজ বড় ধুম। মহারাজ শিশুপাল, বিদর্ভের সুবরাজ রক্ষী কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। লোকলগ্নামভূতা ত্রিলোকমোহিনী কল্পিনী শিশুপাল-মহিষী হইবেন। পূর্ণিমা রজনীতে মহাসিঙ্ঘর জলোচ্ছ্বাস যেমন ঢাকলো কুণপ্রাবী, তেমনি শিশুপালের জদরেও আনন্দ আজ আর ধরিতেছে না। জদরতরীতে বাত প্রতিঘাত করিয়া অপূর্ণ সুখের সুর বাজিয়া উঠিতেছে। সর্গগাথ্যময়ী কল্পিনী তাঁহার ভার্য্যা হইবেন, শিশুপাল সুখের স্বপ্ন দেখিয়া দেখিয়া অগত ভুলিয়া গেল।

কথা উঠিল, কি বেশে কুত্বীন নগরে যাওয়া উচিত। কেহ কহিল চতুরঙ্গ সেনাদলে সাজিয়া পদশাখে মেদিনী কাঁপাইয়া যাওয়া যাক, কেহ পরামর্শ দিল অসংখ্য হস্ত্যশ্বরথসমূহ বাহিনী সজ্জিত করিয়া নানাবস্ত্র কোলাহলে দিকসকল মুখরিত করিয়া যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত। তখন শিশুপালের এক প্রিয়বন্ধু ঘোরে ঘোরে কহিল এ শ্রবণ ত উপলক্ষ মাত্র; মহারাজেরই ত বিবাহ, স্তত্রাং বরবেশে সাজিয়া যাওয়াই সর্ব্বথা যুক্তিযুক্ত। আপনি

বরবেশে রত্নভরণে ভূষিত হইয়া বাইবেন । একে আপনায় পরমহুন্দর রূপ-
কণককিরীটহারে এবং মণিরত্নাদিতে বিভূষিত হইলে, আপনি দ্বিতীয় রতি-
পতির ন্যায় শোভমান হইবেন । তখন দৌলখ্যাগলিতা কল্পিনী বুঝিবেন
আপনাদের উভয়কে একত্র করিবার জন্যই বিধাতা এমন সকল দৌলখ্যের
আধার পড়িয়াছেন ।

রাজমন্ত্রী কহিলেন “মহারাজ নিশ্চয়ই সৈন্যসামন্ত লইয়া বাইবেন ।
স্বয়ম্বর স্থানে কন্যা স্বয়ংবর মনোনীত করিলেও প্রার্থনাই কলহ বিবাদ এবং
বৃদ্ধবিগ্রহাদি উপস্থিত হইয়া থাকে, সেজন্য প্রত্যেকেই প্রস্তুত হইয়াই গমন
করা উচিত । বিশেষতঃ আমি অমূলকান করিয়া জানিতে পারিয়াছি যে
বৃদ্ধরাজ্য ভীষকের মত অন্যরূপ ।

শিশুপাল হাসিতে হাসিতে কহিল, “মন্ত্রী উন্মত্তের ন্যায় প্রণাম করিতেছ
কেন ? যুবরাজ কন্যা আমার প্রাণের সুলভন, বিশেষতঃ মগধের জরাসন্ধ
প্রভৃতি আমার সহায় ; আমি কি পৃথিবীতে কাহাকেও ভয় করি ? মহারাজ
ভীষকের অমত হয়, আমি ক্ষত্রিয় প্রধামুখ্যারী বলপূর্বক কন্যা হরণ করিয়া
লইয়া আসিব । তুমি বাহিনী সজ্জিত হইতে আদেশ কর ।”

শিশুপাল অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন । পরিচ্ছদাগারে গমন করিয়া
কত রকম বেশ পরিধান করিলেন, দর্পনে প্রতিমূর্তি দেখিয়া কিছুতেই মন
উঠিল না । বিচৈত্র কাকনমর অলঙ্কারনিচয়, রত্নময় হার, প্রবালমণিরঞ্জিত
কণ্ঠভরণ, কিরীট, কুন্তল, কর্ণভরণ, কিছুতেই মন উঠিল না । বহুদেশ
হইতে আনীত, উপাধনপ্রাপ্ত বিবিধ প্রকার বস্ত্র আনীত হইল ; মণিরত্নাদির
প্রত্যয় পুরী রঞ্জিত হইল, কিন্তু শিশুপালের কিছুতেই মন উঠিল না । ললাটে
স্বেদবিন্দু আবির্ভূত হইল ; কেমন করিয়া শোভনা কল্পিনীর মনোহরণ কার-
বেন ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না । শেষে বহু চেষ্টার পর বিবাহের
উপযুক্ত পট্টবাস পরিধান করিয়া বাওয়াই ঠিক বোধ হইতে লাগিল । তখন
স্বহস্তে আপনাকে স্নবেশ করিতে যত্নবান হইলেন ।

স্বহস্তে দর্পণ পুরোভাগে দণ্ডাধীন হইয়া শিশুপাল স্বহস্তে বরণীয়
সাজিতে লাগিলেন । চন্দন, কঙ্কুরী প্রভৃতি কত যে অঙ্গে লেপন করিলেন
তাহার ইয়ত্তা নাই ; তথাপি মন সন্তুষ্ট হইল না । পরিশেষে স্রীআচারের
অন্য ব্রহ্মগণ ব্যাঘ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন । শিশুপাল কোন রকমে
প্রসাধনাক্রিয়া সমাপন করিলেন ।

মুহূৰ্ত্তঃ, হলুধ্বনি, অরুধ্বনি এবং শব্দ, হৃদয়ভিনাদের সহিত মহাবল পরাক্রান্ত নরাদিগণ শিশুপাল আকাশমণ্ডল ধূলিপটলাচ্ছন্ন করিয়া চতুঃদিশী লেনা সমভিব্যাহারে কল্পিনী-পাণিগ্রঃণার্মী হইয়া যাত্রা করিলেন। শব্দকোলাহলে ভীত হইয়া বায়নকুল অনবরত কঠোর রব করিতে লাগিল।

স্বয়ম্বর ।

মহারাজ ভীষ্মক তত্ত কাল, পূণ্য তিথি ও পবিত্র ক্ষণে সমাগত মহীপাল-গণকে বিচিত্র স্বয়ম্বর সভায় আহ্বান করিলেন। তৎপ্রবণ মাত্র রাজগণ অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া চাক্ষুশদর্শনা কল্পিনীলাভ আশায় তথায় আগমন করিতে লাগিলেন। কেশরী যেমন গিরিমধ্যে প্রবেশ করে, মণিকুণ্ডলালঙ্কৃত অক্চম্পনাদিপরিশোভিত প্রিয়দর্শন নৃপতিবৃন্দ তজ্জপ কণকস্তম্ভসংযুক্ত, তোরণরাজিবিরাজিত রত্নস্থলে প্রবেশ করিয়া বহুবিধ বিচিত্র আসনে উপবেশন করিলেন। যেমন বায়ু সমূহে পর্জতকন্দের পূর্ণ হয়, তেমনি সেই সমিতি-মণ্ডপ ভূপালগণে পরিবৃত্ত হইয়া অনির্বচনীয় শোভা ধারণ করিল। নির্মূল নভোমণ্ডলে নক্ষত্র শোভার ন্যায় হোমোজধারী সুচাক্ষুশনালঙ্কৃত পাণ্ডবগণের মুখমণ্ডল বিরাজমান হইতে লাগিল।

অন্তঃপুরে সর্বাঙ্গপরিবৃত্তা কল্পিনী ত্রীকক্ষদর্শনাশায় নিরাশ হইয়া প্রাণপণ করিয়া বসিয়াছেন। সখীগণ বৃক্কাইতেছে, অশেষরূপ সাহস দিতে যত্নবতী হইতেছে। কল্পিনীর মন কিছুতেই প্রবোধ মানিল না। কল্পিনী শেষে কাদিয়া ২ কহিলেন “সখি, তিনি যে কাদাইতেই বড় ভাল বাসেন। না কাদিলে বুদ্ধি তাঁর দয়া হয় না, বুদ্ধি অশ্রুজলে মনের মলিনতা ধৌত না হইলে ঔহার দয়া না। কিন্তু সখি, আমার যে আর সহ্য না। মনঃ প্রাণ বাহ্যকে সমর্পণ করিয়াছি সেই কক্ষপূন্য জীবন রাখিয়া ফল কি সখি। আমার কক্ষসেবার উৎসর্গীকৃত দেহ শিশুপাল ধারণ করিবে? সিংহের উপভোগ্য বস্তু পুণালে গ্রহণ করিবে।” কল্পিনী শিশুপালের কথা শ্রবণ করিয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। দাস্তিক শিশুপাল, মগধপতির সহায়তায় মহাবল, আবার কল্পী তাহাতে মিলিত হইয়াছে। কোমলহৃদয়া রাজকুমারী ছিন্নমূল ত্রুততীর ন্যায় মূছিতা হইয়া পড়িলেন।

চেতনা পাইয়া কহিলেন, “সখি, আমি কি অপূর্ণ স্বপ্ন দেখিলাম। ‘চন্দন-চর্চিত নীলকলেবর পীতবসন বনমালী’ ত্রীকক্ষ আসিয়া আমাকে অতঃ

দিতেছেন।” কল্পিতের চক্ষে জলধারা বহিল। তিনি আবার কহিলেন “সখি, আঁহা কি দেখিলাম

“চন্দ্রকটাক্ষ মধুরলিখিতকমণ্ডলবল্লিতকেশম্

প্রচুরপূরুষধর্মমুগ্ধবস্ত্রিত মেহুরমুদিতরস্বতশেখম্ ॥”

হবে কি সখি? আমার এই হৃৎকথন সকল হবে কি। নাপ, যেন শত বীণার স্বরার দিয়া কহিলেন, ‘শ্রেয়সি, ভীতা হইও না, আমি তোমাকে গ্রহণ করিব বলিয়া আসিয়াছি।’

মহাবেগে অতি ক্রোধে কল্পী কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ভগিনীকে সখিগণ মধ্যে যৌবনপরায়ণা প্রত্যক্ষ করিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া কহিলেন “সমস্ত নরপালগণ সভায়; এখনও এখানে বিলম্ব কেন? অবিলম্বে কল্পিতকে লইয়া তোমরা আগমন কর।’ বলিয়া কল্পী চলিয়া গেল। সখিগণ মধুর বচনে কল্পিতকে প্রবেশ দিল, কল্পিত নুমানের পতি অব্যবহায়ে রক্তহলে প্রবেশ করিলেন।

সমবেত নৃপালমণ্ডলী নিম্নমেঘ লোচনে, অলৌকিক রূপধোবনসম্পন্ন কন্যারূপ কল্পিতকে সন্মর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের দৃষ্টি অণকালের নিমিত্ত ও লক্ষ্যান্তরে পরিচালিত হইল না।

কল্পিত রক্তহলে প্রবেশ করিয়া আকুল নয়নে চারিদিকে তাকাইয়া অপ্রদৃষ্ট মদনমোহন রূপের অমূল্যদান করিতে লাগিলেন। তাঁহার চকল নয়নগুলি যেন কাহার সন্মুখের চারিদিকে ফিরিতেছে। শিশুপালের বক্ষঃস্থল কাঁপিয়া উঠিল, তাহার সর্বশরীর শ্বেদসিক্ত হইল। সভার প্রীতিক্ত না দেখিয়া কল্পিত চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। বিশাল লোচন-ধর বর্ষাবারি-বিধৌত কমলিনীর ন্যায় অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। বড় কাতরে প্রাণের আশার ব্যাকুল হইয়া ডাকিল “কোথার তুমি লজ্জানিবারণ, অণতির পতি! আমি যে তোমার আশার প্রাণ এখনও রাখিয়াছি। প্রভু, জীবন পরিত্যাগ করিব, বৃদ্ধাকালেও তোমাকে দেখিলাম না, এই বড় দুঃখ মনে রহিল।” কল্পিতের পদতল হইতে যেন ধরিয়া সরিয়া গেল, আকাশমণ্ডল কপিল বর্ণ ধারণ করিল। কল্পিত সংজ্ঞাহীনা হইল।

অকস্মাৎ সভা মধ্যে মহাকোলাহল শব্দ উঠিত হইল। অদৃষ্টপূর্ব্ব কেহ আসিয়া রাজকুমারীকে রণে তুলিয়া লইয়া গ্রন্থান করিল। রাজগণ যে যাহার আয়ুধ গ্রহণ করিয়া ভীমরবে ভীষণ বেগে পশ্চাৎ ২ ছুটিল। গুরুত্বপূর্ণ

দেখিয়া কাহারও আর বুঝিতে বাকী রহিল না। নিতুপাল মহাক্রোধে বার্হগত হইল। জরাসন্ধ গজিয়া কহিল,

“আরে মুঢ় মন্মথভি, ওরে দুরাচার।

চুরি করি লহ কন্যা অগ্রেতে আমার।”

আমি কত্রিহ, যুদ্ধার্থে তোমাকে আহ্বান করিতেছি।

“শৃগালের প্রায় কেন কর পলায়ন।

যুদ্ধ জিনি লহ কন্যা করি প্রাণপণ।”

কত্রিহ যুদ্ধে আহুত হইলে প্রাণ গেলেও প্রত্যাখ্যান করে না। শ্রীকৃষ্ণ রথ ফিরাইলেন। তখন যদুবল শুশ্রূতান হইতে বাহির চটল, বলদেব, সাত্যকি, কৃতবর্মা প্রভৃতি মহারথীরা সিংহনাদ করিয়া যুদ্ধজু নৃপতিমণ্ডলীকে আক্রমণ করিলেন। তুমুল সংঘর্ষ আরম্ভ হইল। কল্পী সকলকে পশ্চাদ্গত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের রথ অমূল্য করিল এবং তত্বর বলিয়া গালি দিল। শৃগালের শব্দে বেন সিংহ নেউটিগ।” শ্রীকৃষ্ণ রথ ফিরাইয়া কল্পীর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে রাজগণ কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া বাদবগণের অপ্রমত্ত পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। কল্পী প্রাণপণ করিয়াছে। ভগিনীকে চুরি করিয়া লইয়া যার, বিশেষ প্রিয় বন্ধুবর্গের সমক্ষে। সহস্র বৃশ্চিক বেন সর্কাক দণ্ড করিতে লাগিল। কল্পী আপ্রাণ চেষ্টায় বিবিধ শরিক বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু মহাবল শ্রীকৃষ্ণ কণকাল মধ্যেই তাহাকে অস্ত্রশূন্য করিলেন, এবং মহাক্রোধে তাহার শিরচ্ছেদন করিবার জন্য শাণিত খড়্গ উত্তোলন করিলেন।

এমন সময় প্রিযদর্শনা কল্পিনী যুদ্ধ করে সজলনরনে শ্রীকৃষ্ণের নিকট ঝাঁড়াইয়া সোধারের প্রাণ তিকা চাহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ খড়্গা ফেলিয়া দিয়া আরতলোচনা সর্কশোভাময়ী কল্পিনীকে বন্ধে ধারণ করিলেন। সূতের আতিলবো ভীকক-দুহিতার সর্কশরীর কল্পিত হইতে লাগিল। ‘আমি কমা করিলাম’, এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ বৈদভীকে বাহপানে বন্ধ করিলেন। নিবিড় জলদগ্নানিতে বেন সোধামিনী শোভিল। সাধনা দিষ্টির সহিত মিলিত হইল।

শ্রীঅতুলচন্দ্র খটক বি, এ।

উৎসব ।

ওঁ শ্রী আদ্যারামায় নমঃ ।

অষ্টৈব কুরু যচ্ছ্রয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি ।
স্বগাত্ৰাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে ॥

২য় বর্ষ]

১৩১৪ সাল, অগ্রহায়ণ ও শৌব ।

[৮ম ২ম সংখ্যা

একা ।

স্বথেতে কারো সাধিনি বাহ,
চলেছি আমি একা ।
দাঁড়াতে নারি, সহেনা দেরি
পথটি বড় বাকা ।
ওগো, চলেছি আমি একা ।

আপন বোকা আপনি বহি',
চলিছু ধীরে পথ বাহি',
ওদিকে আর কিরে না চাহি—
সব শূত্র ফাঁকা ।
ওগো, আমার বাধা আমি বুঝি,
চলেছি আমি একা ।

জীবনভরা আর্ন্তনাদ,
স্বপ্নে মম বিশ্বাদ,
চরণে সবে গড়ারে দাও—
বাধিতে কেন রাখা ?
ওগো, আমার বাধা আমি বুঝি,
চলেছি আমি একা ।

সন্ধ্যা দেখে ঘনিয়ে আসে,
 প্রকৃতি খল খল হাসে,
 নবীন মেঘে উজ্জল ছটা
 সিন্দূর ঘনরেখা ।
 ওগো, বুঝেছি আমি ফুরাল দিন—
 আমারে কেন ডাকা ?

চাহিনা কিছু রহ ঘন,
 চাহিনা রাজসিংহাসন,
 আমার শিরে শোভিত
 রাজ-ছত্র তরশাখা ।
 ওগো, বুঝেছি আমি ফুরাল দিন—
 আমারে কেন ডাকা ?

শ্রীহরিশ্চন্দ্র চক্রবর্তী ।

ইন্দিয়ারাম ও আত্মারাম ।

দুঃখ পাও তাত দেখিতেছি । সকল দিন ত এক রকমে কাটে না । যখন কিছু দেখিয়া একটা ভাব পাও—তখনও বিচার কর ভাবটুকু কতক্ষণ থাকিবে ? না হয় কবিতাই লিখিলে—তাহাতে হইল কি ? কত কবিতাই ত লেখা হইল কিন্তু দুঃখ কি গেল ? কাহাকে দেখাইতে লিখিবে বল ? না হয় কেহ দেখিল তাহাতে কি জুড়াইলে ? ভাব ত ক্ষণকালের জন্য আসিল গেল ইহাতে ত শান্তি মিলিল না । নিজের মনের ভাব নিজে দেখিবে বলিয়া না হয় লিখিয়া রাখিলে, তাহাতেও বল কোন ফল লাভ করিলে ? দুঃখের প্রতিকার যেখানে, সেখানে না খুঁজিয়া অন্ত চেষ্টা করিলে কি হইবে ?

দুঃখ দেয় মন । যেহে কেন হওনা—সাধক সাধিকা, প্রেমিক অপ্রেমিক, দাধু অদাধু, গৃহী গৃহত্যাগী, রাজা রাণী, সধবা বিধবা—যেহে কেন হওনা বেশ করিয়া দেখ বুঝিবে দুঃখ দেয় মন । মনের উপর নজর না রাখিতে পার—কাহারও দুঃখ দূর করিতে পারিবে না । মনের উপর নজর না রাখিতে পার যখন ভজন ও ঠিক হইবে না । রোজ করিতেছ, রোজ দুঃখ থাকিয়া যাই-তছে । হট্টগোল করিয়া অন্ত কর্ম করিয়া মনকে একটা মারিক তৃপ্তিতে যাপ্ত রাখিতেছ কিন্তু ইহাতে তোমার গন্তব্য স্থানে যাওয়া হইবে না ।

মনই তোমার প্রবল শক্তি । এই শক্তিকে আরও কর, হুঃখ দূর হইবে ।

মনই তাঁহার ভর্গ । বরণীয় ভর্গই মনের নিবৃত্তি ভাগ—সাধারণ ভর্গ মনের -
প্রবৃত্তি অংশ । হে বরণীয় ভর্গ আমাকে—আমার বুদ্ধিকে তোমার শাস্তরাণ্যে
লইয়া চল, আমি আপনি পারিতেছি না—কোথায় তুমি নাই ? বাহা কিছু দেখি
সবই দেবের শক্তি বটে । বেথানে প্রবৃত্তি লাফালাফি করিতেছে সেখানেও
মূলে বরণীয় ভর্গ আছে, নিবৃত্তি আছে । তাই যাহাকে দেখ না কেন সকলকেই
বলিতে পার—আমি তোমার আজ্ঞামত চলিতে প্রাণ পণ করিতেছি—হে
আকাশ, হে বায়ু, হে জল, হে পৃথ্বী, হে অগ্নি, হে মনুষ্য, হে পশু, হে পক্ষী,
হে জল, বৃক্ষলতা সবাই তোমরা তাঁহার শক্তি সন্দেহ নাই ; হে সূর্য্য, চন্দ্র,
নক্ষত্র তোমরা সকলেই তার শক্তি—তাই আমার তোমরা পথ দেখাইয়া
লইয়া চল—আমি এক ভাবে চলিতে পারি না । ইহাই উৎকৃষ্ট উপাসনা ।
মনও সেই দেবতার শক্তি ।

মনই হুঃখ দিতেছে সত্য—মনকেই প্রার্থনা করিতে হইবে । মন তোমার
খেলা আর আমি সহ্য করিতে পারি না—তুমি আমার আমার প্রিয়দর্শনের
কাছে লইয়া চল ।

মনই আমার প্রকৃতি । এই প্রকৃতি পুরুষের বক্ষে নাচিতে ছিল । মন
নাচে চৈতন্তের উপরে । চৈতন্ত নাচেন না—এই নৃত্য পুরুষ ছাড়িয়াই হৃদয় ।
এই নৃত্যই ব্যভিচার ।

মনের চেতন অংশই পুরুষ । অজ্ঞ অংশ প্রকৃতি । পুরুষের উগ্র চিন্তায়
প্রকৃতির ব্যভিচার শাস্ত হয় ।

প্রবৃত্তি (চঞ্চল মন) দৃষ্ট হইল—নিবৃত্তি আর কিছুই প্রথমে পারক আর
না পারক, শুধু চঞ্চল মনের চাঞ্চল্য স্থির হইয়া দেখিল । নিবৃত্তিই বৈরাগ্য ।
দেখিতে দেখিতে বৈরাগ্য আসিল । মন নৃত্য ছাড়িল—ছাড়িয়া ভুবিল নিবৃত্তি
মার্গে । প্রবৃত্তি নিবৃত্তিতে শাস্ত হইল ।

কর্ম করা হর কর্মত্যাগের অন্ত । প্রবৃত্তিমার্গে মনই কর্ম করে । সে কর্ম
স্বাভাবিক । এই গুলি ইঞ্জিয়ারের কর্ম—রিপুর কর্ম । এই স্বাভাবিক কর্ম মৃত্যু ।

প্রবৃত্তি—নিবৃত্তিমার্গে বেদবোধিত কর্ম—ইহাও অবিদ্যা সত্য—কর্মমাত্রই
অবিদ্যা—তথাপি বেদবোধিত অবিদ্যা-দৃষ্ট কর্ম শুভ পথে লইয়া যায় । ঐটি
নিবৃত্তি মার্গ কর্ম ছুটাইয়া অবিদ্যার হস্ত হইতে রক্ষা করে । অবিদ্যা দ্বারা
বিদ্যা লাভ হয় । বিদ্যা লাভ হইবামাত্র প্রকৃতি পুরুষের সমান চিত্তবৃত্তির

সঙ্গম-আন্দোলনজনিত যে সুখ সেই সুখই চিন্তাকালে ভোগ হয় । অন্য সমস্ত সুখ মহাকাশে ভোগ হয় । স্থল সুখের কামনা যতদিন থাকে ততদিন দুঃখ দূর হয় না—চিন্তাকালে যে সুখভোগ হয় তাহাই স্তম্ভিযোগ—ইহাই নিত্য-ধামে লইতে পারে ।

বড় দরকারী কথা এই—সমান চিন্তাবৃত্তির সঙ্গম-আন্দোলন-জনিত সুখ । প্রকৃতি পুরুষের দ্ব্যর্থ মিলন ইহা—এই মিলনে নিত্য সুখ প্রকাশ হয় ।

আর ইন্ডিয়ান সুখ আগমাপায়ী । মৃত লোকে মনে করে লাখ লাখ বৃক্ষ হিয়ার হিয়ার রাখা যায় । ইন্ডিয়ান সুখ অবিরামে ভোগ হয়না । নিবৃত্তিমার্গের সুখই নিত্য সুখ—এই সুখই অবিরামে ভোগ হয় । শ্রীভগবান ইহা লক্ষ্য করিয়াই বলেন—ব্রহ্মসংস্পর্শে অত্যন্ত সুখ—“অত্যন্তঃ সুখমশ্রুতে ।”

ব্রহ্মসংস্পর্শ-জনিত সুখ অপেক্ষা অত্যন্ত সুখ আর কিছুই নাই । হায় ! আজকাল সভ্য জগৎ নিত্যন্ত অসত্যের মত ইন্ডিয়ান সুখকেই স্বামী করিতে চায়—দীর্ঘকাল ধরিয়া ভোগ করিতে চায়—দীর্ঘকাল না পারিলে আবার পুনঃ পুনঃ ভোগ করিয়া প্রবাহরূপে নিত্যন্ত আনিতে চায় । সভ্য জগতের গর্দভত্ব ইহা আর কোথাও নাই ।

জগতের জন্য কার্য কর । কি কাজ করিব ? যে কার্য করিলে আর এই দুঃখ থাকে না সেই কার্য বেখাও । কার্যত অনেক করিতেছে—আর শেষে মরিতেছে—শেষে মৃত্যুকালে আধুনিক কর্মী কিছুই করিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখ করিয়া বিবন যাতনা পাইয়া মরিতেছে । জগতের দুঃখ কিন্তু কিছুই নিবারণ হইতেছে না । বড় বড় আজকালকার কর্মবীর কত মরিল কিন্তু জগতকে কতটুকু দুঃখশূন্য করিয়া গেল ? দুঃখ যে দিতেছে তাহার দিকে লক্ষ্য নাই শুধু কর্ম কর—ইহা অপেক্ষা অজ্ঞান আর কি আছে ? যেই দুঃখ দিতেছে সেই কর্ম কর্ম করিয়া মৃত্যুমুখে ছুটাইতেছে ।

বাহার স্বভাব আগমাপায়ী সে কি নিত্য সুখের সংবাদ দিতে পারে ?

আপনার মধ্যে যে প্রকৃতির নৃত্য পুরুষের উপর হইতেছে, যে মনের চঞ্চলতা চৈতন্যের উপর হইতেছে—এই নৃত্য শাস্ত করিয়া বিনি প্রকৃতি পুরুষের শাস্ত্যভাব অনুভব করিয়াছেন—পুরুষের সহিত মিলনে প্রকৃতি আপন সবা হারাইয়া যখন একমাত্র পুরুষ সবাতেই মগ্ন হইয়া থাকে—যখন আনন্দভাবে তন্মগ্ন হইয়া যায়, শেষে এই আনন্দেই সমাধিমগ্ন হইয়া স্থিতিলাভ করে—আবার সমাধি ভঙ্গ করিয়া “স্বয়ম্ভা দিবোল্লসন” হয়—সমাধির পরেও সৃষ্টি হইলে সে

দৃষ্টিতে তখন খেলা মাত্র থাকে কোন অজ্ঞান থাকে না তখনই জীবনের উদ্দেশ্য সমাধা হয় ।

দৃষ্টিই প্রকৃতির বাস্তবিক—প্রবৃত্তির নৃত্য । প্রকৃতির নৃত্য নৃত্যহীন মত ও হয় আবার বিকৃতিহীনও হয় । প্রকৃতহুই নৃত্য অমৃত মুখে, আনন্দ মুখে ; বিকৃতহুই নৃত্য মৃত্যুমুখে—ইহাতে যে একটু সুখ থাকে সেটা সুখগন্ধি দুঃখ মাত্র । এই সুখগন্ধি দুঃখের জন্য ছুটিয়া মরিতে কেন, ইহাতে কুড়াইতে পারিবে না ।

প্রকৃতির বিকৃতহুই ভঙ্গ কর । পুরুষের উপর দর্শনে প্রকৃতির বিকৃতহুই ভঙ্গিবে । মন বন্ধের উপরে যেমনভাবে নাচে নাচুক, তুমি মনকেই দেখিতে চেষ্টা কর—নিতা কর্ম করিতে করিতে মন যাহা করে দেখ, ইহাতেই মনের বিকৃতহুই ভঙ্গিবে । প্রকৃতহুই নৃত্য আরম্ভ হইলে—ক্রমে সমস্ত স্পন্দন, সমস্ত নৃত্য শেষ হইয়া প্রকৃতি পুরুষের মিলন হইবে—অর্দ্ধনারীশ্বর অবস্থায় নরনে নরনাবদ্ধ মূর্তিতে এক হইতে থাকিবে । কখন এক হইবে, কখন বহু হইয়া আপনার সহিত আপনি খেলা করিবে । অনন্তকাল ধরিয়া এই খেলা চলিবে, চলিয়াছিল, চলিতেছে ।

দেখদেখি দেবাদিদেব কিরাতরূপ ধারণ করিয়াছেন আর সমুখে কিরাতিনী কি অপূর্ণ সাজে সাজিয়া আসিল দেখ—মস্তকে ময়ূর পুচ্ছ, পৃষ্ঠে কিরাতের তৃণী, চরণে হুপূর । কি মনোহর বেশ । দৃষ্টি কিন্তু ত্রিশূলধারী সর্পবিভূষিত, চন্দ্রকলা-মৌলিবদ্ধ কিরাতের উপর । ইহারাই অগতের কঠা—ইহারাই শক্তি শক্তিমান সর্বব্যাপী হইয়াও কিরাত কিরাতিনী সাজিয়াছেন । তুমি যাহাই কেন হও না নিজ শক্তিকে না দেখা পর্যন্ত সাধ কিছুতেই মিটিবে না—ইহার উপরের খেলা কেহই বলেন না । সেখানে বৃষ্টি খেলা নাই । ইহা বৃষ্টিয়া ইহাতে বোপদান করিতে পারিলেই জীবিতোদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল ।

নিজে ধন্য হইয়া সকলে যাহাতে শান্ত হইতে পারে তাহার জন্য লোককে কর্ম করাইতে পারিলেই ঈশ্বরের প্রিয় কাণ্ডা হইল । প্রবৃত্তি মার্গে চলা বা চলিতে উপদেশ করা ঈশ্বরের প্রিয়কার্যসাধন নহে । প্রবৃত্তিমার্গ ইঞ্জির সুখের স্তম্ভ ।

তাই একবার ভাল করিয়া দেখ ইঞ্জিরসুখই অবলম্বন করিয়া আছে কি না ? “অযায়ু ইঞ্জিরারামো মোক্ষং পার্থ স জীবতি” ইঞ্জিরারাম যদি হও তবে তোমার জীবন পাণ জীবন—তোমার জীবন বৃথা । বড় সাবধান হইয়া দেখিও

যেন ইঞ্জিরাম না হইয়া যাও। আগমাপারী বাহা তাহা ত্যাগ করিয়া নিবৃত্তিপথে চল। ব্রহ্মসংস্পর্শ হউক। প্রকৃত স্বথ আশ্বাসিত হউক।

তাই আবার বলি নৃত্যকালি! একবার নৃত্য ছাড়। আর যদি নাচিতেই হয় তখন বিরক্ত নৃত্য ত্যাগ করিয়া একবার না হয় ছন্দ মত নাচ, আমি স্বচ্ছন্দ হইয়া যাই। রক্ততমের নৃত্য ছাড়িয়া একবার না হয় সন্তোষে নাচ। সর্বাংশে এই ত্রিবিধ নৃত্য ত্যাগ করিয়া একবার নিবৃত্ত হইয়া স্বামীকে বক্ষে ধারণ কর।

এতদিন ত স্বামী বক্ষে নাচিয়াছ এখন একবার স্বামীকে বক্ষে ধারণ কর। প্রকৃতি পুরুষকে বক্ষে ধারণ করিলেই প্রথমে অর্ধনারীশ্বর—শেষে শুধু পুরুষ। প্রকৃতি-লবন পুত্তলিকার সমুদ্র মাফ করা মত, ছায়ার সূর্যালোক দর্শন করা মত, প্রিয়তমের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া অভিন্নভাবে একবার আয়সংহ হও। শিবশক্তি একত্র হউক—শক্তি শক্তিমান্ মিলিত হউক। ইহাই চরম আনন্দ। এক হইয়াও আবার খেলা পাইলে আবার প্রকৃতি গ্রহণ হইবে। প্রথম ঘুম ঘোরে আলিঙ্গন, তাহাই সুষুপ্তি—ক্রমে স্বচ্ছভাবে চিত্তাকাশে শক্তি শক্তিমান, ক্রমে সূর্য জাগ্রত অগতে মহাকাশে খেলা। ছন্দমত খেলা করিতে পারিলে জাগ্রতস্বপ্ন সুষুপ্তি তুরীয় যাওয়া আসা ভাব নাই।

তাই শাস্ত্র বলেন, শাস্ত্রমত শরীর বাক্য ও মনকে স্পন্দন করিতে পারিলেই সমস্ত পুরুষার্থ সিদ্ধি। আর বেদবিধি উন্নত্বন করিয়া নাচিতে গেলে ছন্দ-ভঙ্গ হয়, তালমত নাচা হয় না এই রূপেই দ্বন্দ্ব হইতে দ্বন্দ্বাত্মক পুনঃ পুনঃ বাওয়া আসা হইতে থাকে। তাই বলি মন নৃত্য ছাড়। ইঞ্জিরাম না হইয়া আয়ারাম হও। কবে হইবে?

বিজয়া।

(প্রাপ্ত)

“আগমনী” লিখিতে গিয়াও আমার “বিজয়া” লেখা হইয়া যায়। আমার বিজয়া বারমাস। তাই সময়ে বিজয়া হয় নাই, পাঠক পাঠিকাগণ যেন আমার ক্ষমা করেন।

আজ তিন দিন গিরিরাণী বড় ব্যস্ত ছিলেন। বহু কষ্টে বহু সাধ্যসাধনার দ্বন্দ্বের ধন পাইয়া সর্বস্বথ নিবৃত্তি হইয়াছিল। রাণী একে একে উমাকে

সব দেখাইতেছেন, একে একে হর্ষ-গদ-গর জাবে আপনার দুঃখের কথা বলিতেছেন। একে শরৎকাল, তার উমা আগমনে দশদিক্ আর ও নিশ্চল হইয়াছে। রজনী গভীর, সমস্ত দিন উৎসবের পর হিমালয়পুরী এখন নিস্তব্ধ। মেনকার চক্ষে নিদ্রা নাই। পূর্ণ আনন্দে জড়তা কোথায়? জ্যোৎস্না-লোকে মেনকা উমাকে কোলে ধারণ করিয়া কত কথা কহিতে চান, আনন্দে কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আইসে, উমার মুখের পানে অনিবিধ লোচনে চাহিয়া থাকেন, বলা আর কিছু হয় না। বহুক্ষণ পরে রাণী আত্মসম্বরণ করিয়া কহিলেন মা, এই চাঁদ কতবার উঠিল, কতবার ডুবিল আমি তোমার আশা পথ চাহিয়া চাহিয়া মিন গণনা করি। তুমি যাহা ভালবাস, তোমার যাহা প্রিয়, আমি জীবন ভরিয়া তাহা সংগ্রহ করি। তোমার প্রিয় বস্তুগুলি আমি স্তরে স্তরে গুছাইয়া রাখি, সারাটি বৎসর ধরিয়া আমি তোমারই জন্য আয়োজন করি। দিন গণিতে গণিতে বাড়িয়া যায় তুমি আর এসনা, নিরাশার বুক কাটিয়া যায়, দেহ ভাঙ্গিয়া পড়ে, তথাপি জোর করিয়া সব করি। দেহত্যাগ ইহাত বড় সহজ কথা, কিন্তু মা! বলিতে কি, আমার এ দেহত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় না, কেন না এই জোড়ে তোমার একদিন ধারণ করিয়াছিলাম, আমি এই বক্ষে রাখিয়া তোমার একদিন স্তনপান করাইয়াছিলাম, এই চক্ষু একদিন তোমার মনমোহিনী মূর্তি দেখিয়াছিল, এই কর্ণ একদিন তোমার মধুময় বাক্য শ্রবণ করিয়াছিল। তুমিও একদিন মা ভিন্ন কিছু জানিতে না। হায় মা, সে দিন আমার কোথায় গেল? আমি না সাজাইলে তুমি সাজিতে না, আমি না খাওয়াইলে তুমি খাইতে না, আমি না আদর করিলে তোমার অভিমান ভাঙিত না। বল মা এতদিন কেমন করিয়া ছিলে। আমি না হইলে তোমার যে ক্ষণকালও চলিত না, বল মা এ দীর্ঘকাল কেমন করিয়া থাক? পাবাগী, কেমন করিয়া বুক বাড়িয়াছে? এ দুঃখিনীকে কি একেবারে ভুলিয়াছিলে? নাগো, তোর অভাবে আমার বড়ই যন্ত্রণা হয়, বল মা, আর আমার ছেড়ে যাবিনি, বল মা, আর আমার কাঁদাইবিনি, মা আমার যে আর কেহ নাই, বলিতে বলিতে মেনকা উমার কণ্ঠালিঙ্গন করিলেন। ভক্তবৎসলা অগভজননী বড় আদর কোরে মার কক্ষে মস্তক রাখিয়া ডাকিলেন, মা! রাণী অস্তরে নিঃশ্বাস উঠিলেন সজল নয়নে উমার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। ধীর বিশ্ববিমোহিনী মায়ীর ব্রহ্মাও আবৃত, মেনকাকে ভুলাইতে তাঁহার কতক্ষণ। উমা আধ আধ স্বরে মাদ্রের গলা ধোরে হরের ঘরের কথা কতই কহিলেন।

বড় অভিমান কোরে বলিলেন মা, তুমি যে বড় দুখে থাক, তাহা আমি জানি, আমি ভিন্ন তোমার যে আর কেহ নাই, তাহা আমি বেশ জানি । কিন্তু মা তোমারাই ত দেখিয়া তুমি আমার পাগলের করে সমর্পণ করিয়াছ ?

সে ভিন্ন আমার কেহ নাই, সেই সব, সে ছাড়া আমি এক মণ্ড থাকিতে পারি না, এ কথা মাত্র নিকটে বলিতে বৃষ্টি কেমন একটু বাধ বাধ হয়, কেমন আপনা হইতে একটু লজ্জা আইসে, তাই মা বলিলেন, মা “আমি বিনা পাগলের কেহ নাহি আছি” মাপো,

আমি যদি যাই সোরে	কণিকে প্রেমের করে,
শব প্রায় থাকে পড়ে,	আসিতে পারিনে তাই,
কেননা কেননা তুমি,	তোমারই আছি মা আমি,
অরিছে পাগল আমি	এখন তবে মা যাই ।

ভক্তের কথা কহিতে কহিতে মা বড় ব্যাকুল হইলেন ।

কহিতে হরের কথা অত্যা চকল,
রোমাঞ্চিত কলেবর আঁধি ছল ছল ।

হিমালয় কি মার ভক্ত নয় ? ভক্ত সত্য । ভক্ত না হইলে মা অপতজননী আসিবেন কেন । যাহার অঠরে অনন্ত কোটা ব্রহ্মাণ্ড তিনি ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিতে অক্ষ হইয়াও অগ্রগ্রহণ করেন, নিরাকার হইয়াও ভক্তের মনমত রূপ গ্রহণ করেন, নিকর্য হইয়াও সকল কর্ম আচরণ করেন । হিমালয়ের মত ভাগ্যবান কে ? ভগবান ব্যাস বলিয়াছিলেন—“অহো হিমালয়ভক্ত ধন্যোহসৌ ভাগ্যবানিতি, ব্রহ্মাণ্ড অঠরে সন্তি ব্রহ্মাণ্ডানাং কোটয়ঃ । সৈব ব্রহ্মভূতা জাতা কো বা জ্ঞাতংসমো ভূবি ॥ মায়ে যিরে কত কথাই হইল । কথার কথার নবমী রাজি শেখপ্রায়, সহসা বিদায়-বাজনা বাজিয়া উঠিল । গিরিরাজী একবারে চমকিয়া উঠিলেন । ছুই হস্তে উমাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া মা, মা, করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন । যেনকা জানিতেন মেয়ে বড় একগুঁয়ে, যা ধরে তাই করে, উমার তপস্তার কথা মনে হইল । আর বাধা দিলেন না । অস্তরে একটু সুখও হইল, উমার সুখই আমার সুখ, উমার আনন্দই আমার আনন্দ । উমা যেখানে সুখে থাকে থাকুক, ইহা স্থির করিয়াও মার মন প্রবোধ মানে না, তবুও ক্ষম্য বাধিতে পারেন না । উমার বিদায় এ ভাবিলেও যেন অস্তর ধসিয়া যায়, মন আপনা হইতে ব্যাকুল হয় । পুরনারী ও উমার শৈশব সঙ্গিনীগণ উমাকে চারিদিকে ঘেরিয়া রোদন করিতেছেন । সকলে কাঁদিতে কাঁদিতে উমার মুখে মিষ্টান ও সুশাসিত তাড়ুল প্রদান করিতেছেন, কেহ বা অতি বরে

মার নৃপুংসোদ্ভিত বাবক-চুড়িত স্রীপাদপদ্মের খুলি ঝাড়িরা দিতেছেন, কেহ বা মায় সিংহার সিন্দূর ঢালিরা দিয়া বিধুখণ্ড ভালে টিপ কাটিয়া দিতেছেন, মার মুকুটস্থিত মণিচর অলঙ্কারাগে রঞ্জিত হইয়া বড় ঝলমল করিতেছে। মা লিংহবাহিনী সবে মাত্র বাম পদ ষাড়াইয়াছেন, স্রীতিপ্রকৃৎমুখে চম্পক অঙ্গুলি ঈষৎ সঞ্চালন করিতে করিতে যেন সকলকে সান্বনা করিতেছেন, নীল নলীনাভ অঁাখি অশ্রুজলে বৃন্তকোকননসম শোভা পাইতেছে। এমন সময়ে দ্রুতবেশা মূক্তবেশা মেনকা বহু কষ্টে ভিড় সরাইয়া হুবাছ তুলিয়া উদ্গাদিনীসম বলিয়া উঠিলেন, “দাঁড়া মা দাঁড়া উমা, দাঁড়া জন্মের মত হেরি, বাবার বেলা মা বলিয়ে আর মা একবার কোলে করি, সখংসর পর শিবে, তুমি পুনঃ আসিবে, সে আশায় না প্রাণ হবে ওগো শকরী” দাঁড়া মা দাঁড়া একবার ভাল কোরে দেখি তোরে। সুধাসুধী ! একবার কোলে আর, আর একবার মা বলে ডাক্, মাগো তোয় কথা শুনিয়া, আমার আশ মিটেনা, তোকে দেখিয়া দেখিরাও আমার দেখার শেষ হইল না। মা বহুবার মত কষ্ট সহিয়াও তোমার আশায় জীবন রাখিয়াছি, মা আর বৃদ্ধি তোমার বিরহ এ দেহ সহ্য করিতে পারিল না। মাগো, তোমার না পাইলে এ জীবন আমার বৃথা। মা কবে তুমি আমার নিকটে নিত্য থাকিবে, কবে তোমার এই আনন্দময়ী মূর্তি আমি সর্বদা দেখিতে পাইব। তুমি যে সচ্চিদানন্দরূপিনী, তুমি যে ব্রহ্মাণ্ডপ্রসবিনী ইহা আমি জানি। মা নিত্য শুদ্ধা সনাতনী, আমার কখন ত্যাগ করিও না, মা আর ভুলে থাকিস্ না। মা আর একটা কথা, সেই মহাবিশ্বতি সময়ে, সেই মহামোহ কালে একবার এমনি কোরে দাঁড়া মা; মা, তুমি ভিন্ন আর আমার কে আছে মা, মাগো রক্ষা কর এ মহাসঙ্কট হইতে আমার উদ্ধার কর।

(মাগো) যখন এসে ধোরবে কালে, রক্ষা কোরো মা সেই কালে

কেহ নাহি নিদান কালে তরসা ঐ চরণ তরি।

হইল না কেন ?

এতদিনেও ত হইল না ? কি করিলে তবে ? সম্মুখে যে তারি বিপদের
দিন আসিতেছে।

হং হং বাপি স্মরন্ ভাব্য ভাব্যভাসে কলেরবঃ ।

তং তমোবৈতি কৌন্তের সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৮১৬ গীতা

মৃত্যুকালে—ঠিক এই যেহেতু ভাগ্য করিয়া যখন বাইতে হইবে—তখন যে ভাবটি মনে উদয় হইবে সেই ভাবের সেহি ধরিতে হইবে। সেই ভাবে ভাবিত থাকিতে বড় অভ্যাগ করিয়াছিলে বলিয়া মৃত্যুকালে চির অভ্যাগের ভাবটি যে মেহে অনারাসে কার্য্য করিতে পারে সেই মেহটি তোমার ধরিতে হইবে।

একবার মানুষ বেহ পাইলে আর পণ্ড মেহে বাইতে হয় না এই শিক্ষা বাহারা দিতেছেন তাহারা জগতের অজ্ঞান-বুদ্ধির অন্তই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বেদ, শ্রুতি, স্মৃতি, বিচার এবং অমৃতত্ব সমস্ত দিয়াই যেখান যায় মানুষ হইলেই নিকৃতি পাইলেনা—মানুষের কার্য্য যে ধারণাত্মানী হওয়া এবং যুক্তিমান হওয়া তাহা যতদিন না হইতেছে ততদিন—“বঃ বঃ বাপি স্বরণ্য ভাবঃ তাজতাস্তে কলেবরঃ”—মৃত্যুকালে বাহা মনে পড়িবে তাহাই হইতে হইবে। একজন বেশ ধর্ম্ম আচরণ করিতেন—কিন্তু অভ্যাগ পাকা হইল কিনা তজ্জন্ত চেষ্টা ছিল না। লোকটির গঙ্গাজলে, গুরুর নিকটে, গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম বলিবার অব্যবহিত পরেই মৃত্যু হইল। কিন্তু তাহার মৃত্যুর পরেই উহাদিগের গৃহে ভূতের ভয় হইল। কোথাও কিছু নাই হঠাৎ মাটির গৃহ চাল শুক নড়ে, যেখানে সেখানে ইট পাটকেল পড়ে, সন্ধ্যার সময় মনে হয় কে ঘেন অন্ধকারে দাঁড়াইয়া আছে—ইত্যাদি বহু অত্যাচার হইতে লাগিল। গৃহস্থ, গুরুকে ডাকিলেন। গুরু সিদ্ধপুরুষ। শুদ্ধ কারণ নির্দেশ করিলেন। মৃত ব্যক্তি প্রেতধোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শুদ্ধ মৃত প্রেতের সহিত কথা কহিয়া জানিয়াছিলেন তাহার প্রেতত্ব খটিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন “গঙ্গাজলে গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম বলিয়া তোমার মৃত্যু হইল তথাপি এরূপ অসদগতি কেন হইল” ? প্রেত বলিল, গঙ্গা নারায়ণব্রহ্ম বলিবার পরে পলকের মধ্যে মনে হইয়া গিয়াছিল যেতথানায় গিয়াছি। অমনি মৃত্যু হইল। মৃত্যু হইবামাত্র প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইলাম।

এই সমস্ত কথাকে কেহ কেহ বলিবেন কুসংস্কার। কেননা জগতের ভারি কবি সেক্সপীর বলিয়া গিয়াছেন “From whose bourne no traveller ever returns” কবি সেক্সপীরের কথা ঠিক করিয়া না বুঝিয়া প্রেত হ্যাম্লেটের কথাকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না।

সেক্সপীরের দেশবাসী মিল্টন প্রমাণ করিয়াছেন (তাহার কোমন্স গছে) যে ভূত প্রেত পিশাচ আছে—সেথাও যায়, আর প্রেটো প্রভৃতি পবিত্র আত্মাগণ

ইহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। পবিত্রত্বদ্বয় ঘাহারা, তাঁহারা কখন মিথ্যা কথা কহেন না। আবার উপস্থিত সময়ে থিয়োসফি ক্লায়ারভাইট অবস্থায় দেখাইয়া দিতেছেন প্রেত আত্মার সহিত কথা কহা যায়। ইহাতেও ঘাহারা সত্য কথা স্বীকার করিতে চাহেন না, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আমাদের দেশের কোন বিজ্ঞ গ্রন্থকার বলিতেছেন “ভার্যার জ্ঞানগঙ্গাটা বুঝি কোন সাহেবের পবিত্র গোমুখী হইতে নিঃসৃত হইয়াছে”।

বিজ্ঞপ করা আমাদের ব্যবসা মতে। তবে অজ্ঞানের প্রচার একরূপভাবে মূৰ্খ অধিবেকী লোকদ্বারা হইতেছে যে এইরূপ না করিলে অদৃঢ়বিশ্বাসীর সন্দেহ কিছুতেই দূর হয় না। ঘাহারা সং চিন্তা করিতে জানেন, ঘাহারা বাস্তবিক, ব্যাস, বশিষ্ঠ মনু প্রভৃতি মহাজনের বাক্য বিচারপূর্বক গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন, ঘাহারা বেদ, উপনিষদ্, তত্ত্ব পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্রের মৰ্ম্ম অবধারণ করিতে পারেন, ঘাহারা শাস্ত্রের অধিকারী বিচার করিতে পারিতেছেন, ঘাহারা জ্ঞান সাংখ্য পাতঞ্জল বেদান্ত ইত্যাদি দর্শনগুলি যে আত্মজ্ঞান লাভ করিবার ক্রমমাত্র, এক এক অবস্থার এক একটা শাস্ত্র উপযোগী, কাজেই তৎসম্বন্ধে ইহাদের মধ্যে কোন বিরোধ নাই—এক কথায় ঘাহাদের সংবুদ্ধি শাস্ত্রের সামঞ্জস্য দেখিয়া শাস্ত্র বিশ্বাস করিতে পারিয়াছে তাঁহাদের পক্ষে অজ্ঞানীর মত খণ্ডন জন্য সে পরিশ্রম তাহা নিম্প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের মত মন্ববুদ্ধির অল্প অসত্য খণ্ডন করিয়া সত্য গ্রহণ করাই উচিত। নতুবা মনে গোঁজামিলন দিয়া কোন কিছু গ্রহণ করিলে—কালে শত শত সন্দেহ রক্তবীজের মত প্রথমে অগ্রাহ্য এবং অবিচারে পরিত্যক্ত সন্দেহ-বীজ হইতে জন্মগ্রহণ করিবে। তখন মানুষ বিরক্ত হইয়া, যে গলাবাজী করিয়া কোন কথা বলিবে তাহাই গ্রহণ পূর্বক, অজ্ঞানী হইয়াও আপনাকে জ্ঞানী ভাবিয়া অজ্ঞানীর যে তুষ্টি তাহাই লাভ করিয়া শাস্ত্রাদি ব্রাহ্ম বলিয়া হাটে মাঠে প্রচারার্থ ছুটিবে।

হে রমণীয় দর্শন ! বড় হৃদয়ময়ে আমরা অগ্নিরাছি। তুমি ভিন্ন আমাদের বুদ্ধিকে যথার্থ সত্য পথে চালাইতে আর কাহারও সাধ্য নাই। হে প্রভু ! তুমি আমাদের বেসাতি শাস্ত্রবিশ্বাসী করিয়া উদ্ধার কর। বশিষ্ঠ, ব্যাস, মনু শঙ্করাদি মহাজনের বাক্য যেন আমরা যথার্থ ধারণা করিয়া যথার্থ বিচার করিয়া গ্রহণ করিতে পারি। বশিষ্ঠ ব্যাসাদির নাম যেন আমরা পরম শ্রদ্ধার সহিত করিতে পারি।

বলিতেছিলাম যত্নাকালে মনে যে ভাবটি উঠিবে যদি আমাকে তদনুকূল

বোনিত্তে ভ্রমণ করিতে হয়—তবে অভ্যাস পাঁকা না হওয়া পূৰ্ব্বান্ত আমি নিশ্চিত হইব কিরূপে ?

এক এক জন এক এক রকম তুষ্টি লইয়া বলিয়া আছেন। কেহ বলিতেছেন গুরু বলিয়াছেন আমি মুক্ত—আমাকে আর জন্মাইতে হইবে না। ইহাই আমার তুষ্টি। কিন্তু গুরু ঐ কথা বলিয়া আমার করিবার কর্তব্য দিয়াছেন—ঐ কর্তব্য শেষ এই জন্মেই করিতে হইবে। কর্তব্য করিয়া কর্তব্যের পরাবস্থা লাভ করিলে তবে মৃত্যু অতিক্রম করা গেল। কিন্তু গুরু আজ্ঞা শুনিলাম না—আজ্ঞামত কর্তব্য করিলাম না, গুরুর কাছে একবার পা টিপিয়া, পায়েয় ধূলা লইয়া—গুরুকে কিছু বলিতে না দিয়া (পাছে কাজ করিতে বলিয়া কেলেন) আপনিই আগে ভাগে বলিলাম—বাবা আর আমার জন্মাইতে হইবে না। গুরু আর কি বলেন একটু হাসিলেন। শিবা ভাবিলেন—মৌনঃ সন্নতি লক্ষণ। তবে আর কি ! বাবা বলিয়াছেন। ঠিক হইয়া গেল আর জন্মাইতে হইবে না।

ইহারই নাম গুরুর সহিত কপটতা করা। গুরু যে কার্য্য দিয়াছেন, যে মন্ত্র দিয়াছেন, যে ইষ্ট দেবতা দেখাইয়া দিয়াছেন, যে নাম শরাইয়া দিয়াছেন, তাহাই জীবন্ত তিনি। সর্বদা আমার জন্মের রাশিবার বস্ত্র। ঐ নাম যখন এক কণের জন্যও আমার ভুল হইবে না, শরনে, শরণে, আশ্রিতে, ভ্রমণে এক মুহূর্ত্ত জন্য ও যখন শ্রীগুরু ভুল হইবে না, যখন সর্বদা অন্তর্গামীকে লইয়া আমি থাকিব—যখন শতরূপে শত গোলমালের অবস্থার পড়িয়াও আমি আপনাকে আপনি পরীক্ষা করিয়া দেখিব—নাম ভুলি নাই, মন্ত্র ভুলি নাই, কৃষ্ণবিহারীকে ভুলি নাই—পুনঃ পুনঃ দণ্ডে দণ্ডে আত্মপরীক্ষা করিয়া যখন জানিব ঠিক হইয়াছে, তখন সানন্দে দেহকরের জন্য অপেক্ষা করিব। কেননা তখন মন্ত্ররূপী, নামরূপী শ্রীগুরু আমার সর্বদা আশ্রয় দিয়া বলিতেছেন, 'ভয় নাই, আমিই তোমার উদ্ধার করিব'। রামপ্রসাদ ইহা করিয়াছিলেন তাই প্রাণপ্রয়াণ-সময়ে ছরস্ত্র শমনকে নিকটে আসিয়া হাত বাড়াইতে দেখিয়াও ভয় পান নাই। মহিবগলঘণ্টা শুনিয়াও—মহিষাকট্ট বিকটাকার কৃতান্তকে দেখিয়াও বলিতে পারিয়াছিলেন "তিলেক ঠাড়াওরে শমন আমি যখনভরে মাফে ডাকি। তবে তারা নামের কবচমালা বুধা আমি গলায় রাখি।" তাই অন্য সাধক জোর করিয়া বলিয়াছিলেন "শমন তুমি এগনা এখানে, না যদি তা শুনে তবে অপমানের বাকী রবে না"। হরি হরি তুমি কি এই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছ ? পরীক্ষা করিয়া কি দেখিয়াছ—মৃত্যুর

মতন যে নিদ্রা তোমাকে নিত্য আক্রমণ করিতেছে, সেই নিদ্রাকালে তোমার অবস্থা কি হয়, ছি ছি আশ্চর্যতারণা আর করিও না। এস এস একবার আশ্বপরীক্ষা করি এস।

কৈ কি গিরাছে ? কেহ নিন্দা করিলে না হয় চুপ করিয়া থাকিতে পারি—কিন্তু মনের মধ্যে কি কিছু গর গর করে না—একটু প্রশংসা করিলে মনটা কেমন কেমন একটু বেশ লাগে না ? নিজের মতের বিপরীত কথা বলিলে কি কিছু হয় না—যদি তাই হইল তবে “তুল্য নিন্দা স্তুতি মৌনী” যুগেই আওড়ান হইয়াছে—হয় নাই কিছু। কিরূপে হইবে ? সাধনা অভ্যাস হইল কৈ ? শ্রীগুরু বলিয়া দিলেন, ব্রাহ্মমূর্ত্ত্তে উঠিয়াই একবার স্মরণ করিও—ব্রহ্মমেতি মাং মধুমেতি মাং—ইত্যাদি ইত্যাদি—নিব্রাত্ত্ব হইলেই প্রথমে প্রার্থনা করিও, হে প্রভু, হে জগদ্রাধ, হে মঙ্গাধ, হে প্রণতশাল, হে দীন-দয়াল আমি তোমার কাছে বাইতে পারিলাম না—আমি তোমাকে পাইতে পারিলাম না—হে প্রভু, হে দয়াময়, তোমার কাছে বাইবার শক্তি আমার নাই—আমি কি করিব ? তুমিই প্রভু আমাকে প্রাপ্ত হও—তুমিই ব্রহ্ম, তুমিই মধু—তুমিই মধুময় ব্রহ্ম—তুমি আমাকে প্রাপ্ত হও—পতিরেব জায়াং—পতি যেমন জায়াকে প্রাপ্ত হয়, তুমি সেইরূপে আমাকে প্রাপ্ত হও। শ্রীগুরু বলিয়া দিলেন, প্রাতঃকালে এই প্রার্থনা প্রথমেই কর, করিয়া বল, হে প্রাণেশ্বর ! আমি প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, সন্ধ্যা হইতে আবার প্রভাত পর্য্যন্ত যে যে কার্য্য করিব, সেই সেই কর্ণও তৎ তৎ কর্ণ ফল তোমাতেই অর্পণ করিতেছি—আমার সমস্ত কর্ণই তোমার দ্বারা কৃত হইতেছে এই বোধ আমার বেন হয় তবেই আর কোন কর্ণে আমার অহংবোধ থাকিবে না। এস এস নিত্য ইহা স্মরণ করিয়া আল্লাবর্জিত হইরা প্রাতে, মধ্যাহ্নে ; সন্ধ্যার মধ্য রাত্রে নিত্য কর্ণ অভ্যাস কর। বলিতে পার বহুদিন ধরিয়া ত চেষ্টা করিতেছি—অভ্যাস হইল কৈ ? যে দিন সময়ে কার্য্য হয় না, সে দিন মনে হইল কৈ—আজ যে সময় মত কর্ণ করিতে পারিলাম না, কোন্ যুগে তোমার কাছে বাইব ? এখনও যে, যে দিন সন্ধ্যা বাদ থাকে সে দিন বড় হর্ষে বলিয়া ফেল আজ আর সন্ধ্যা নাই। কৈ যে দিন সন্ধ্যা না থাকে সে দিন ত প্রাণ কেমন করে না ? আজ তোমার আজ্ঞা মতই তোমাকে ডাকিতে পাইব না এই বলিয়া ক্লেশবোধ হইল কৈ ? তোমাকে ডাকাই আনন্দ—তোমাকে বিধি পূরক না ডাকাই ক্লেশ। কৈ ইহা হইল ? বত দিন ইহা না হইতেছে ততদিন

কোন অভ্যাস পাকা হইল না বৃষ্টিও । এক দণ্ড ও তোমার ছাড়িয়া থাকাই আমার মৃত্যু, ইহা যতক্ষণ না বোধ হইবে ততদিন ধারণাভাগ্যসী বা মুক্তিমান কিছুই হওয়া গেল না ।

এখন এস একবার বিচার কর—এখনও কেন বলিতে হয় “কতু হয় কতু হয় না”—বাহাতে ইহা আর না বলিতে হয়—বাহাতে অভ্যাস ঠিক হইয়া যায়—কিঙ্গণ প্রতিকার করিলে আনন্দে ছুটিয়া তোমার কর্ম করিতে ইচ্ছা করে, তাই একবার আলোচনা করি এস ।

বাগল হও বা ছাত্র হও, সধবা হও বা বিধবা হও, ব্রাহ্মণ হও বা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূত্র হও, গৃহী হও বা সন্ন্যাসী হও—তুমি যাহাই কর কেন না—যে কার্য্যেই না কেন বাস্তব থাক—সর্বদা ভগবানকে ডাকা বা ভগবান লইয়া থাকা তোমার অভ্যাস করিতে হইবে—নিত্যন্ত স্থল সাংসারিক কার্য্যের প্রতিবিরাম কালে তোমায় সর্বদা করিবার কর্মটিতে কিরিয়া আসিতে হইবে । বত দিন না সর্বদা করিবার কর্মটি তোমার আরম্ভ হইয়া যায় ততদিন তুমি কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছ না বৃষ্টিও । সর্বদা করিবার কর্মটি পাকা অভ্যাস না হওয়া পর্য্যন্ত যদি মনে কর আমাকে আর অগ্ন্যাইতে হইবে না, তবে তুমি ভারি প্রভারণার পড়িয়া রহিয়াছ মনে করিও । এই সর্বদা করিবার কর্মটি অধিকারভেদে কাহার পক্ষে জপ, কাহারও পক্ষে ধ্যান, কাহারও পক্ষে আত্মবিচার, কাহার ও পক্ষে সমাধি ।

এই জপ, ধ্যান, আত্মবিচারই আবার প্রাতে মধ্যাহ্নে সন্ধ্যায় ও মধ্য রাত্রেয় নিত্যক্রিয়া । ঐ চারিটি নির্দ্ধারিত সময়ে ত বিধিপূৰ্ণক সন্ধ্যা আত্মিক ক্রিয়াদি করিবেই তত্ত্বির সকল সময়ে নাম জপাধি করিতে হইবে ।

এত দিন করিতেছ তবুও যে হয় না তাহার কারণ আছে । ঐ যে ভাবিয়া রাখিয়াছ এত জপ করিলেই আমার পাওয়া হইবে—এত জপ ত করিলাম আজও ত কিছুই হইল না, কোন আনন্দ ত পাইলাম না—কাল কিত এই জপ করিয়াই ত বেশ আনন্দ পাইয়াছিলাম, এই ফলাকাঙ্ক্ষার লক্ষ্য থাকে বলিয়া তোমার কতু হয়, কতু হয় না । আনন্দ পাও বলিয়া জপ করিতে যাও—আনন্দ পাওনা বলিয়া করিতে ইচ্ছা করে না এ ভাব বতদিন থাকিবে ততদিন তোমার কিছুই হয় নাই । এ ভাবে বাইও না ।

প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যায়, মধ্য রাত্রে যে তোমার ডাকিতে বাই তাহা কোন প্রাণ্ডির আশায় নহে, কেবল তোমার আজ্ঞা বলিয়া—তুমি করিতে

বলিরাছ বলিরা হাই। আমি যে অপ করিরাই তোমার পাইব ইহা জ্ঞান মাত্র। অপ কেমন করিরা করিলে হয়, ক্রিয়া কিরূপ করিলে ঠিক ঠিক হয়, কেমন করিরা সফা। করিলে সফা হয় তাহা তুমি বলিরা দিরাছ কিন্তু তথাপি আমার হইতেছে না। আমার শক্তিতে ইহা ঠিক মত হইবে না। তোমার আত্মা বলিরা আমি করি, হে প্রভু! আমি তোমার আত্মা পালনে প্রাণপণ করিব, যেমন করিরা করিলে হয়, তুমি করিরা দিও। এই প্রাণে সনয় মত ক্রিয়া করিলে দয়াময় দয়া করিবেনই। নিশ্চয় করিবেন ইহা তিনিই বলিরাছেন।

মরণ-সঙ্গিনী ।

এস এস জীবনে ত সঙ্গিনী চাইলে না—একবার মরণ-সঙ্গিনী হইবে আইস। আমি দিনে দিনে মরণ অভ্যাস করিব—তুমি তাহাই দেখিবে আইস—অধিক আর কিছুই বলিতেছি না।

আজ কত নয়নারী আছেন বাহার। এই কথা বড় আদর করিরা বলিতে রাঙ্গি। তবে বলার মধ্যে ভাবের তফাত আছে।

বাহার দৃষ্টি পৃথিবীলোক, অন্তরীক্ষলোক, স্বর্গলোক, ছাড়াইরা গিরাছে স্বর্গ লোকের উপরেও যে লোক, যে লোক শুধু এক মহাশূন্য—তাহার উপরেও যে লোক, যে লোকে সব মরিরা যাইবার পরে আবার সব সৃজন হয়,— তাহার উপরেও যে লোক, যে লোক অতি শাস্ত, অতি নির্জজন, অতি মনোরম বলিরা নিত্য তপস্বীদিগের তপস্যার স্থান—তাহার উপরেও যে লোক—যেখানে কোন ক্লেশ নাই, যেখানে সবাই আনন্দভূক্ত—তাহার সর্বোচ্চস্থান যেটি—সেখানে যাহা আছে তাহাই আনন্দ—এই সর্বোচ্চ সত্য লোকে বাহার দৃষ্টি তিনি যখন ডাকেন ‘মরণসঙ্গী বা মরণসঙ্গিনী হইবে আইস তাহার ভাব এক প্রকার কিন্তু বাহার দৃষ্টি “ভাগাড়ে” তাহার মরণসঙ্গী বা মরণসঙ্গিনীকে ডাকা আর এক প্রকারের। আর ভাগাড় হইতেও যে সত্য লোকে যাইবার আশা রাখে তাহারও ভাব অন্য প্রকারের। সবই ভাবের তফাত—যে যেমন।

আমার কোন ভাবের ডাকা, তাহা তুমিই জান। যাহা দেখি তাহাই

তাহার শক্তি। তুমি তাহার বরণীয় শক্তি। তুমি সর্বত্র থাকিয়াও অবিভা-
পণগামিনী—সহস্রবাদিনী—অন্য কাহাকেও জানাইতে চাই না। এস এস
আমি ডাকিতেছি, একবার মরণসঙ্গিনী হইবে আইস।

আগেই মরণের কথা—তার পরে সঙ্গী বা সঙ্গিনীর কথা।

মরণের কথা।

ব্রাহ্মণের মরণ তপস্যার আশ্রয়বিচারে, ক্ষত্রিয় বৈশ্যের মরণ যুদ্ধে—বা
বুদ্ধ অবসান কালে “যোগেনান্তে তত্‌তাজ্জাম্”, শূদ্রের মরণ সেবায়—এই
মরণের সাধারণ বিধি।

জীবনে আমার অমঙ্গল হইয়া গেল—জীবনে তোমার লইয়া দয় কদা
হইল না। মরণই আমার মঙ্গল। এস এস মরণ অভ্যাস দেখিবে আইস।
না মরিলে তুমি আমার হইবে না, এত দিনে জানিয়াছি।

তুমি আসিলে না—তুমি আসিবেও না জানিয়াছি। প্রবৃত্তিমাধা মনের
মরণই মরণ। প্রবৃত্তি লইয়া মরণ—সে কেবল পুনঃ পুনঃ প্রবৃত্তি করার
অন্য—পুনঃ পুনঃ জননের অন্য। সে মরণে বা জীবনে তোমায় পাওয়া
বাইবে না। আমার মরণই মঙ্গল—এস এস আমার মরণ অভ্যাস দেখিবে
আইস। আমার মরণ তোমার সঙ্গে অনন্ত জীবনের অন্য।

কেমন করিয়া মরিব? সেত তুমিই শিখাইয়াছ। ব্রাহ্মস-গৃহে নিরন্তর
পীড়ন মধ্যে থাকিয়া জনকনন্দিনী বলিয়াছিলেন “ইদানীমেব মরণং কেনো-
পারেণ যে ভবেৎ” এখনই মরণ আমার কি উপায়ে হয়? মরণে কৃতনিশ্চয়া
বা আমার বৃদ্ধ-শাখা অবলম্বন করিয়া—মরিবার উপায় না পাইয়া বড়
হুঃখে বিমূৰ্চ্চকণ্ঠে কাঁদিয়াছিলেন। সহসা পৃষ্ঠোপরি লবিত বেণী ছলিয়া
উঠিল। বিসেহতনয়া লবিত বেণী হস্তে ধরিলেন—আবার কাঁদিতে লাগিলেন,
কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন :—

উষকনেন বা মোক্ষে শরীরং রাখবং বিনা।

জীবিতেন কলং কিং স্যাগ্নম ব্রহ্মোহধিমধ্যতঃ ॥

রাম নাই—এই শরীর আছে? উষকনেই কি এই শরীর ছাড়িব? ব্রাহ্মস
ব্রাহ্মসী মধ্যে এই জীবন রাখিয়া আমার কল কি? সত্যই—আমার এই
দীর্ঘা বেণী? ‘দীর্ঘা বেণী মমাতার্থ মুবদ্ধা তবিব্যতি’।

জানকী উপায় পাইলেন। আমার এই দীর্ঘা বেণী? ভগবান আমার
দীর্ঘ কেশপাশ দিয়াছেন। হউক ঠাহার আদরের কেশপাশ। যে আদর

করিবে সেই যদি আসিল না—সেই বখন রাক্ষসপীড়ন হইতে মুক্ত করে না তবে ইহাই আমার মৃত্যুর কারণ হউক। রামরানী তখন বেশী গলায় জড়াইলেন, জড়াইয়া বৃক্ষ শাখায় তুলিলেন। আবার অশ্রুজলে গণ্ড প্রাবিত হইল। এই দেখ—তাহার আদরের বস্ত্র অবহেলা করিতে হইবে? কিন্তু আর উপায় ত নাই। না মরিতে যাইতেছেন—সহসা শ্রীভগবানের দূত ভগবানের দ্বারা জানাইল। মার আর মরা হইল না।

এ মরণ এক রকমের। এ মরণ হয় না সংবাদ পাইলে। তার আসাই জীবন, অনন্ত জীবন। দূত ও আসিল না তবে আমার মরণই নিশ্চয়।

তুমি আসিবে না—এ কথাও ত বলিতে যাতনা পাই। তুমি আসিবে কিন্তু কবে? কত আর দেৱী করিব? কবে আসিবে—তাও ত ভাল করিয়া বলিলে না? তবে আর দেৱী করিব কেন? আর যে পারি না।

বড় অন্ধকার। নিরন্তর অন্ধকারে প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে। তোমাকে দেখিতে পাইনা—তুমি কি করিতেছ জানিতে পারি না।—নিরবচ্ছিন্ন অন্ধ-কারে বড় ভয় পাই। কি সব রাক্ষস রাক্ষসী—বিকটাকার দেখি—আর ত থাকিতে পারি না। তাই ডাকি, এস এস মরণ অভয়াস দেখিবে এস। তুমিই আমার নিত্যসঙ্গিনী। তোমাকে না দেখা—তোমার সংবাদ না পাওয়া, তোমার বদলে ভূত প্রেত দেখা—সতত বিভীষিকা পাওয়া—ইহা অপেক্ষা আর যাতনা আমার কি হইতে পারে? এস এস মরণে অগ্রসর করিয়া নাও।

আমার ক্লেণ কি শুনিবে? রাক্ষসের উৎপাত। একা থাকিলেও হৃদ-দেহে মন্দেহা রাক্ষসের আলা। বাহিরে আসিলে ত কথাই নাই। স্থল দেহেই সমস্ত দেখিতে পাই। বিশ্বামিত্র যজ্ঞে আহতি দিতে গেলেই মারিচ সুবাহু রুধির দিয়া যজ্ঞ নিবাইয়া দিয়া অন্ধকার করিয়া উৎপাত করে। এ উৎপাত আর সহ্য করিতে পারি না।

প্রকৃতির উৎপাত আর কত সহিব? তোমার ছাড়িয়া “দৃশ্য-দর্শন” ইহাও যাতনা—নির্জনে হৃদ শরীরে প্রকৃতির পুরাতন দৃশ্য-দর্শন ইহাও যাতনা। আমি এই যাতনা এড়াইতে চাই। দেখা শুনা—কি স্থলে কি স্থানে সকলই যে প্রকৃতি। সকলই যে প্রকৃতি—সকলই যে মায়া। তোমার পাইনা, তোমার মায়ায় প্রাণান্ত হয়।

আরম্ভের পর্যায়ে দৃশ্যে প্রবর্তে চ ৩২

সৈব প্রকৃতিরিত্যুক্তং সৈব মায়েতি কীর্তিতা।

এই রাক্ষসী সর্বদা খেত কৃষ্ণ লোহিতাদি প্রজা সৃজন করিতেছে । সর্বদাই গর্ভ হইতে নাড়ী-কধির-জড়িত পুত্র কন্যা জন্মিতেছে । ইহারাই বড় হইয়া বড় ছরস্ব হইতেছে—সর্বদা মোহ জন্মাইতেছে ।

কাম ক্রোধাদি পুত্রাদ্যাঃ হিংসা তৃষ্ণাদি কন্যাকাঃ ।

মোহরত্যানিধং • • • • •

কামক্রোধাদি পুত্র, হিংসা তৃষ্ণাদি কন্যা—বড়ই যে মোহ জন্মাইতেছে । এই রাক্ষসী সংসার-সাগরে পতিপুত্রধনাদিতে সর্বদাই যে ভ্রমণ করিতে বলে—আমি “গতাগতেন প্রাত্তোন্নি দীর্ঘ-সংসার-বন্ধু” —আর গতাগতি করিতে পারি না—আমিও বলিতে চাই

সংসার-সাগরে মগ্না পতিপুত্রধনাদিষু

ভ্রমামি ষায়য়া তেদ্য পাদমূলমুণাগতা ॥

আর ভ্রমণ করিতে পারি না—তোমার পাদমূলে পতিত থাকিতে চাই । তাই পুনঃ পুনঃ বলি পাদমূলে থাকা কি জানি । জানি বলিয়াই আর অন্য স্থানে থাকিতে পারি না । তবুও যে থাকি বড় বাতনার ।

কি করিবে তাও ত কিছু বল না । যদি কাছেই না থাকিতে পাইলাম—তবে কি করিয়া থাকিব বল ? তাও পারিতাম যদি তোমার পরিচিত লোকের কাছেও রাখিতে ? বাহাদের কাছে সর্বদা তোমার কথা শুনিতে পাই, তাহাদের সঙ্গে যদি থাকিতে দিতে ! তাহাও হয় না । কর্শ-দোষ আমার আছে সত্য । কিন্তু তুমি আসিলেও কি কর্শ-দোষ থাকিবে ? আসিয়াই দেখ, কর্শ-দোষ থাকে কি না ?

যদি আসিতে তোমার নিতান্ত ক্লেশ হয় তবে না হয় এই হটক যে—

ঋতুভেদে সধা সঙ্গো ভূরায়ে প্রাকৃতেষু ন ।

জিহ্বা মে রামরামেতি তক্ত্যা বনতু সর্বদা ।

মানসং শ্যামলং রূপং সীতালবঙ্গসংযুক্তম্ ।

ধনুর্কাণধরং পীতবাসসং মুকুটোজ্জ্বলম্ ॥

অঙ্গদৈঃ নৃপুটৈঃ সূক্তাহারৈঃ কোত্তরকুণ্ডলৈঃ ।

শাস্তং শ্রবতু মে রাম বরং নান্যং বৃণে প্রভো ॥

তোমার না পাই তোমার ভক্তের সঙ্গ হটক । তাহাদের নিকট তোমার কথা শুনিবার অধিকার দাও । প্রাকৃত জনের সঙ্গ কত করিব ? রসনা সর্বদা গদগদ ভাবে রাম রাম করুক—প্রাকৃত কথা কত বলিব আর কতই

বা গুনিব ? ভক্ত জনের সাধের মত সাধ কি আমার হইতে নাই ? আমার কি ইচ্ছা করে না—নবীন অলঙ্কার অঙ্গে তড়িততা খেলা করুক—স্বন্দর চরণ যুগল নৃশুর ধ্বনিতে শিক্ত হইক—কৌতুহল কুণ্ডলে, অঙ্গন মুক্তাহারে কেমন দেখায় দেখি, আর রত্নসিংহাসনস্থ নরনে নরন আবদ্ধ মূর্তিতে উজ্জ্বল মুকুট কেমন দেখায় একবার দেখি।—এ সব যদি অসম্ভব হয়—যদি আমার কাছে তুমি আসিতেই না চাও তবে বল—আমার মরণই মঙ্গল কিনা ?

মরণেই মঙ্গল কেন—আর মরণ অভ্যাস কি করিয়া করিতে হইবে ইহা তোমাকে বলিব ।

মন ত চিন্তা কিছুতেই ছাড়ে না । কোন প্রয়োজন নাই তথাপি যেন সর্বদাই ব্যস্ত । কখন বাহিরের হাহা হহ হিহি লইয়া ব্যস্ত কখন বা তিতরে লর বিক্ষেপরূপ তম ও রম্য লইয়া ব্যস্ত । কিরূপে ইহা দূর হইবে ? যে মনকে সাধনার বসাইয়া প্রতি বিক্ষেপে বলিতে অভ্যাস করে ‘মরিবই নিশ্চয়’ তবে আর অন্য চিন্তা কি করিবে ? তার বেশ ফল লাভ হয় । কিন্তু ইহাই কর জনের হয় । তারপর দেখি মাহুকের মৃত্যুকাল যখন আইসে তখন আর বাহিরের লংসারের কথা, বিবরণসম্পত্তির কথা কহিতে চায় না । আত্মীয় স্বজন কেহ নিকটে গেলেও বিরক্ত হয় । কোন কথা কহিতে গেলে বেজার বোধ করে । তবেই ত বুঝি মৃত্যুই মাহুকের প্রবৃত্তি ছাড়াইয়া দেয় । ঘোর সংসারী ও মৃত্যুর কিছু পূর্বে টাকা দেখিতে পারে না—টাকার কথাও তৃপ্তি পায় না ।

মৃত্যুই যদি প্রবৃত্তি ছাড়াইতে সক্ষম হয় তখন মরণ অভ্যাসে মনের ক্রিপ্ত বিক্রিপ্ত চিন্তা দূর করা যাইবে—মনের আলস্য অনিচ্ছারূপ মূঢ় তাব ত্যাগ হইবে ।

হার ! তোমার পাইলে ত অন্য চিন্তা থাকে না, তোমার কাছে ত আমার আলস্য অনিচ্ছা থাকে না । তুমি থাকিলে আমার আহার নিদ্রারও আবশ্যক হয় না । ইহা ত আমি দেখিয়াছি । তুমি যদি আসিতে তবে ত বড় সুখের সহিত আমার প্রবৃত্তি দমিত হইয়া বাইত—বড় সুখে শমদম অভ্যাস হইয়া বাইত । তুমিত আসিলে না—তোমার লইয়া ঘর করা করিতে ত পাইলাম না । ” তাই তোমার নাম ও তোমার কর্ণকে তোমার স্থানে বসাইয়া মরণ অভ্যাস করিব । তুমি এস একবার মরণ-সঙ্গিনী হও ।

এখন কি করিয়া মরণ অভ্যাস করিতে চাই সেই কথা বাকী ।

কুকুর শৃগালের মত মরিতে ইচ্ছা নাই । বিব খাইয়া বা জলে ডুবিয়া

মরিতে চাই না। তুমি বাহা শিখাইয়াছ—মরিতেই বাকী আছে—ইহা ভাবিতে ভাবিতে সাধিব। সাধিতে সাধিতে যদি তোমার দয়া হইয়া যায় তবে এই জীবনেই তোমার সঙ্গিনী পাইয়া আমার প্রবৃত্তি মরিয়া বাইবে। বল বল আসিবে কি ? যদি না এস তবে তোমার কথা সাধিয়া মরিতেছি বলিয়া দেখ অন্তে যেন তোমার সহিত চির মিলন হয়।

মরার সময় যে ক্রেশগুলি হইবে সেই ক্রেশ জীবনে অভ্যাস করিতে বলিয়াছ।

মৃত্যুসময়ে ক্রেশ কি ? অহো ! তাহা স্নান শরীরে মরণ করিলেও ব্যাকুল হই।

আসন করিয়া বহুক্ষণ বসিতে পারি না—কেন ? ক্রেশ হয় বলিয়া। কিন্তু মৃত্যুকালে কত দীর্ঘকাল ধরিয়া যে দেহকে এক অবস্থায় রাখিতে হইবে ? হাত পা বড় অবশ হইয়া পড়িয়া থাকিবে—নাড়িবার ইচ্ছা হইলে নাড়িতে পারিব না। এই মরণে যতই ক্রেশ হউক না কেন দেহকে আসনে বসাইয়া রাখিতে অভ্যাস করিতে হইবে। কষ্ট হইলে বলিতে হইবে—যে মরিবে তাহার আবার দেহকে একভাবে বসাইয়া রাখিবার ক্রেশ গণ্য করিলে চলিবে কেন ?

মৃত্যুতে শ্বাসরোধ হইবে। তবে জীবিত কালে শ্বাস রোধে-কুন্তকে ক্রেশ না করিলে চলিবে কেন ? শটন শটন কুন্তক বাড়াইতে হইবে।

মৃত্যুতে আরও কত ঘটনা। এখন উদর একটু শ্লীত হইলে শ্বাস টানিতে ফেলিতে কত ক্রেশ হয় আর তখন ? তখন যে উদর বড়ই শ্লীত হইবে, তখন কি করিব ? এখন বক্ষে কক্ষ জমিলে তাহা নিঃসারণ না করা পর্য্যন্ত বড় ক্রেশ হয়। আর তখন ? কত রেগা জমিবে—তখন কি করিব ? এখন একটু নিদ্রা কমান্বিত্তে ক্রেশ বোধ করি, আর তখন দিনের পর দিন যাইবে, রাত্রির পর রাত্রি যাইবে—কত ছটফট করিতে হইবে—নিদ্রা ত আসিবে না। তখন কি করিব ? এখন হইতে নিদ্রা কমান্বিত্তা সাধনা করিতে হইবে। এখন এক দিন একটু আহার কম হইলে ভাবি শরীর খারাপ হইবে। আর তখন ? এক দিন উপবাসে ক্রেশ পাই আর তখন যে উপবাসের উপর উপবাস চলিবে—খাইতেই রুচি থাকিবে না—তখন ? সকল অভ্যাস বদলাইয়া সাধনা করিতে হইবে। আহার নিদ্রা ভয়—সমস্তই অগ্রাহ্য করিতে হইবে।

যে সাধনা করিয়া মরিতে চায়—যে সাধনার বসিয়া আগে তাবে—মরিতেই ত আসিয়াছি—সে আবার আলস্য অনিচ্ছা করিবে কি ? আলস্য অনিচ্ছা করিয়া পড়িয়া থাকি—এত একটু আরাম লাভ অন্ত ? যে মরিবে তাহার আবার

‘আমি কি ? সে নিদ্রা না আসিলেও শব্দ আর যাইবা নিদ্রাকে ডাকিবে কি ? সে আবার শব্দা ভাগে আসিয়া করিবে কি ? সে আবার ব্রাহ্ম মুহূর্তের কার্য রোদ্র মুহূর্তে করিব বলিয়া কেলিয়া রাখিবে কি ? সে উদর তার হইবে জানিয়াও—আহার অনাবশ্যক বুঝিয়াও—শরীর ধারণ হইবার ভয়ে আহার করিবে কি ? সে কোন্ ভয়ে—বা কোন্ ক্রোধ ভাবিয়া শরীরকে এক আসনে বসাইয়া রাখিতে চায় না—দীর্ঘকাল বায়ু ধরিয়া রাখা অভ্যাস করে না ?

মরণসন্ধিনি ! না মরিলে তুমি আমার হইবে না—তাই প্রতিজ্ঞা করিলাম, ‘মরিব’ । তোমার ডাকিতে ডাকিতে মরিব—

স্বাঃ প্রাতঃ শুভজলে কৃষা সন্ধ্যাদিকাঃ জিহ্বাঃ

তত একান্তমাত্রিতা সুখাসনপরিগ্রহঃ ॥

বিসৃজ্য সর্বতঃ সঙ্গমিতরান্ বিবরান্ বহিঃ ।

বহিঃ প্রবৃত্তক্ষিপণং শনৈঃ সম্যক্ প্রবাহয় ॥

প্রাতে নান করিয়া বা আর্দ্রবস্ত্রে শরীর পরিষ্কার করিয়া প্রথমেই নিত্য অনিত্য বিচার করিয়া—সন্ধ্যাদি জিহ্বা অনলসে সম্পন্ন করিতে হইবে । পরে একান্তে সুখাসনে উপবেশন করিয়া—সকল সঙ্গত্যাগ করিয়া চক্ষু কর্ণাদির বাহিরে আগমন ব্যাপার রোধ করিয়া আত্মায় প্রবাহিত করিতে হইবে । কর্ণ খালের সহিত নাম জপ এত শুনিবে যে যেন আর বাহিরের কিছুই শুনিতে না পায়—চক্ষু ভ্রমধ্যে জ্যোতি-জড়িত মূর্তি এতই ধ্যান করিবে যেন বাহিরে চাহিলে আর কোন কিছুই না দেখে—প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণা দ্বারা ইন্দ্রিয়ের সহিত মনকে আত্মায় প্রবাহিত করিয়া মনের জিহ্বা প্রবৃত্তিকে মারিয়া কেলিতে হইবে । পরে মনকে স্থির করিয়া “প্রকৃতভিত্তিমাত্মানং বিচারয় সদা নমঃ” মনের চিন্তারহিত অবস্থার ঘাহাকে পাওয়া গেল—তাঁহার সহিত ভিতরের বাহিরের কোন বস্তুর সহিতই সঙ্গ হয় না—এই নিশ্চয় করিতে হইবে । কখন বা শাস্ত হইয়া ‘আমি কে’ ‘কে আমি’ ? পুনঃ পুনঃ এই প্রশ্ন করিয়া করিয়া কুন্তকে থাকিতে হইবে । আর যদি এই অবস্থা—এই নিরোধভাব অধিকক্ষণ না রাখিতে পারা যায়, তবে রক্তসিংহাসনস্থ নয়নে নয়ন আবদ্ধ সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী সরসিদ্ধাসনসন্নিবিষ্ট কেয়ুরবান্ কণককুণ্ডলবান্ কিরীটধারী—হিরণ্যহাতি—বিদ্যুৎ-জড়িত নবজ্বলন্তমলম্বনশূন্য মূর্তির ধ্যান অভ্যাস করিতে হইবে ।

এই কার্য করিতে করিতে মরণ অভ্যাস করিতে চাই । জপ ধ্যান আত্ম-

বিচার—একটিতে শ্রান্ত হইলে অঙ্কটি, অঙ্কটিতে শ্রান্ত হইলে অপবুটি—ইহা
 • সাধিতে সাধিতে মরিব ।

তাই বলি “মরিব” নিশ্চয় করিয়াই ডাকিতে বলিব । “মরিব” স্থির করিয়া ডাকিতে বলিলাম—ছিছি একটু শরীরের ক্লেশ হইতেছে বলিয়া কি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিব—করিয়া শরীরের বিলাসিতা রক্ষা করিতে ছুটিব ? যে মরিবে তার আবার শারীরিক ক্লেশকে ভয় কেন ? যে মরিবে তার আবার আলস্য অনিচ্ছার বিলাসিতা কেন ? যে মরিবে তার আবার নিদ্রা না আসিলেও শয্যায় পড়িয়া পড়িয়া নিদ্রাকে ডাকা কেন ? যে মরিবে সে কি আবার “কতু হয়” “কতু হয় না” ইহাতে হর্ষ-বিবাদ গ্রাহ্য করিবে ? ভাল হউক মন্দ হউক সে আবার ইহা দেখিবে কি ? সে সমান ভাবে ডাকিয়াই যাইবে—স্থখে দুঃখে ঘাতে পারে, যেমন করিয়া পারে সে ডাকিয়াই যাইবে । যাহাকে চাই সেই বলিয়াছে বলিয়া ডাকি ।

যতদিন না পাওয়া যায় ততদিন মরাতে ক্লেশ থাকিবেই সাধনাতে ক্লেশ হইবেই । আর যে পাইয়াছে তাহার মরাতে বড় সুখ । কিন্তু তুমি কি পাইয়াছ যে বলিতেছ মরার আবার দুঃখ কি ? মৃত্যুতে যে প্রাণ উৎক্রামণ হয় । কানী-প্রান্তবিকারিণী সোপানাবলী ভাঙ্গিয়া আইস প্রাণ উৎক্রামণে কত ক্লেশ বুঝিবে ? ছিছি ভাল করিয়া একবার পরীক্ষা কর, আত্মপ্রত্যক্ষণ ত করিতেছ না ?

সাধনার দুঃখ আছে সত্য—কিন্তু সব দুঃখ অগ্রাহ্য হইয়া যার তাহাকে নিশ্চয়ই পাইব বলিয়া । তাহার কথা মত চলিতেছি—তোমার কথা মত কাজ করিয়া মরিব, পাইব না কেন ? তোমার কথা ত কখন মিথ্যা নহে ।

তবে এস মরণসঙ্গিনী ! আমি বড় কষ্ট পাই । প্রবৃত্তির আলার আমি বড় জলি । তুমি একবার আসিরা দাঁড়াও—আমি একবার তোমার ভাল করিয়া দেখি—দেখিরা দেখিরা মরি । কৈ আমি তোমার দেখিলাম ? তোমার ভাল করিয়া যে আমার দেখা হয় নাই ? তোমার ভাল করিয়া না দেখিতে দেখিতেই তুমি চলিয়া গিয়াছ । গিয়াছ সে আমারই অপরাধে । তুমি নিবৃত্তি-মহারানী । আমি প্রবৃত্তি-রাণীর বশ বলিয়া তুমি গুরে গিয়াছ । এস এস আর আমার প্রবৃত্তির বশ হইবার ইচ্ছা নাই । আমি পারি না, তুমি আসিরা আমার মুক্ত কর । তোমার আশ্রমে আমার মরণ সাধনা অত্যন্ত হউক । এস এস একবার আমার মরণ দেখিবে এস । আর যাহারা জীবন্তে মরিতে চাও—নারী হও, পুরুষ হও, সবাই আমার সহায় । প্রাকৃত সঙ্গ আর যেন না হয় ।

অগ্রহারণও পৌবে—আবার মরণ-চিন্তা । কি জানি এই ছই মাসে কোন প্রাণ-প্রমাণ-ব্যাপার যেন হিরায় মিশিরা আছে ?

মরণের কথা শেষ হইল এখন সঙ্গিনীর কথা ।

সঙ্গিনীর কথা ।

“সঙ্গিনী” চাই “সঙ্গী” নহে এ গুনিয়া লোকেত বিক্রপ করে ? কক্কক বিক্রপ—যে মরিতে চায় তার বিক্রপের রেশ কি গ্রাহ্যের বস্তু ? মরণ রেশ যে সহিতে রাজি, তার আর উপহাস-জনিত রেশে কি হইবে ?

ভবুও ত লোকনিন্দা । সতাই—লোকনিন্দা বড় ভাল বস্তু । তথাপি “লৌকিকাতারঃ মনসাপি ন লভ্যয়েৎ” বড় ভাল কথা ইহা । লোক অপবাদ যে মানেনা সে ব্যভিচারী । আমি কি ব্যভিচারী ?

কামিনী কাকন তাগ চাই ? মাও কি কামিনী ? সহধর্মিণী ও কি কামিনী ? আমি কিন্তু সঙ্গিনীই চাই ।

ব্রহ্ম হওয়া কি আমি ধারণা করিতে পারি না । আমার ব্রহ্ম সর্বশক্তিমান । শক্তিহীন ঈশ্বরে আমার হইবে না । নবীন জলধর আমার কাছে অন্ধকারেই ঢাকা থাকে যদি বিদ্যাংকুশিনী মা আমার তাঁর সঙ্গে বাওয়া আলা না করেন । “তমসস্ত পরং ভোতি ” মা আমার বরণীয় ভর্গ । অন্ধ-কারে ঢাকা কাল মেঘকে বিদ্যাং ভিন্ন প্রকাশ করিবার কেহ নাই । কাল তড়িলতা ভিন্ন আমার হয় না । স্বাম-জলধরে সীতা কানকী-লতা ভিন্ন আমি দেখিতে পারি না । শিব সঙ্গে শিবরাণী—মহাকালে মহাকালী, আমি নারায়ণে মহালক্ষ্মী, ত্রীকূক্ষে ত্রীরাধা, চতুর্ভুজে মহাসরস্বতী—বশিষ্ঠে অরুন্ধতী, শিখিধ্বজে চূড়ামা—ইহা দেখিয়া মনে ধারণা করিয়া কেশিয়াছি—আমার মহাশক্তিই আমার জীবন সঙ্গিনী । শক্তিকেই দেখিতে চাই—শক্তি ভিন্ন আমার জীবনের শিবদর্শন হইবে না ।

তুমি উপহাস করিলে কি করিব ? “নিজশক্তিযুগ্মাং পশ্য মহেশ ইব নৃত্যসি” এ ভিন্ন ব্রহ্মানন্দ আমার ধারণার আইসে না । অঈশ্বর হইয়া বার—যৈত পর্যন্ত সাধনা । যখন আসিবে আশ্রক—কিন্তু যদি চাহিবার কিছু থাকে তবে এই “বামাদে দধতঃ” এই সীতারাম হরণার্কতী, রাধাকৃষ্ণ, ব্রহ্ম, সরস্বতী । যদি আকাঙ্ক্ষার কিছু থাকে তবে এই শক্তি-অভিত শক্তিমান । শক্তিই দেখা দিয়া থাকেন । শক্তি লইয়াই ছিলাম, শক্তি লইয়াই থাকিতে

চাই—তবে এত দিন ছিলাম প্রকৃতি-রাণীর সঙ্গে, এখন থাকিতে চাই নিরুত্তি-মহারাণীকে লইয়া। বরণীর ভগ্নই তিনি—আদিভা-পথ-গামিনী তিনিই। তিনি ভিন্ন পথ দেখাইতে কেহ নাই—তিনি ভিন্ন প্রচোদনাই নাই। ‘বহু বেদা বিজ্ঞানস্তি মনো যত্রাপি কুণ্ঠিতম্ ন যত্র বাক্ প্রভবতি’—মা আমার তাঁহারই শক্তি—সকলই তাঁহার শক্তি—প্রকাশককে প্রকাশ করিতে যদি কেহ পারেন তবে তিনি—সেই দেবতার বরণীর ভগ্ন। শক্তি ভিন্ন উপাসনা নাই।

শক্তিদর্শন।

রোগ হইতে উঠিলেই একটা ক্ষুধা হয়। সেই ক্ষুধা সামলাইতে না পারিলে আবার রোগ হয়। বহু ভাগ্যে তব-রোগ ক্ষণিক শান্ত হইলে পরমেশ্বর-ক্ষুধা পায়। সে সময়ে মাতা বেশী চড়াইলে অনিষ্ট হয়। সেই জন্য অনেক বার ধরিয়া বসি ভাল কিন্তু রাতারাতি বড় মাল্ভ হইতে বাওয়া কিছু নয়। ধীরে ধীরে শনৈঃ শনৈঃ অভ্যাস করিতে হয়। অল্পে অল্পে ব্রাহ্ম সুহৃৎ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন, মধ্যাহ্নের সময়টা আরম্ভ করিতে হয়। অগ্রে সময়ে বসি অভ্যাস করিতে হয়। হটক না হটক—কোন দিকে দৃষ্টি না করিয়া ভায়ে ভালবাসিয়া বহু সময়ে তাহার সমীপে বসিতে হইবে। সমীপে বসাই উপাসনা। এ সমস্ত বড় ধীরের কার্য। হট করিলে কিছুতেই হয় না।

ভালবাসিতে না জানিলে কাহার আজ্ঞা পালন জন্য দোড়িয়া যাইব ? বাহার ক্ষমতা ভালবাসা নাই তার আবার সন্ধ্যা পূজা কি ? যে কখন নীল আকাশে তারা হুটিতে দেখিয়া দাঁড়াইয়া না থাকে, যে কখন সূর্য্যচন্দ্রোদয় কালে অবাক হইয়া না দেখে, যে কখন বৃক্ষলতা পর্কিত আকাশ দেখিয়া দেখিয়া কাহাকেও না দেখে, যে কখন মাল্ভ, গুণ্ড, পক্ষী দেখিয়া কাহাকেও দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ না করে তার আবার ধর্ম কর্তৃ কি ? যে কখন তাহার জন্য তীর্থে যায় না, গঙ্গা স্নান করে না তার আবার তীর্থই বা কি আর গঙ্গাই বা কি ?

এই জগতের যে অর্থ আছে সে কেবল এক জনের জন্য। সেই এক জন বাক দিলে জগৎ নাই, চন্দ্র সূর্য্য নাই, বৃক্ষলতা নাই, তীর্থ প্রতিমা নাই, মানব নাই, সংসার নাই, আকাশ নাই নক্ষত্র নাই, পৃথিবী নাই, ফুল নাই। তবুও বাক সংসার থাকে তার সংসার দুঃখের কারাগার। *তবুও বাক সংসার থাকে সে মাল্ভ নয়। সে নামধারী আর কিছু।

ভালবাসা মোটা মুষ্টিতে দেখা যায় বটে কিন্তু ভালবাসার রস ফুলে নাই । মহাকাশে ভালবাসা ভোগ করিতে যাও, ফুলে ভালবাসার মাখামাখি করিতে যাও, তোনার সব হারাইয়া বাইবে । ভালবাসার স্বহান চিত্তাকাশে । ভালবাসার বিহার চিত্তাকাশে । প্রাণই রহিল চোরকুটুরিতে, আর প্রাণেশ্বর কি থাকিবে কুটুরির বাহিরে—হাড় মাসের উপরে ? চিত্ত স্থির না করিলে প্রাণের গতাগতির পথ ধরা যায় না—আর প্রাণেশ্বরের সন্ধান কি নিবিবে পথে, উপপথে, বনে, উপবনে ? ফুলে মন্দির থাকিতে পারে—মহাকাশে বাহা তাহা লোভ সেখাইতে পারে কিন্তু তাহার সঙ্গে মিলন মহাকাশে হয় না—হয় চিত্তাকাশে । “একই রত্নকে” কাপড় ধুইতে দিলে কি হইবে, ছায়ায় ছায়ায় মিলিবে বলিয়া পাকে পাকে ঘুরিলে কি হইবে—লোক নিলার নামে নামেও ত মিলিল বলিয়া মনকে চক্কু ঠারিলে কি হইবে এ সব বড় জড় অবস্থার কথা—ইহাতে প্রেম হয় না ইহাতে থাকে কাম । সে যদি পড়ে বলিয়া কবিতা লিখিয়া হা হতাশ করিলে কি হইবে—এটা কামমাত্র । আমি যে বড় দুঃখ পাই তার অভাবে—এটা পাকে একারে জানাইলে কি হইবে ! এটা ভালবাসা নয়, এটা কাম । ফুলটাই সহজ হইয়া গিয়াছে—ফুলে স্বভোগ বাহা সেটা ঘণিত কাম—কিন্তু চিত্তাকাশ ভিন্ন সম্ভব নাই । চিত্তাকাশে ভয় নাই, লজ্জা নাই, তাই সাধকের পথ চিত্তাকাশ । চিত্তাকাশই ভক্তির মার্গ । বিনা ভক্তিতে ভালবাসা কোথায় ? বিনা সাধনায় ভালবাসা নাই । যে দিক দিয়াই যাও চিত্তাকাশে মানস-পুঞ্জার নিত্য অভ্যাস ব্যতীত ঐশ্বিত্যমকে পাইবে না । চিত্তাকাশে স্থিতি ভিন্ন ধারণাত্ম্যসী হইতে পারিবে না । ধারণাত্ম্যসী না হওয়া পর্যন্ত ভালবাসার স্বাস্থ্য নাই । চিত্তাকাশের উপরে চিত্তাকাশ । সেখানে আমি তুমি নাই, সব আমি বা সব তুমি । এটা আপনা হইতে হইয়া যায় । এখানে সাধনা নাই, এখানে আছে সিদ্ধি । ইহাই জ্ঞান । জ্ঞান হইবার পরে যে খেলা সেই খেলাই নিত্যখেলা । সেই খেলাই আনন্দ খেলা করেন সীতা রাম, হর পার্বতী, রাধা কৃষ্ণ, মহাকাল মহাকালী, আদিনারায়ণ মহালক্ষ্মী, লোকপিতামহ ব্রহ্মা, মহা সরস্বতী । এই মিলনই সকল সাধকের অভীষিত ।

শান্ত্রে শুনি ইহার ক্রম । কত মধুর, কত রসোৎসাহী, কত সুন্দর ! চিত্তাকাশে যখন প্রথম দর্শন হয়—যখন নালনলিনাভ চক্রে চেয়ে চেয়ে ডাকা হয়—সুন্দর রূপ দেখিয়া সর্বদা কাছে থাকিতে ইচ্ছা করে কিন্তু তখন পর্য্যন্ত প্রবৃত্তি ধ্বংস হয় না বলিয়া সে বিহার করে না—কাম গন্ধ থাকে বলিয়া দর্শন স্থায়ী হয় না । একবার দর্শনে যখন প্রাণ উছলিয়া উঠে—কিন্তু তপায় থাকিতে পাওয়া যায়না বলিয়া একটা বাতনা হয়—তখন কাছে বাইবার জন্য প্রাণ ক্রমশঃ ব্যাকুল হয় ।

মিলন-আশা-ব্যাকুল সাধারণ নায়ক নায়িকার তাব বেগুন যদি চিত্তাকাশে মিলনে সেইরূপ না হয় তবে আর ভালবাসা কি ? কত লাজে সাজিতে ইচ্ছা

করে, কত বহু করিয়া বস অলঙ্কার পরিতে ইচ্ছা হয়, কত বহু করিয়া বেশ বিন্যাস করিতে ভাল লাগে। একটু বিলম্ব হইলে প্রাণ কত ব্যাকুল হয়। কত ছটু ফটু করিতে করিতে ঘর বাহির করে—কোন কাজ নাই শুধু শুধু দাস দাসীকে ডাকিতে হয়—পাছে কেহ ব্যাকুলতা জানিতে পারে—মিছামিছি বাহাকে তাহাকে একটা কাজ করিতে বলিতে হয় পাছে কেহ সন্দেহ করে।

তার পরে যখন দর্শন মিলে? কত করিয়া সাধক তখন বলে—তুমি এত সুন্দর—আমার উপর একটু রূপা কর আর আমাকে ঘাইতে বলিও না।

কিন্তু তখন ও প্রবৃত্তি যায় নাই। একটু প্রবৃত্তি পূর্বক স্পর্শে পবিত্রতা কলঙ্কিত হইয়া যায়। তাই থাকিতে পার না।

সাধক কত করিয়া আবার বলে? তোমার ছাড়িয়া থাকাই আমার প্রাণান্ত। তুমি জানিতে কি পার যখন তোমার এই মধুর মূর্তি দেখিয়াও আমাকে ছাড়িয়া ঘাইতে হয় তখন আমার দশা কি হয়? তোমার ছবি আমার সঙ্গে যায়—তোমার বাস পর্যন্ত যেন আমাকে মাতাইয়া তুলে। আমার নিদ্রা থাকে না—কতই ডাকি—বনে হয় হায়! তুমি বুঝি আমার রূপা করিলে না—যদি করিতে তবে এসনা কেন? পরক্ষণেই আবার মধুর রূপ জাগে, প্রাণে আশ্বাস হয়—আবার কিছুই থাকে না—হরি হরি এ ক্রেশ ত বলা যায় না।

তোমার জন্য এই ভাবে ব্যাকুলতা যদি জন্মায় তবে বুঝি তোমার স্বরূপ দৃষ্টিপথে আইসে। কবে এ ব্যাকুলতা পূর্ণ হইবে?

কবে তুমি আসিবে? কবে তুমি চিরতরে তোমার কাছে রাখিবে? কবে আর বিদায় দিবে না?

এসব খেলা ভক্তি মার্গের। ব্যাকুলতা নাই ভক্তি করি, এ ভক্তিতে কপটতা আছে। এ ভক্তি সংসার-গন্ধি।

দর্শন পাইতে কত ক্লেশ? চিন্তাকাশে দর্শন কত সাধনার কার্য। বিশেষ যে শুধু নাম মাত্র পাইয়াছে তাহাকে কত করিয়া তবে নামের সজীবতা অনুভব করিতে হয়—কত করিলে তবে মস্ত চৈতন্য লাভ হয়।

যখন নানই “জীবন্ত সে” হইয়া যায়—চিন্তাকাশে নামের স্পর্শে তাহার স্পর্শ অনুভব হয়—অহং-স্বেন্দ-পুলক তখন আইসে। সেই সঙ্গে সঙ্গে নাম নামী এক হইয়া রূপের সমস্ত বস্তুর মিশিয়া যায়। সর্বত্র সৌন্দর্য প্রকাশ করে। এইরূপ নাম-সাধনার ফলে জ্ঞান নীর লাভ হয়। তখন প্রবৃত্তি-মরণে মরণ-সঙ্গিনী পাওয়া যায়। ইহাই অনন্ত মিলন।

প্রাচীন রাজনীতি।

মদালসা অলক উপদেশ দিতেছেন—প্রজাগণকে তাহাদের আপনাপন ধর্ম অমূল্যে পালন করাই রাজার প্রধান ধর্ম। রাজ-মন্ত্রণার বহির্গমন কিছু-তেই হওয়া উচিত নহে। মন্ত্রণা বহির্গত হইয়া পড়িলে রাজাকে শত্রু কর্তৃক অভিভূত হইতে হয় এবং রাজাকে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে হয়। অরাজগণের দোষে অমাত্যবর্গ দূষিত হইয়াছে কিনা অর্থাৎ শত্রুগণ উৎকোচাদি দ্বারা অমাত্য-বর্গকে দূষিত করিয়াছে কিনা রাজার ইহা জ্ঞাত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। রাজা চর দ্বারা অরাজি চরদিগের গতিবিধি সম্বন্ধে অমূল্যকান করিবেন। কি মিথ্য কি আশু কি বন্ধু রাজা কাহাকেও বিশ্বাস করিবেন না। কিন্তু কার্য বশতঃ সমসাময়িক শত্রুকে বিশ্বাস করিতে হয়।

রাজা কামের বশবর্তী না হইয়া স্থান বুদ্ধি ও ক্ষম অবগত হইবেন। সন্ধি বিগ্রহাদি ষড়্‌গুণে তাঁহাকে বিচু্যিত হইতে হইবে।

রাজা প্রথমতঃ আপনাকে, তৎপরে অমাত্যগণকে, তৎপরে ভৃত্য সমূহকে পরে গৌরবর্গকে বশীভূত করিয়া তবে অরাজি সহ বিরোধ করিবেন।

যিনি প্রথমে আত্মজয়ী না হইয়া-অর্থাৎ আপনার কাম ক্রোধাদি বশীভূত না করিয়া শত্রুগণকে পরাভূত করিতে বাসনা করেন সেই অজিতাত্মা মহীপতি অমাত্য কর্তৃক বিজীত হইয়া শত্রুর বশীভূত হইবেন।

কাম ক্রোধ লোভ মদ মান হর্ষ ইহারাই অসি। ইহারাজি রাজাদিগের বিনাশের কারণ। পাণ্ডু রাজা কাম বশতঃই নষ্ট হইলেন। অমূল্যদ ক্রোধ বশতঃ পুত্রধনে বঞ্চিত হইলেন ঐল রাজা লোভ বশতঃ বিনষ্ট হইলেন। বেন রাজা মদবশে বিপ্রগণ কর্তৃক নিহত হইলেন, অনাযুষ পুত্র বলি অভিমান জন্য বিনষ্ট হইলেন এবং পুরঞ্জয় হর্ষ বশতঃ নিধন প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু রাজা মরুও ঐ সমস্ত ত্রিগুণকে পরাজয় করিয়া সংসার জয় করিয়াছিলেন।

শত্রুর প্রতি ব্যবহার—রাজা শত্রুর প্রতি কীটের ন্যায় ব্যবহার করিবেন অর্থাৎ ক্লীট যেমন কোনরূপ আড়ম্বর না করিয়া জব্যাদি কর্তন পূর্বক অর্জ্জবিত করে রাজা শত্রুকে সেই রূপ নিঃশেষে অর্জ্জবিত করিবেন।

সঞ্চয়াদি—রাজা শিপীলিকার ন্যায় সঞ্চয়ী হইবেন। রাজা অগ্নিশূলিক ও শামলী বীজের ন্যায় বাগনশীল হইবেন। সর্বত্র আপন সত্তা স্থাপন করিবেন। রাজা চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় রাজনীতি প্রয়োগ পূর্বক পৃথিবী পর্য্য-

বেক্ষণ করিবেন। চন্দ্র সূর্য্য যেরূপ সকলের গৃহেই কিরণ বিতরণ করেন এবং কখন তীক্ষ্ণ কখন মৃদু হন, সেইরূপ রাজনীতি প্রয়োগ করিয়া উদয়নীর হওয়ারই রাজ্যের সমুচিত।

বন্ধকী, পদ্ম, শরভ, শূলিকা গুর্জিনীতন ও গোপাঙ্গনা নরপতি এই সকলের নিকট প্রজ্ঞা শিক্ষা করিবেন। বন্ধকী যেমন পর পুরুষের চিত্ত বিনোদন করে নরপতিকেও সেই রূপে প্রজ্ঞাবর্গের মনোরঞ্জন করিতে হইবে। তিনি পদ্মের ন্যায় সকল ব্যক্তিরই চিত্তহারী হইবেন, শরভের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ করিবেন। শূলিকার ন্যায় একবারেই শত্রুকে ধ্বংস করিবেন। গুর্জিনীর তনু যেরূপ ভাবী সম্ভানের প্রতীপালনार्থ হৃদয় সংগ্রহ করিয়া রাখে, নরপতিও সেইরূপ ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়শীল হইতে যত্ন করিবেন। গোপাঙ্গনা যেরূপ একমাত্র ছদ্মদ্বারা নানাপ্রকার ভ্রম প্রস্তুত করে, রাজাকেও সেইরূপ কল্পনা পটু হইতে হইবে।

বস্কুরা পালন করিতে হইলে ইন্দ্র সূর্য্য যম চন্দ্র বায়ু এই পঞ্চ দেবতার অমুরূপ আচরণ করিতে হইবে।

যেমন ইন্দ্র চারি মাস বর্ষণ দ্বারা পৃথিবীবাসিগণকে আপ্যায়িত করেন, রাজাও সেইরূপ অর্থাদি দানে সকলের প্রীতিসাধন করিবেন। সূর্য্য যেমন স্তম্ভি যোগে আটমাস জল শোষণ করেন সেইরূপ সূর্য্য উপায়ে শুদ্ধাঙ্গ গ্রহণ করিবেন। কাল প্রাপ্ত হইলে যম যেরূপ কি প্রিয় দ্রব্য সকলকে নিগৃহীত করিয়া থাকেন, রাজাও সেইরূপ কি প্রিয় কি অপ্রিয় কি দুষ্ট, কি অদৃষ্ট সর্বত্র সমদর্শী হইবেন। পূর্ণচন্দ্র সন্দর্শনে যেমন সকলের প্রীতিলাভ হয়, ঋতাহার শাসনে প্রজাপুঞ্জ সেইরূপ সুখানুভব করে, সেই নরপতির আচরণই প্রকৃত শশধরের অমুরূপ।

বায়ু যেরূপে গুপ্তভাবে সর্বত্রুতেই বিচরণ করিয়া থাকে নরপতিও সেই রূপ চর দ্বারা পৌর অনাত্য ও বান্ধব প্রভৃতির চরিত্রাদি অন্বেষণ করিবেন। কাম লোভ কিম্বা অর্থবশে অথবা অন্য কোন কারণে যাহার মন সমাকুল না হয় সেই নরপতিই স্বর্গে গমন করেন।

হে বৎস ! যে রাজ্যের রাজ্যে বর্ষ বর্ষ বা আশ্রম বর্ষ কোন প্রকারে অবসাদ প্রাপ্ত না হয় তিনি ইহ পরলোকে শান্তহৃদ উপভোগ করেন।

বুদ্ধিমান ব্যক্তি বর্গের পরামর্শে নিরন্তর কার্য্য করা ও সকলকে স্বয়ং বর্ণে স্থাপন করাই রাজ্যের এক মাত্র কার্য্য এবং ইহাই তাঁহার সিদ্ধি লাভের কারণ।

উৎসব ।

ও শ্রী আচার্য্যায় নমঃ ।

অতৌ কুরু যচ্চেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি ।

স্বগাত্ৰাণ্যপি ভাৰায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে ॥

২য় বর্ষ]

১৩১৪ সাল, মাঘ ।

[১০ম সংখ্যা]

হংসগীতি ।

শব্দেতে কি বুক্‌বি ভারে ?

সে যে— উপাদানে না হ'য়ে যায়, নিমিত্তে বাপ্ একই হরে ।

ছেড়ে দে লৌকিকের ফাঁকি

চক্ষু বুজে বোস্ আপন ঘোরে

দেখ'বি— ক্রী-পুঙ্খে মাতা নাতি

ক্রীবেশ রতি নাই সে ঘরে ॥ ১

কথার সঙ্গে অর্থ যায় কি

অর্থের সঙ্গে কথা ফেরে ?

ভরে— ভাষা সব ইসারা বাড়ি

যে ডোবে দে হারায় হেরে ॥ ২

ওরে— দাঁড়ের উপর দাঁড় বসিয়ে

ঠোঁটের উপর ঠোঁটটা বুড়ে

ওতাই— জিহ্বাটা রেখে আপন হানে

শ্বাসের ঘায়েই মনটা মরে ॥ ৩

শতাব্দিক চুম্বালিশ বারের

প্রাণাঘাতের ধারণা রে

এটার— বার শুনে ধ্যানাবস্থা

তারও বারোতে সমাধিরে ॥ ৪

হবে—

যদি—

নিশ্চয় মরণ উষাচরণ জেনে বসে অঙ্গুল নেড়ে

চাৰি মোক কবীর লক্ষ বসমায়ে প্রাণবায়ুতে ॥

বাণী ।

চাহিনা ইজ্ঞা আমি,
 চাহিনা স্বরণ অর্থ,
 হে দেবি, হে অমৃত ভাবিণি ।
 কবির মানস-কুঞ্জে—
 তুমি নিত্য ফুটি' থাক,
 হে, আমার মানস-নলিনি ।
 হে আমার মধুলুকে,
 দিব্যনেত্রে অঙ্গন দাখিনি ।
 পুষ্পে পুষ্পে কিরি ঘুরি—
 মধু আহরণ করি,
 এসো পুণ্য প্রভাতের নয়ন-রঞ্জিনি ।
 এসো সত্তা পরিম্বাত
 সঙ্গীত অনিয়-ধার।
 হে যুগে, হে জুবন মোহিনি ।
 এসো তুমি ভীত ভীত,
 মলয় সমীর মত—
 আমার জীবন-পথে মুগ্ধ প্রবাহিনি ।
 এসো শান্তি, এসো ক্ষমা,
 ত্রিজুবন মনোরমা—
 অমঙ্গলা শুচি-বিলাসিনি ।
 এসো সাধ্বি, এসো বাপি
 কবিতা-নিকুঞ্জ রাণি
 পাদক্ষেপে রোমাঞ্চ ধরনী ॥

শ্রীহরিশঙ্কর চক্রবর্তী ।

• অনন্ত জীবন ও অনন্ত মরণ।

মনের দুই স্রোত। মনের একপ্রকারের চিন্তা বিনা আত্মানে আসিতেছে। অল্প প্রকারের চিন্তা আনিতে পরিপ্রম করিতে হয়। প্রথম চিন্তাস্রোত স্বাভাবিক। জীবনের কতক বয়স পর্য্যন্ত ইহারা অবাধে চলিতে পায়না, বাধা প্রাপ্ত হয়। কিছু বয়স হইয়া গেলে এই স্বাভাবিক চিন্তা প্রবাহ বিনা বাধার চলিতে থাকে। মানুষ তখন এই চিন্তার দাস। “চিন্তয়া জীর্ণ মেহ” যে কথা পাওয়া যায়, তাহা এই অবস্থার কথা। এই অবস্থাই মৃত্যু।

এই স্বাভাবিক চিন্তার প্রবাহকে উপেক্ষা করিয়া বিনি ভগবানের নাম, রূপ বা গুণ বা স্বরূপের চিন্তা প্রবাহ লইয়া থাকিতে পারেন—তিনিই দর্শন পুরুষকার অবলম্বন করিয়াছেন। সর্বদা পুরুষার্থ লইয়া থাকিতে পারিলেই অমরত্ব লাভ হয়। স্বাভাবিক চিন্তা প্রবাহে থাকাই মৃত্যু। স্বাভাবিক চিন্তা প্রবাহ, প্রথম প্রথম অগ্রাহ করিয়া, শেষে একবারে ধূর করিয়া পুরুষার্থে থাকাই অনন্ত জীবন।

কে কতদূর যন্ত্রিতেছেন বা জীবন পথে চলিতেছেন ইহাই তাহার পরীক্ষা।

তদু ভগবানের নাম জপ, রূপ ধ্যান ও গুণ শ্রবণ এবং স্বরূপ চিন্তা ভিন্ন অল্পভাবে বিনি চেষ্টা করিতেছেন সে চেষ্টাকে পুরুষার্থ বলেনা। বলে উন্নত চেষ্টা। সংসারের কর্তব্য পালন অল্প কর্ম নিকাম ভাবে করিতে না পারিলে উন্নত চেষ্টাই হয়।

উন্নত চেষ্টায় অনন্ত জীবন লাভ হয় না। অধিকারী ভেদে ইহাতে স্বর্গ পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে। তাহার পরেই পতন আছে। অনন্ত জীবন লাভ হইবে প্রকৃত পুরুষার্থে সর্বদা থাকিতে পারিলে।

মিলন পিপাসা।

জ্ঞান মার্গের মিলনের কথা বলা হইতেছে না। এখানে অজ্ঞানের নাশকেই মিলন বলে। এই মিলনের নাম স্বরূপে হিতি। আমরা বলিতেছি ভক্তি মার্গের কথা।

“আমার সাধ না মিটিল” “আশা না পূরিল” ইহাই কত জীবনের কাতরোক্তি। কোন্ মিলন পিপাসার জীব ব্যাকুল? কেন এ হাহাকার? কেন শুনা যায়—

“কতদিনে ঘুচেব টহু চাটাকারি !

কতদিনে ঘুচেব গুরুদা চখ ভাট !

কতদিনে চান ঢাকোরে চব মেলি !

কতদিনে ভ্রমর কমলে কুহু কেলি !

কোন সাধ মেটেনা বলিয়া জীব হুঃখ করে ? কোন আশা পূর্ণ হয়না বলিয়া জীব গুরুহুঃখ ভাবে বাণিত হয় ?

পরিচ্ছিন্ন অপরিচ্ছিন্নে মিলিতে চায়, খণ্ড অখণ্ডে মিলিতে চায় টেঙাট পোকত মিলন। আর এক প্রকার মিলন আছে যেখানে পরিচ্ছিন্ন পরিচ্ছিন্নে মিলিত হয়, যেখানে খণ্ড খণ্ডে মিলিত হয়, যেখানে সমান সমানে মিলিতে চায়। শেখোক মিলনেও সুখ নাট, আপাততঃ একটু সুখের এলেন পাইয়া কলিক আনন্দ হয় মাত্র। কিন্তু এ সুখ তঃখেরট অজরূপ। ইহা সুখগন্ধি হুঃখই। নতুবা যে বিবাহে জী পুরুষের একটা মিলন হয় তাহা ত এত প্রচুর হুঃখ কেন উঠে ? চই দিন পরেই জী পুরুষের এত বিতৃষ্ণা হইয়া যায় কেন ? তবে কি প্রকৃত বিবাহ ইহা নহে ? প্রকৃত বিবাহ তাহার নাম যেখানে এক জনর অত্র জনরে মিলিত চইয়া—এক ইচ্ছা অত্র ইচ্ছার মিলিয়া বগলাত করিয়া সেই পূর্ণ জনবে নিশিত পারে। খণ্ড খণ্ডে মিলিয়া, পরিচ্ছিন্ন পরিচ্ছিন্নে মিলিয়া, বল লাভ করিয়া, সেই অখণ্ডে অপরিচ্ছিন্নে মিলিত হইতে পারে। ইহা যেখানে নাই সেখানে হাহাকার মিটিতে পারেনা ; সেখানে গুরু হুঃখ ভায় বায়না।

ধর্ম জীবন ভিন্ন সাহসের সর্ব হুঃখ নিবৃত্তি হইতেই পারে না। এই বিশ্বাসে আজ জগতের কত নর নারী ধর্ম আচরণ করিতে ছুটিয়াছে। কিন্তু ধর্ম আচরণ করিয়া কয় জন ছুড়াইয়াছেন ? কেন ছুড়াইতে পারে না তাহাটি আমাদের আলোচনার বিষয়।

আমরা সকল সম্প্রদায়ের কথা বলিবনা সাধারণতঃ লোকে যাহা অবলম্বন করিয়াছে তাহাটি আমরা আলোচনা করিতে চাই।

ভারতবর্গ কৰ্মভূমি। শাস্ত্র বলেন অত্রাত্ত দেশ ভোগভূমি। একথা পূর্ব সত্য। ভারতের লোকের ব্যবহার, ভারতের লোকের ভাণ স্বীকার, ভারতের লোকের প্রার্থনা, বাহ্যিক অন্নমাত্র আলোচনা করিয়াছেন তাহারি একথা ধারণা করিতে পারেন। ভারতের লোক স্বর্গের চায়না, অমরবতী পাটলেও ছুড়াইতে পাবেনা—ইহারা চায় পূর্ণের সন্তিত মিলিতে—নতুবা

ইহাদের ছীবনের উদ্দেশ্য সিকি চটল না। ভারতের কৃষি শিক্ষা দিগেন "ভূমি ভোগা ন রেচন্তে স জীবন্তু উচ্যতে"। ভূমি ভোগ তুচ্ছ—কেননা কৃষিক, স্বর্ণ প্রার্থনার বস্ত্র নহে—কেননা "কীণে পূণ্যে মর্ত্যলোকং বিশিত্ব"। পূণ্য ক্ষয় চটলে আবার ভূমিসাগর স্বরূপ এই সংসারে পড়িতে হইবে। যেখানে গেলে আর পতন নাট, যেখানে গেলে আর ক্ষিত্তে হইবেনা, যেখানে গেলে ভূমির আত্মাত্মিক নিবৃত্তি যেখানে থাকিলে নিস্তা আনন্দে স্থিত, তাহাই ভারতের শিক্ষা।

এই উদ্দেশ্য সিকি গল্প বচ উপায় ভারতের লোক জানেন। বচ লোক বচ সাধনা অভ্যাস করিতেছেন। আমরা সর্ব সাধারণের মধ্যে প্রচলিত যে মঙ্গল ভাষাতেই ইহা অল্পস্থানত কিরূপে, তাহাই আলোচনা করিতেছি।

সাধক ও ইষ্টদেবতা; গুরু ও শিষ্য; স্বামী ও স্ত্রী ইহাদের মিলন পিপাসা মিটাইবার জন্য গল্প বজা। হুল শরীরকে তীর্থে লইয়া গেলে তীর্থের সহিত হুলে মিলন হয়; কিন্তু হুলশরীর হইতেছে মন, মনকেও যেখানে লটকা লাওয়া যায় সেখানেও প্রিয়ের সহিত ইহার মিলন হয়। হৃদয় থাকিয়া হুলে মিলন ইহাও প্রশস্ত। ভক্তগণ মানসিক মিলন অভ্যাস করেন। এই মানসিক মিলনের সুখ বচ বিতরু, হুল মিলনের সুখ সেরূপ নহে। বাহ্যদের জড়ত্ব বেশী তাহারাই হুল মিলনের জন্য ব্যাকুল। ইহারা তম প্রকৃতির লোক। কিন্তু সার্বিক প্রকৃতির সাধক হৃদয় মিলনেই অধিক সুখ অল্পভব করেন। মন্ত, গুরু, স্বামী এই হৃদয় মিলনেই দেখাইয়া দিয়া থাকেন। ভক্তি জগতে মঙ্গল, মানসপূজা, নীলাচিন্তা এই হৃদয় মিলনের গুণ। শাস্ত্র বলে—

“এই জগতে আত্মকৃত্ব পর্যন্ত সকল জাতি সকল শরীরই সর্বদা দ্বিপদী। তন্মধ্যে মনঃশরীরই ক্ষিপিকারী ও সর্বদা চঞ্চল। অল্প মাংস—নিশ্চিত দেহ অকিঞ্চিৎকর তাহার কোন ক্ষমতা নাই। ঐ মাংসময় শরীরই শাপ, অভিজ্ঞান ক্রিয়া প্রকৃতি দ্বারা আক্রান্ত হয়। ঐ দেহই মুকপ্রায়, অশক্ত, কণ্ডলু, পদ্মপত্রগত সলিলের জ্বাৰ চঞ্চল ও দৈবাদের বশে অবস্থিতিমান। কিন্তু মনোময় শরীর প্রাণিদেহের আশ্রয় হইয়াও আশ্রয় হয় না। যদি কেহ সর্বদা স্বকীয় পৌরুষ ও দৈব্য অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতে পারেন, তবে ভূমাদি আদিরা তাহার চিত্ত—দেহকে আক্রমণ করিতে পারেনা ও দূষিত করিতে পারেনা। দেহীগণের ঐ মনোদেহ যে যে প্রকারে যত্বান হয় সেট সেট প্রকারেই উহা স্বীয় পৃষ্ঠ প্রগড়ে কল প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মাংসময় শরীরের কোন পৌরুষই সফল হয় না। মনোদেহের সকল চেষ্টাই সফল হয়।

যে চিত্র সৰ্জন পবিত্র বিষয়ের স্মরণ করে, তাহাতে শাপ প্রভৃতি সকল ক্রিয়াই শিলায় বাণক্ষেপণে নিষ্ফল হয়। মাংস শরীর কদমে অগ্নে বা বহ্নিতে নিপতিত হউক না কেন, মন যাহার অঙ্গুসঙ্গান করে তৎক্ষণাত তাহা প্রাপ্ত হয়।

কৃত্রিম ইচ্ছা পৌরুষ বলেই অস্ত্রঃকরণকে প্রিয়াময় করিয়া কোন প্রকার হুঃখই অধুভব করেন নাই। মাণ্ডব্য মূনি শূলে আরোপিত হইলেও মনকে বিষয় বিহীন ও বিগত অস্ত্র করিয়া সমুদায় ক্লেশ ভয় করিয়াছিলেন।

দীর্ঘতপা স্ত্রী যোগ করিবার অভিলাষে যোগোপকরণ সংগ্রহার্থ বহির্গত হইয়া অকক্ষুণে নিপতিত হন, পরে সেই কৃপা মধোই মানসিক যজ্ঞ করিয়া বিবিধ পদ প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। ইন্দু পুত্রগণ মাহুয হইয়াও ধ্যান বলে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।”

দেখান হইল—যাহা পাইলে তুমি জুড়াইতে পার সেইটি বেশ করিয়া বিচার করিয়া নিশ্চয় করিয়া লও, করিয়া তাহার সহিত মনোময় শরীরে নিয়ন্তর জুড়াইয়া থাক, তুমি নিশ্চয়ই তোমার প্রাণের প্রাণকে পাইবেই। কিন্তু যাহাকে তাহাকে যদি প্রাণের প্রাণ বলিয়া নিয়ন্তর স্থলে মিলিতে চাও তবে তুমি বহুবার জনন মরণ স্রোতে পড়িবে।

তাই অগ্রে প্রাণের প্রাণকে ঠিক করিয়া লও। মস্ততত্ত্ব আমাদের কাছে সেই রমণীর দর্শনকে দেখাইয়া দিতেছেন এবং তাহার কাছে লইয়া যাইবার লজ্জা অপ যজ্ঞ বিধান করিতেছেন।

শাস্ত্র মত মন্ত্র যে গুলি, সেগুলিতে প্রণব বা অধিকারী ভেদে প্রণবের প্রতি-নিধি স্বরূপ কিছু, বীজ ও নাম আছে। ঋতি বলিয়া দিতেছেন—ইহার অর্থমটি “আত্ম স্বরূপম্” মধ্যটি “প্রকৃতি স্বরূপম্” শেষটি “পরব্রহ্ম স্বরূপম্”। পরে বলিতেছেন “ইতি য এবং বেদ। সোহমৃতো ভবতি।”

আত্ম স্বরূপও যাহা, পরমাত্মা স্বরূপও তাহাই, তথাপি জীবে ও শিবে যে ভেদ তাহা অজ্ঞানত্ব। আত্ম স্বরূপকে প্রকৃতি সাহায্যে পরব্রহ্ম স্বরূপে মিলাইতে হইবে—ইহাই মন্ত্র ব্যাখ্যা। প্রকৃতিই শক্তি। ঋতি বলেন ও শ্রী গুরুঃ সার্ককারণ তুচ্ছা শক্তিঃ। ও শ্রী গুরুই এই শক্তি। তিনিই মাতা। মাতার সাহায্যে খণ্ড অখণ্ডে, পরিচ্ছিন্ন অপরিচ্ছিন্নে মিলিত হইবে। মাতাই মিলাইয়া দিলেন। জীব একটা অবিজ্ঞা বশে আপনাকে পরিচ্ছিন্ন মনে করিয়া রাখিয়াছে। শক্তি উপাসনা করিতে করিতে অপরিচ্ছিন্নকে পরিচ্ছিন্নের উপর ধারণা করিতে করিতে আপনাকে অপরিচ্ছিন্ন দেখিতে পাইলেই ইহার সকল আশা মিটিবে সকল সাধ পূর্ণ হইবে।

স্বর্ণ গুপ্তলিকা আপন উৎপত্তি স্থান যে সমুদ্র তাহা মাপিতে গেলে গণিয়া সমুদ্রই ত হইয়া যায়—“প্রজ্ঞানি ত্রৈলোক্য ভবতি” প্রতিও ত ইহাই বলিতেছেন । তবে তত্ত্বের মিলন কিরূপে হইবে? অন্যত্ব কাল দাস বা দাসী হইয়া সেবা করা বাইবে কিরূপে? ইহার একমাত্র উত্তর যাহার ক্ষমতা প্রবল সংকল্প করা যায়, যাহার অত্যন্ত তীব্র ভাবনা করা যায় তাহাই লাভ হয় । ভগবানের সহিত এক হইয়াও তাঁর ভাবনা বশে তরু আপনাকে পৃথক রাখেন—চিরদিন দাস বা দাসী হইয়া সেবা করেন ইহাই শাস্ত্র সিদ্ধান্ত । জানীও অশেষত ভাবে নিত্য থাকিয়াও দৈত্য ভাবে থেকা করেন । যেমন নিষ্ঠুর-প্রজ্ঞা সর্বদা স্বরূপে থাকিয়াও অবতার হইয়া রঙ্গ করেন, অথবা পানী আপনার চরিত্র সর্বদা জানিয়াও ভিন্ন সমাজে ভিন্ন লোক হইয়া নানা কার্য্য করেন সেইরূপ । এ সম্বন্ধে আর অধিক বলা গেলনা—যাহার যেরূপ অধিকার তিনি সেইরূপ বুঝিয়া লইবেন ।

চিত্তস্পন্দন ।*

(শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য বি এ বহরমপুর কৃকনাথ কলেজের অধ্যাপক)

“চিত্তস্পন্দন” একখানি সরস কবিতা-নিবন্ধ হুয়ারতন গ্রন্থ । উপহার পাইলাম সমালোচনার জন্য । মূল্য আট আনা মাত্র ।

উপহার পাইয়া সুখী হইলাম । প্রথমে কিছু লিহরিয়া ছিলাম—সমালোচনা করিতে হইবে জানিতে পারিয়া । একটু অহং ভাবও জাগিয়াছিল, মনে হইয়াছিল “সত্যাক্রমঃ প্রিয়ক নানুতং ক্রমঃ এবঃ ধর্মঃ সনাতনঃ” । গ্রন্থখানি পড়িতে পড়িতে কিছু মনে মনে চমক পাইতে লাগিলাম । সলজ্জ সঙ্কোচে মনে মনে বলিতে হইল কবি অরসিকেরূপ রসত নিবেদনম্ না করিলেই ভাল হইত । লোচন হীনের সমালোচনা সাধেনা । আশক! হইতেছে পাছে “পড়িয়া ভেড়ার শূদ্রে ভাগে হীরার ধার ।”

গ্রন্থ খানি দেখিতে ছোট । তা' ছাড়া আর কোন অঙ্গে বড় একটা ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না । কবি প্রতিভার মৌলিকতা ও কল্পনার ককর্ণতা কদাচিত্ দৃষ্টি গোচর হয় ।

প্রথমেই অল্প কথায় একটি উপহার । কবির মৌলিকতা দেখাইবার জন্য আমরা উপহারটি উদ্ধৃত করিতেছি । বড় সুন্দর কথার কবি আপন

উপাত্ত বস্তুতে আশ্রয় সমর্পণ দেখাইয়াছেন। কবি উপাত্তের স্মৃতি এক
প্রাণ হইয়াছেন কেবল খেলার জন্য একটা “অহং” ব্যবধান রাখিয়াছে।
কবি যে নিজে লিখিতেছেন তাহাও বলিতে যেন চান না। তাহার যেন
কোন কর্তব্য আর নাই তবে যে কল্প চলিতেছে একজন কবির নহে তাহার
উপাত্তের। তিনি যে কবিতা লিখিয়াছেন এ খেলাও যেন তাহার নহে
কবি বলিতেছেন।

“তুমি গাধিয়াছ আজ কবিতার হার”

“দেখি কত সাজে নাথ পর এক বার”

ভগবানের বস্তু ভগবানকে দিতে বড় লুপ্ত। ভগবান আপনি পয়েন না।
কবি তাহার ‘কবিতার হার’ তাহাকে পরাইয়া নিজের সাধ মিটাইতেছেন।
পাঠক ও পাঠিকা এ উপহারে বহু দৌন্দর্য্য অহুতব করিতে পারিবেন।
কবি বলিতেছেন—

নয়নে তপন তব মনে স্নানকর,
প্রতি ধোমকূপে প্রভু বিশ্ব চরাচর,
নেত্র উদ্বীলনে দিবা সুদিলে রজনী,
যুদ্ধে বৃহস্পতি, তব বাক্যে বীণাগানি,
সকলই তোমার গুরো! কি আছে আমার,
কদি যে পুজিতে চায় এ সাধও তোমার।
বিশাল সাগর বন্ধে তরঙ্গের মালা,
ভুলিয়া যেমন খেল এও সেই খেলা।
তোমার আমার প্রভু একই পরাণ,
পূজার কারণ বুঝি “আমি” ব্যবধান।
তুমি গাধিয়াছ আজ কবিতার হার,
দেখি কত সাজে নাথ—পর একবার।

শেষের ছন্দ জীবন্ত। আমরা যেন দেখিতে পাই কবি হার পরাইয়া
দিতেছেন। “বালা যোগীর আশ্রম” শীর্ষক কবিতাটি পরিশ্রুত ভাবে কবির
কল্পনা, কবির চিত্র অঙ্কন শক্তি, কবির জ্ঞান পিপাসা—প্রভৃতি বহু প্রতিভার
সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। নিম্নে প্রতিভাময়ী বর্ণনার একটু আভাস দেওয়া
গেল। নন্দ্রী কবিতা না পড়িলে সৰ্ব্ব রসের সন্বেশ জ্ঞদরসন হইবে না।

কবি ক্রুবিকেশ পরে লছমন ঝোলায় দৃষ্টা সখকে বলিতেছেন ।

সুন্দর পর্ত্ত মালা ! সুন্দর জাহ্নবী !
পর্ত্তের কোণে কোণে গঙ্গার প্রবাহ !
হিমালি দেখিয়া হেথা মনে ভ্রম হয়,
যেন বা মেনকা রাণী উমার বিনায়ে—
কাঁদিয়া—দাঁড়ারে আছে পশ্চাৎ কিরিয়া—
উমার গমন পথ না পারি দেখিতে ।
সীমন্তের দুই ধারে মুক্ত কেশ পাশ—
এলায়ে পড়েছে যেন পর্ত্ত আকারে ।
প্রভাতে তপন উঠে পর্ত্ত পশ্চাতে,
সিন্দুরের টিপ্ মত মেনকার ভালে ।

বাণা যোগীর বর্ণনা বড় সুন্দর ।

সুনীল আদনে বসি—স্থির স্তম্ভাসনে
বাণা যোগী—অঙ্গে মাথা কোটি-স্বর্ঘ্য আভা—
চন্দ্র কোটি স্তম্ভীতল ! কপালে চন্দ্রমা—
আঁধি তারা থির—বাধা তৃতীয় নয়নে—
মৌলিবদ্ধ জটাতলে । এখানে ওখানে,
মৌলিমুক্ত কেশ শুদ্ধ এসেচে নাবিয়া,
চন্দ্রাঘি উজ্জল নীল কুন্তল ছাড়িয়া,
বিধুখণ্ড বিমণ্ডিত স্নকোমল ভালে ।
ত্রয়র তারকা—মধুপানে মত্ত হ'য়ে
ডুবিয়াছে আঁধি পল্লব—উড়িতে না পারি ।
চাক্ষুসে বিষ গুঠ—কহনে না যায়,
কি শোভে অলক্ত রাগ তুষার কমলে ।

বর্ত্তমান সময়ের পল্লব-গ্রাহী তরল কবিতার যুগে এতাদৃশ উচ্চ অঙ্গের কবিতা বাস্তবিক বিরল । বসন্তের মধুমক্ষিকার স্তায় লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে কবিকুল আবির্ভূত হইয়া বঙ্গের সারস্বত কুল নিতাই মুখরিত করিতেছে । আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই এখন কবি । স্বাধীনতার প্রেরণা অল্প সকল দিকে বাধা প্রাপ্ত হইয়া কবিতা প্রসঙ্গে শতমুখে ছুটিতেছে । ভাবার ধরস্রোত ভাবের শতশত সেতু শতধা বিভক্ত করিয়া বড়ই রঙ্গ ভঞ্জে প্রধাবিত হইতেছে । একালের কবিতার ভাবার পারিপাটা ও চাকচিক্য প্রচুর পরিমাণেই আছে, কিন্তু ভাষা বাস্তব আর সমস্তই প্রায় ভাসা ভাসা । এই ভাব-বিরল উত্তম অঙ্গহীন কবিতা-কবকের স্বর বড়ই মধুর । মুষ্টিমেয় বঙ্গ কবি এই সাংক্রামিক ব্যাধি হইতে অধিকাংশেই নিশ্চিন্ত ।

সাধারণতঃ খণ্ডকাব্য দুইভাগে বিভক্ত হইতে পারে । বাহ্য-প্রকৃতির স্নমধুর-ভাব কবি-হৃদয়ে যে ঝঙ্কার তুলিয়া দেয় কবির হৃদয় তন্ত্রী সেই মধুর

•কি জানি কি তাব মাথা আধ খোলা আধ ঢাকা
 জীবন তরঙ্গে মোর নাচিয়া বেড়ায় ।
 কি জানি ও কচি ফুলে কি জানি সৌন্দর্য্য বুলে
 কি জানি কি হিজি বিজি আঁকা ও পাতায় ।
 কি জানি কি ছাই রাই বলিতেও ভাষা নাই
 পাতায় পাতায় তোম হেলে হলে যায় ।

আবার দেখি—

কাঁটায় কাঁটায় তুমি ধর এত বল,
 কণ্টক নহেত তব প্রেমের শিকল ।
 কি দিয়া বাসিব ভাল বজ্রিয়া না পাই ।
 যা দিব তোমারে সই ! তুমি যে লো ভাই ।
 কে আঁকিল তোরে সখি ! বিরলেতে বসি,
 সাথে কি গোলাপ তোরে এত ভাল বাসি ।

নব্বর জড়ের সনে হয় কি সাধন বিনে
 দেবতার সম্মিলন কখন হেথায় ।

অজ্ঞান অলপ মতি দেখিয়া পাইছু শ্রীতি
 তুলিয়া লইছু তোরে আদরে হিয়ার ।

অস্ত্র— দেখ সে কেসন করে নিপ্রিত বদন পরে
 সহস্র সাধেতে সে যে তোম পানে চায়,
 এত স্নেহে ফুল রাশি কেন হও বিবাদিনী
 কেন বা তুমি মুখ কি হুঃখ হিয়ার ।

কণ্টক এতই দেখে বাধা বুঝি পাও বুকে
 এ কাঁটা রক্ষার তরে তাও কি জান না ।

অনন্ত নধন যায় গোপন কি থাকে তার
 ছিছি কি লজ্জার কথা তবুও সস্তাপ ।

কেন এ যৌদন বল মুছে কেল অশ্রুধল
 কাঁদিলে কাঁদিলে সেয়ে কি দিবে উত্তর ।

হার সখি উষা সনে আবার প্রফুল্লাননে
 হাসিলে হাসিলে তুমি সেও নিরস্তর ।

গোলাপ কবির সাধনার বস্তু । বৈষ্ণব কবিদিগের কবিতায় দেখি
 “অমুখন মাধব মাধব সোড়রিতে সুন্দরি তেলি মাধাই । এই কবির বহুহানেই
 সাধনার বস্তুতে আত্মপ্রতিবিম্ব দেখিতে পাই । গোলাপ লিখিতে লিখিতে কবি
 আপনিও গোলাপ হইয়া যাইতেছেন, কখন বা কোন এক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া
 গোলাপকে সাধনা করিতেছেন । শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কখন কখন উন্নত হইয়া
 সুই সেই সুই সেই করিতেন । ভক্ত প্রহ্লাদ উপাসনা করিতে করিতে হরি
 হইয়া যাইতেন, তখন আপনি বলিয়া উঠিতেন আমিই সচ্ছন্দ পুরুষ,

আমিই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্তা। এই কবির সাধনার বহু স্বামে আমরা এই সাধনার সর্বোচ্চ ভাব লক্ষ করি।

* অন্তরিক্কে আমরা ইহাও দেখি যে কবির অমৃতময়ী তুলিকা জ্ঞান ও ভক্তির তবগুলি অতি মধুর ও প্রাঞ্জল ভাবে চিত্রিত করিয়াছে।

“মামেবৈষাসি—ভক্তি যোগ” মানস পুজার অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত। “মামে-বৈষাসি—জ্ঞানযোগ” ভক্তি-বিচারতত্ত্ব সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিতেছে। আমরা অত্যন্ত কবিতা হইতেও ইহা দেখাইতেছি।

রূপবান হও রূপাতীত নও,
অথবা উভয় তানি বারে বার,
কত করে গড়া এই তব ধরা
আকাশের তলে কি সুন্দর মরি।
সকলে দেখাতে আলো লয়ে হাতে
দাঁড়িয়েছ আসি চন্দ্র সূর্য্য পরে।
গড়ি কুণ নানি মিলায়েছ হাসি
ফুল বালা হাসে চেয়ে তোমা পানে।
তাই কুণ চর সারা ধরা ময়
ঢালে সুখা বুঝি হাসি প্রাণে প্রাণে।
অন্তর্য— খেলার পুতুল আমি খেলিছেন বিশ্বস্বামী
হায়রে একথা মনে ছয়নি তখন।
কখন বালিকা গড়ি কত বা যুবতী নারী
কখনও বৃদ্ধ জরা শিরে শুভ্রকেশ।
কতুবা সাজায়ে রাণী কতু করে তিথারিণী
কখনও গৈরিক বাসে আবরিছ কায়।
নিতুই ত এই খেলা খেলিছি লৈশব বেলা
আজ দেখি সেই খেলা সারা বহুধায়।

কবির বুদ্ধি শাস্ত্রোচ্ছল। বেদান্তের তত্ত্বগুলি অতি সরস ও বিশদ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

অচো সংসার স্বপন !
স্বপ্নে হয় স্বপ্নে লয় স্বপ্নে মৃত স্বপ্নে তয়
স্বপ্নে কত বিভীষিকা স্বপ্নে আফালন
স্বপ্নে শুয়ে হাধা হহ গিরি আরোহন।
একি রহস্ত তোমার
একা খেলা নাহি হয় একা বহু তাই হও
আপন করিত সৃষ্টে আপন বিশ্বয়
‘অন্ত কেহ’ ‘নহি নহি’ আমিই নিশ্চয়।
চক্রেতে চক্রিকা সূর্য্যো দীপিতি যেমন
আমাত্তে আমার মায়া সহজে তেমন।

প্রাকসরুহানেই এই বৈষ্ণব কবি সুলভ ভক্তি রসে অভিষিক্ত হইয়া কবির মনোবৃত্তি গুলি বড়ই শাস্ত ভাব ধারণ করিয়াছে ।

আসিবে না যদি তুমি, কে আসিতে বলে,
ইহাতে পরাণ মম বিত্তল যে জলে ।
নেচে নেচে এস কাছে ধরি শ্রীচরণ
হিয়ার খুইয়া সদা করি নিরীকণ ।
ধীরে ধীরে তুমি যবে আসিছ জনমে,
প্রতি পদ ফেলে পদ উঠিছে ফুটিয়ে ;
মধুগন্ধ লোভে অক কত ভুঙ্গ তায়
পাদ পদ্মে হৃদি পদ্মে গুঞ্জে গুঞ্জে ধায়,
জ্ঞান নীল সরোরুহে সোনার ভ্রমরী
সব ভুলে লাগি রহ দিবস শরীরী ।
আলোল করী তার মুখ শশী তায়,
কণে মেঘ কোলে চান ভাসিয়া বেড়ার ।
তোমার মধুর রূপ কি বলিব আমি,
হিয়ার খুইয়া পদ না পাড়ালে তুমি,
শিব চক্ষে আঁখি খুয়ে সেই আঁখি নিয়ে—
চাহিলে তোমার পানে কি আসে ভাসিয়ে ।

কবি আবার বলিতেছেন—

না বুঝে বেসেছি ভাল গোলাপ তোমার
মূলেই আমার কুল তুমি যে স্বর্গের কুল
অমৃত স্বরূপ তুমি এ মরু ধরায় ।
নন্দর জড়ের সনে হয় কি সাধন বিনে
দেবতার সম্মিলন কখন হেথায় ।

আবার—

শূন্নে শূন্নে সম্ভাষণ শূন্নে শূন্নে আলিঙ্গন
কেন প্রভু দাসী কিসে অপরাধী পায় ।
শত গাঢ় আলিঙ্গনে চিত্ত ধির নাহি মানে
শূন্ত পরশনে সখে বুক বাধা দায় ।
বালিকা কলিকা কালে পুতুলেরে সব বলে
স্বামী পেলে আপনিই মাটি ভুলে যায় ।
ইঞ্জির পাগল হয়ে ছুটেচে যে তোমা লরে
তধু ঘুম ঘোর দিয়া ফিরাবে তাহার ?
এক বার কাছে এসে ডাক নাথ হেসে হেসে
• তুমিই আমার প্রিয় সাধনার ফল ।
সিকি ফল হাতে পেয়ে কাঁদি গো আপনা খেয়ে
অবলার অপরাধ নাহি ধর ছল ।

অবলা অলপ মতি যদিও চঞ্চল অতি
খির কর প্রাণেশ্বর মরি ঘাতনায় ।

ঐপদ মস্তকে রাখি সব যেন ভুলে থাকি
বড়ই শীতল প্রভু চরণ তোমার ।

প্রাণের ঈশ্বর তুমি বড় অবিখ্যাতী আমি
আমি দাসী অপরাধী ভুলারো না আর ।

আবার— (তুমি) গোপতে গোপতে ফের সাত্তে সাত্তে
গোপনে কেনবা সাধন কর,

নিদাষ অনলে মুখানি বামিলে
কেন বায়ু তুলে ব্যঞ্জন কর ।

নমঃ প্রাণাধার বলি শত বার
গোপনে পড়িব আমি যবে পার,

(তুমি) গোপনে হাসিবে আমাকে দেখাবে
তোমারি একপ রূপ সমুদয় ।

আবার— অধরে টিপিয়া হাসি ঝাড়াল শশাক আসি
অঁটিয়া পড়িল ধরা ঘোছনা বসন ।

হাসিত বদনে নাথ ধরিয়া আমার হাত
কহিল বলত দেবি ! কে বেশি হৃদয়,

কত স্নেহ দরা তার কতবা বলিব আর
আমা হতে কোটিগুণে সে যে গো কাতর ।

রাখিছাছে মোরে দূরে একথা না মনে ধরে
অথবা কঠিন আজি আপনা উপর ।

ইত্যাদি :—

“গুহং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে” হুই চারিটি স্থানে না আছে তা নয় এবং বর্ণাঙ্কি আছে বহু। তবে “অল্লোহি দোষো গুণসন্নিপাতে। নিমজ্জতীন্দ্রোঃ কিরণে দিবাক্ঃ” মিলটন ও কালিদাসের জ্ঞার মহাকবিও ভাব ও ভাবার সামঞ্জস্য সর্বত্র রক্ষা করিতে পারেন নাই। মিলটনের পারাডাইস লষ্টের প্রথম দুই সর্গের সহিত তুলনা করিলে শেষ সর্গত্রয় অনেক পরিমাণে নীরস বলিয়া মনে হইবে; কুমারের দার্শনিক তব সম্বলিত শ্লোকগুলিতে ভাব ও ভাবার বড় একটা মিলন দেখিতে পাওয়া যায় না। এতাবতাদর্শনের গূঢ় ভাব সমূহের সহিত ভাবার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চমৎকারিতা ও মধুরিমার সৃষ্টি করিতে বোধহয় কেবলমাত্র ভগবান শঙ্করাচার্য্যই অত্র পর্য্যন্ত এদেশের ঐতিহাসিক ভ্রমতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

কবি হিন্দু ও সাধক । বাহিরে শত প্রকারের কঠোরতা সত্ত্বেও হিন্দুর সাধনা কবিভাষ্যময়ী । তুলভাবে ধরিলে হিন্দুর সাধনাকে তিনভাগে বিভক্ত করা যাউতে পারে । এই ত্রিধারার অপূর্ণ সম্মিলনে সাধকের চিত্তশুদ্ধি নিশ্চয় হয় । গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতীর সম্মেলের গ্রাঘ বা সহস্রার ছত্রতলে ইচ্ছা পিঙ্গলা ও অমৃতার বিশ্রাম ভূমির গ্রাঘ এই ত্রিধারা বিধোত সাধকের হৃদয় মৰ্শণ বড়ইনির্ভল, বড়ই পবিত্র । এই শ্রেণীর কবিতা উচ্ছৃঙ্খলতা বা চিত্তবিকার হইতে উৎপন্ন হয়না । সংযম ইহার মূল এবং সাবিকতা ইহার প্রাণ । “অনোরনীয়ান্ মহতো মণীয়ান্” চিদানন্দগণ একমেবাদ্বিতীয়ংই আধ্যাত্মানুগণের উপাস্ত । কিন্তু সেই “এক” কিরূপে অর্জন্যরীতির সাধনে, কিরূপেই বা বিচিত্র নীলানরী বিশ্বসৃষ্টি ধারণ করেন, তঁহা উপলব্ধি করা হিন্দুর এক প্রকারের সাধনা । ইহার নাম সৃষ্টিক্রম । দ্বিতীয় প্রকারের সাধনা—কিরূপে বহুরূপ এক হইয়া যায়, একেই লীন হইয়া যায়; ইহার নাম সংহারক্রম । তৃতীয় প্রকারের সাধনা সাত্ত্ব অনন্ত প্রবণতা । হিন্দুর অমৃতাগের বথরা হয়না । যেমন সাত্ত্ব অমৃতাগ বাড়িতে লাগিল, সাত্ত্ব তেমন অনন্ত হইতে লাগিল । সাত্ত্ব প্রাণ তত্ত্ব হইতেছে আর তাহার নিকট অনন্ত সৌন্দর্য্য, অনন্ত সুখমা, অনন্ত বিলাস সামগ্রী বলি পড়িতেছে । কবি বলিতেছেন—“সাত্ত্ব বিশ্বরূপ মরি কেমন স্থলর !” এই ভাবেই বিভোর হইয়া শঙ্করাচার্য্য ভবান্নবটকে “গতিঃ গতিঃ স্বমেকাশ্বানি” ইত্যাদি স্তবের অমৃতগহ্বরী তুলিয়াছিলেন । সাধকের হৃদয়পটে “মূলে কল্পতরোস্ত্রিতঙ্গলিতম্” ভাব জাগিয়া উঠিল । কবি সত্যসত্যই শব্দব্রজবিজড়িত পরব্রজ প্রত্যক্ষ করিলেন !

প্রণব সম্পূট করি দাঁড়াও যখন

রূপের ছটার ভাসে সকল ভুবন !

বৃক্ষপত্র অন্তরালে, সুনীল মেঘের কোলে,

সাত্ত্ব বিশ্বরূপ মরি স্থলর কেমন ।

আবার :—

চাহিনা লো বনযুঁই মরিকা মালতী,

চাহিনা লো গন্ধরাজ কুহুম প্রভৃতি,

কি দিব তোমায়ে মূল কি আছে আমার,

দ্বিবার কিছুই নাই যা আছে তোমার,

কোথা পাব প্রাণভরা ভালবাসা রাশি

তোরই আছে তাই সখি তোরে ভালবাসি ।

প্রথম ও দ্বিতীয়োক্ত সাধনার উপরেই বিশেষভাবে কাব্যখানি দণ্ডায়মান । উপহার হইতে উপসংহার পর্য্যন্ত সৰ্ব্বত্রই প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের সাধনার স্পষ্ট বিকাশ পরিলক্ষিত হয় । উপহারে কবি বলিতেছেন—“নয়নে তপন তব নেম সুধাকর” ইত্যাদি । উপসংহারে কবি বলিতেছেন ;—

আমি ত তোমাকে আছি নতুবা কি হব,
 অবোধ বিহগ এত স্বর মধুময়”
 বাহারে বলিছ আমি, সে আমিয়ে নহ তুমি,
 তবুও বৃক্ষিতে নার মারার বিকার,
 অথবা তোমারই সব কর্ম ফের ফার ॥

পরিশেষে বক্তব্য এই যে বাহারী ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের ও ভারতীয় সাধনা-
 তত্ত্বের সহিত কিছু পরিমাণেও পরিচিত নহেন, তাহাদের চিত্ত বহুস্থলেই
 চিত্রপন্দনে স্পন্দিত হইবেন। বলিয়া আমার আশঙ্কা ; অধিকন্তু স্থানে স্থানে
 হাতরসেরও উদ্রেক করিতে পারে। তবে সকলেরই তৃপ্তিপ্রদ হইতে পারে
 এমন কবিতাও অনেক আছে। এক শ্রেণীর লোকের নিকট কবিতাগুলি
 বড়ই অদরের হইবে, বাহারী কবির ভায় সাধনার অভাব বা তাহার পক্ষপাতী।
 বাহারী ভিতরের রসরাজকে বাহিরে সমাজ দেখিয়া এবং বাহিরের বিশ্বমুষ্টি
 ভিতরে টানিয়া লইয়া বড়ই আমল অনুভব করেন, তাহার ইহাতে অনেক
 প্রাণের কথা, জন্মের ভাব ও ভাষা এবং সাধনার উপযোগী বহু ভাবের প্রাঞ্জল
 ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হইবেন। এই কবিতায় কোথাও নিরাশা বা হা-হতাশ নাই,
 অবসাদ বা নাস্তিকতার কর্কশতা নাই।

আর না ডারিহ ঘোনে
 কুহক দূরিত পুরে
 হাসিব কাঁদিব নাথ একা বসি হেথা
 শুন আরাধ্য দেবতা ।
 শুন বা না শুন তুমি, তোমারে সাজায়ে আমি,
 একে একে নিবেদিব মরমের ব্যাথা,
 শুন আরাধ্য দেবতা ।
 থাক ব্যবধান লত, তবু জনমের মত,
 হাবর জন্ম আদি নব পুষ্প লতা,
 শুন আরাধ্য দেবতা ।
 কোথা লুকাইবে আর, আমি জেনেছি এবার,
 এ জন্মে আছ নাথ নিত্য তুমি গীতা,
 শুন আরাধ্য দেবতা ।
 কিছু না করিতে পারি, তোমারে একান্তে স্মরি
 ছাড়িব নব্বর দেহ আমার বিধাতা,
 শুন আরাধ্য দেবতা ।

প্রবন্ধ বিস্তৃত হইয়া গেল। বাহারী এ কবিতা পুস্তকের পরিশুদ্ধ ভাব
 ভোগ করিতে চাহেন, তাহার নিজে নিজে ইহা পাঠ করুন, অলমিতি বিস্তরণ।



উৎসব ।

ও হ্রি আদ্যারামায় নমঃ ।

অষ্টৌব কুর্গ যচ্ছেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিম্যসি ।

স্বগাত্ৰাণ্যপি ভায়ায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে ॥

২য় বর্ষ]

১৩১৪ সাল, ফাল্গুন ।

[১১৭ সংখ্যা]

ও

নমোভবতে বামুদেবায় ।



(১)

সাধনায় প্রলয় ।

অজিন আসনে, করি পদ্মাসন

মুদিলাম দুটা আঁধি ।

ভাবের সাগরে, ডুবিলাম ধীরে

গুরুপদে মতি রাধি ॥

ভাবিতে ভাবিতে, কত দেশে যাই

কত কি নয়নে ভাসে ।

বলিবারে চাই, বলিতে না পারি

ভাষায় নাহিক আসে ॥

বিশ্লেষণ রহিত, ক্রমে হয় চিত্ত

প্রশান্ত হইল মন ।

প্রলয়ের ছবি, মানস আকাশে
 করিলাম নিরীক্ষণ—
 চমকে চপলা, যেথ জ্যোতি ভাসে
 গরজে জলদ সঘনে ।
 খসিছে উলকা, কাঁপিছে মেদিনী
 ছুটিছে অশনি পবনে ॥
 শুকাল তটিনী, শুকাল সাগর
 ভূধর লুকাল পাভালে ।
 চন্দ্রস্বৰ্ণা তারা, পড়িল খসিয়া
 নভস্থল হ'তে ভূতলে ॥
 কিস্তি অভ্রানে, ঘর বাড়ী পড়ে
 বৃক্ষে বৃক্ষ পড়ে ভাঙ্গিয়া ।
 আকাশ পৃথিবী, বন অন্ধকারে
 ক্রমে গেল সব ডুবিয়া ॥
 আবার কোথাও, ধূমরাশি সনে
 উগারিছে গিরি অনলে ।
 সে অনল রাশি, আলা মালা লরে
 দগ্ধীভূত করে সকলে ॥
 ছোট থেকে বড়, সকলই গ্রাসিল
 দেখিছ আপন নরনে ।
 ভূচর খেচর, পুড়ে হ'ল ছাই
 মহাপ্রলয়ের আগুনে ॥
 ছিল ঘাহা স্থল, ক্রমে হ'ল হুস্ক
 অণু পরমাণু হল ।
 মাত্রা অহঙ্কারে, অহং মহতে
 মহৎ প্রধানে গেল ॥
 শেষেতে দেখিছ, অপকূপ দৃষ্টি—
 প্রকৃতি পুরুষে লয় ।
 বাকি কিছু নাই, কেবল প্রণব
 দেও প্রণবের অর ॥

(২)

কূটস্থে জীব ব্রহ্ম ।

স্বপ্না সুরাইল, পরাবস্থা এল
 বাতাস নিচল হ'ল ।
 দেখিছ নয়নে, সুনীল গগনে
 চাঁদের বিমল আলো ॥
 আকাশের নীল, ঘনীভূত হল
 বাড়ীল চাঁদের জ্যোতি ।
 স্পন্দন সুরাল, আবেগ ঝামিল
 নিরোধ হইল গতি ॥
 মনপ্রাণ ভরি, চাঁদ পানে হেরি
 পলক পড়েনা চখে ।
 উদিল অন্তরে আনন্দ অপার
 কেমনে প্রকাশি যুখে ॥
 দেখিতে দেখিতে, চাঁদ হ'রে গেছ
 তজ্জার আবেশ এ'ল ।
 ভুলিছ আপনি, এ চাঁদ অমনি
 ওচাঁদে মিশারে গেল ॥

ক্রীড়শান চন্দ্র ঘোষ,
 মেদিনী পুর ।

কর্মযুগ ।

এই কলিযুগে সকলেই 'কর্ম কর' 'কর্ম কর' এই উপদেশ প্রদান করেন ।
 এ যুগে প্রায় মনুষ্যই কর্মের উপরের অবস্থা ধারণা করিতে পারে না । কর্ম
 শূন্য অবস্থা বাহাদের, বাহারা যথা প্রাপ্ত কর্ম প্রাপ্ত হইলে স্পন্দিত হইবেন,
 আবার পরকণ্ঠেই শাস্ত হইয়া যান—ইহাদিগকে লোকে বুঝিতে পারেনা—যোগী,
 ধ্যানী সমাধীস্থ ব্যক্তিকে এ কালে লোকে স্বার্থপর বলে—বলে পৃথিবী
 ভুবিয়া বাইতেছে আর উহার সমাধি স্থখে মগ্ন আছেন—এই বজ্রদ্বা খুণা করে—

আজ কালকার এই দারুণ অবস্থার সমালোচনা আমরা করিতেছিলাম—এ সমালোচনার ফল নাই। আমরাও বলি এস বাহারা কর্ম সঙ্গী তাহার। কর্মই কর। কিন্তু যে গীতাকে নক্ষোক্ত স্থান দিতেছে—এস গীতার উপদেশ মত বেক্রমে কর্ম করিতে হইবে তাহা শিখিয়া কর্ম করি।

গীতা বলিতেছেন “যা কলেবু কদাচন”।

অর্থাৎ কর্মকর কিন্তু কলাকাজ্ঞা শূন্য হইয়া কর্ম কর; কলাকাজ্ঞা শূন্য হইয়া কর্ম করিতে হইবে। এ কথাটা কি বুঝিতে চেষ্টা করা হইয়াছে, না কর্ম করিয়া একবার মুখে মাত্র বলা হইতেছে ইদং কর্ম ফলং শ্রীকৃষ্ণার অর্পণ মন্ত। ভগবান নিজে বলিতেছেন কি লৌকিক কি বৈদিক সকল কর্মই আমাতে অর্পণ কর। “যং করোষি-বদন্তাসি যজুহোষি দদাসি যৎ। যৎ তপন্তসি কোন্তেয়! তৎকুরুষ মদর্পণম্ ॥ “করোষি” “অন্তাসি” অর্থাৎ করা খাওয়া ইত্যাদি কর্ম লৌকিক। আর “জুহোষি,” “দদাসি,” “তপন্তসি” অর্থাৎ যজ্ঞ, দান, তপস্তা ইত্যাদি কর্ম বৈদিক। এই সমস্ত কর্ম ভগবানে অর্পণ করিতে হইবে। মনে করা হউক আহা করিতেছে—এখন এই অন্নবান্ধনাদি ভগবানকে অর্পণ করা হইল। আহায়ে বসিবার পূর্বে অন্ন ব্রহ্মা, রস বিষ্ণু এবং ভোক্তা দেবমহেশ্বরঃ ইহা বলা হইল অথবা ভগবানকে ডাকিয়া বলা হইল শ্রীকৃষ্ণার অর্পণমন্ত। এখন কথা হইতেছে যদি কোন ব্যক্তির লবণ বেশী হয় বা আদৌ লবণ না দেওয়া থাকে তবে একবারে এত ক্রোধ হয় কেন? কেন বলা হয় আঃ ইহারা আমাকে প্রাণে মারিতে বসিয়াছে—এমন করিয়া কি খাওয়া যায়? অথবা ভাতের খাল ফেলিয়া দিয়া ভয়ানক তর্জ্জন গর্জ্জন আরম্ভ হয়। এ কিরূপ শ্রীকৃষ্ণার্পণ? যদি তাঁহাকেই সমস্ত অর্পণ করা হইল তবে নুন খাল লাগিতে হয় ত শ্রীকৃষ্ণকেই লাগুক—আমার লাগিবার ত কোন কথা নাই—আর একটু না হয় লাগিল সেই সময় না হয় কাতর ভাবে শ্রীকৃষ্ণ অন্ন হউক—বলা হউক প্রভু আমার স্নেহ হুঃখ অহুভব হয় কেন? তোমাকে কর্ম ফল অর্পণ করিলাম তথাপি আমার যখন স্নেহ হুঃখ বোধ হইতেছে তখন ত আমার অর্পণ হয় নাই। প্রহ্লাদ বিধ অর্পণ করিয়াছিলেন সে বিষণ্ড প্রাণ সংহার করিতে পারে নাই তোমাতে অর্পিত হইয়াছিল বলিয়া—আমার যে একটুতেই এত গরগরানি হইতেছে—হে প্রভু আমি ত অর্পণ করিতে পারিলাম না—তুমি নক্তি নাও বাহা—আমি সৰ্ব্ব কর্ম তোমাতে অর্পণ করিতে পারি—এই ভাবে না

হয় প্রতি এগাদে ভগবানের নাম ঘন ঘন উচ্চারিত হউক। ইহা অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমে প্রকৃত অর্পণ হইতে পারে। সকল কন্দই ভগবানকে প্রতিফলন দ্বারা করিতে করিতে করিতে হইবে—মন, ভগবানকে প্রতিফল ডাকিবে আর হাতে পায় মুখে কাণী হইবে; এইরূপে না কন্দ ভগবানে অর্পিত হইতে পারে? কিন্তু তোমার কন্দাৰ্পণ কিরূপ, যখন তুমি ভাব নিজের দ্বারা প্রকৃত ত কিছুই করিতেছি না দেশের জন্য দেশের জন্য করিতেছি আমার কন্দ ত নিকাম। এই কি তোমার কলাকাজ্ঞা রহিত হইয়া কন্দ করা? যদি কন্দটি তোমার সকল না হয় এবং তৎক্ষণাৎ তুমি নিতান্ত হুঃখিতও হও তথাপি কি বলিতে হইবে তুমি দেশের কন্দ দেশের কন্দ কলাকাজ্ঞা রহিত হইয়া, ঈশ্বর প্রীতি প্রকৃত অহং কর্তা এই অভিমান ত্যাগ করিয়া করিতেছ? সুখ হুঃখে সমে কদা লাভালাভো জয়াজযো—সুখ হুঃখ, লাভ অলাভ, জয় পরাজয় সমান হইয়া তুমি কন্দ করিতেছ?

সর্বদা ভগবানের নাম, অবসর মত ধ্যান, জপ, পূজা এ সমস্ত অভ্যাস না করিলে কি শ্রীকৃষ্ণার্পণ অভ্যাস হইতে পারে? সর্বদা ভগবৎ ভাব লইয়া না থাকিলে কি প্রবাহ পতিত মত কন্দ হয়? না নিকাম কন্দ হয়? জ্ঞানী বলা প্রাপ্ত কন্দে স্পন্দিত হয়েন—তিনি বৃক্ষের মত শুক্লই থাকেন—বায়ু সকালনে বৃক্ষের স্পন্দনের মত স্পন্দিত হয়েন আবার পরক্ষণেই আপন নিস্পন্দ অবস্থায় বৃক্ষমত শুক্ল থাকেন। হইল, ইহা না হয় জ্ঞানীর পক্ষে তুমি বলিতেছ তুমি কন্দী—তুমি ঈশ্বরের আজ্ঞামত কন্দ করিতেছ? ঈশ্বরের আজ্ঞামত কন্দ করার কি এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে জপ, ধ্যান, সন্ধ্যা, পূজা প্রভৃতি বর্ণাশ্রম মত কন্দ বিসর্জন দিতে হইবে—ব্রাহ্মণেরা সন্ধ্যা আত্মিক বাদ দিয়া দেশের দেশের কার্য ঈশ্বর আজ্ঞামত করিবে? ইহাতে কি এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে সন্ধ্যা বন্দনাদি কন্দ, বুদ্ধাদি কন্দ, বাণিজ্যাদি কন্দ, সেবাদি কন্দ—ঈশ্বর দ্বারা বাদ দিয়া, গোলমাল করিয়া, অধিকারী বিচার না করিয়া করিতে হইবে? এ কিরূপ ঈশ্বর আজ্ঞা মত কন্দ করা?

যদি বল সব একাকার হইয়া গিয়াছে সকলে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য; পুত্র কেহ নাই—তাহা হইলেও কি বৈশ্য ক্ষত্রিয় সন্ধ্যা বন্দন বাদ দিবে? ভগবান ক্ষত্রিয় হইয়া অবতার গ্রহণ করিলে নিজে আচরণ করিয়া কি শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন? রামকৃষ্ণও কি ত্রিসন্ধ্যা বাদ দিয়া দেশের দেশের কন্দ কখন করিয়াছেন? ব্যভিচারকেও কি ধর্ম বলিতে হইবে? সদাচার,

সাধিক আহাৰ ইত্যাদি কি ধৰ্ম্মৰ প্ৰধান ভিত্তি নহে ? তবে যথেষ্ট আহাৰ
 দিহাৰ কৰিয়াও ভগবানের আজ্ঞা পালন হইল কিরূপে ? ভগবান বলিতেছেন
 শরীর, মন ও বাক্যকে যথাশাস্ত্ৰ স্পন্দিত করিতে হইবে তবে “যোগস্থ কুরু কন্মাণি”
 হইবে। শরীর মন ও বাক্যকে যথেষ্টাচারে স্পন্দিত কৰিয়াও কি বলিতে
 হইবে তুমি ঈশ্বর আজ্ঞা পালন করিতেছ ? তুমি গীতার উপদেশ মত নিষ্কাম
 কৰ্ম্ম করিতেছ ? একবার কি বিচাৰ করা হইতেছে তুমি শিদ্ধি ও অশিদ্ধিতে
 সমান কিনা ? একবার কি আত্ম পরীক্ষা করা হইয়াছে তোমার অহুতি
 লৌকিক বা বৈদিক কৰ্ম্ম প্ৰচাৰ দেখিয়া লোকে যদি অনাদর করে, তবে তোমার
 দুঃখ হয় কিনা ? যদি লোকে ভাল বলে তবে তোমার হৰ্ষ হয় কিনা ? যদি
 কৰ্ম্ম কৰিয়া তুমি সুখ বা দুঃখ পাও যদি কৰ্ম্মের ফল দেখিয়া তুমি হৰ্ষ বিবাদ
 প্ৰাপ্ত হও তবুও কি বলিতে হইবে তুমি গীতার উপদেশ মত নিষ্কাম কৰ্ম্ম
 করিতেছ ? তুমি অহং জ্ঞান বৰ্জিত হইয়া কৰ্ম্ম করিতেছ ? তোমার ঈশ্বর
 প্ৰীতিতেই লক্ষ্য কেহ ভাল বলিল বা মন্দ বলিল সে দিকে তোমার দৃষ্টি
 নাই ? তোমার শিষ্য যদি কেহ ভাঙ্গাইয়া লয় আর তাহাতে যদি তোমার
 ক্ৰোধ বা দুঃখ হয় তবে তোমার কৰ্ম্ম নিষ্কাম কিরূপে ? এস এস একবার আত্ম-
 পরীক্ষা কর ; কৰিয়া গীতার ধৰ্ম্ম প্ৰতিপালন কর। এস এস একবার কাতর
 প্ৰাণে ভগবানের কাছে প্ৰাৰ্থনা কর ভগবান ! তোমার দাস হইয়া তোমার
 আজ্ঞা মত নিষ্কাম কৰ্ম্ম করিতে চাই—কিন্তু আমি মুৰ্খ আমি পাৰি না। আমি
 প্ৰাণ পণ করিতেছি তুমি শক্তি দিয়া আমার কৰ্ম্ম নিষ্পন্ন কৰিয়া দাও।
 আমি তোমারই দাস বা দাসী আমি বেন প্ৰতিপক্ষে তোমার নাম করিতে
 করিতে সকল কৰ্ম্ম করিতে পাৰি। সৰ্ব্বদাই বেন মনে তোমার নাম ধ্যান
 করি—আর হাত পা দিয়া কৰ্ম্ম করিতে পাৰি হে ভগবান আমার সৰ্ব্ব কৰ্ম্ম
 বেন তোমাতে অৰ্পিত হয়। এস ইহা দীৰ্ঘকাল ধৰিয়া অভ্যাগ করি আমা-
 দের শুভ হইবে।

— . —

প্রবাহ ।

“প্রবাহ” একখানি কবিতা পুস্তক । ত্রিযতী সরলা বাংলা প্রণীত । সমালোচনার জন্ত ইহা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি । ভিতর বাহির উভয় দিকেই পুস্তক খানি সুন্দর । কবি ও সাহিত্য জগতে পরিচিত । স্রী লোকের লেখা হইলেও ইহাতে অগ্রাহ্য করিবার অতি অল্পই আছে বলিলেও অত্যাক্তি হয় না । প্রায় সকল কবিতাতেই একটা অন্ত্যাহত প্রবাহ আছে ।

অথপি এই শ্রেণীর পুস্তক লেখা সহজ সমালোচনা করা কঠিন । মনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা—ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক দৃষ্টে যখন বাহার সুরণ হইয়াছে কবি তাহাই কবিতা বদ্ধ করিয়াছেন । অন্ততলে একটি মূল প্রবাহ থাকিলেও নানা বিষয়িণী কবিতা ওলির ভাব মূল ভাবকে কিরূপে পরিপুষ্ট করিতেছে ইহা দেখাইতে সমালোচককে বিশেষ বেগ পাইতে হয় । এ ক্ষেত্রে সমস্ত কবিতার সমালোচনা না করিয়া যে মন হইতে “প্রবাহ” ছুটিয়াছে তাহার গতি নিশ্চয় করিলে সমালোচকের কার্য কিছু সহজ হয় । আমরা প্রথমেই মনের বিভিন্ন গতি নির্দেশ করিতেছি । পরে কবিতায় যাহা ছুটিয়াছে দেখাইব ।

জীবন মরণের খেলা লইয়াই মনের বিলাস । কোন মনের গতি অনন্ত জীবনের দিকে; কোন মনের প্রবাহ অনন্ত মরণের পথে ; কোন মন বা মরণ পথের আপাত মধুর স্বথগন্ধি প্রেতারণা বৃত্তিতে পারিয়া অনন্ত জীবনের পথে অগ্রসর হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করে । যেখানে ইচ্ছা থাকে অথচ শক্তির অভাব সেখানে মনকে মরণের দ্বন্দ্ব প্রবাহেই ভাসিয়া বাইতে হয় । এইরূপ মনও সময়ে সময়ে দ্বন্দ্বের গুরুভার সহ্য করিতে না পারিয়া দ্বন্দ্ব অতিক্রম জন্ত প্রবল পুরুষার্থ প্রয়োগ করে । কিন্তু সংস্কৃত ও লংশাস্ত্র অবলম্বন ভিন্ন এরূপ মনে একটানা ভাব প্রায় থাকে না । বিচার, সম্যক পরিপুষ্ট নয় বলিয়া ইহাদিগকে বহু ক্রমে প্রায়ক ভোগ করিতেও হয় । মনের এই তিনটি গতির নাম উর্দ্ধগতি, অধোগতি এবং মিশ্রগতি ।

যাঁহাদের গতি নিরন্তর কল্যাণ পথে তাঁহারা ঋষি, সিদ্ধ পুরুষ, জ্ঞানী, ভক্ত বা ঘোষী । যাঁহাদের গতি নিরন্তর অকল্যাণ পথে বা বিবর মুখে তাঁহারা ক্রম অহুসারে অল্পে অল্পে মলুষ্য হইতে পণ্ডতে, পণ্ড হইতে পক্ষীতে পক্ষী হইতে বৃক্ষ লতাশিত্তে ও তপা হইতে স্বাবরাদি জড় ভাবে পরিণত হইতেছে—

অগ্নে অগ্নে ইহাদের চেতন অংশ জড় ভাবে আচ্ছন্ন হয় শেষে চৈতন্য একেবারে অচেতন ক্রোড়ীভূত হইয়া পড়ে ।

বাহাদুরের গতি মিশ্র পথে তাঁহার। পুনঃ পুনঃ ক্ষিপ্ত মুঢ় বিক্ষিপ্ত অবস্থায় নিম্পেষিত হইয়া সংকল্প ও সংশয় অবলম্বনে নিজের হৃৎকের অবস্থা অতিক্রম করিতে পারেন ; নতুবা ইহাদিগকে ও বহু বোমিতে গতাগতি করিতে হয় ।

‘প্রবাহে’ কোন শ্রেণীর মনের গতি পরিলক্ষিত হইতেছে আমরা ক্রমে দেখাইতেছি ।

‘প্রবাহ’ চারিটি প্রোতের সমষ্টি । প্রথমটি উৎসর্গ বা মূলপ্রবাহ দ্বিতীয়টি জীবন প্রভাত তৃতীয়টি যৌবন মধ্যাহ্ন শেষটি সন্ধ্যা । বয়স অনুসারে এ বিভাগ হয় নাই, বিভাগ হইয়াছে একটি অবস্থারই প্রভাত বা প্রথম অবস্থা মধ্যাহ্ন বা মধ্য অবস্থা সন্ধ্যা বা শেষ অবস্থা লইয়া । সকল কবিতাগুলি স্ব স্ব বিভাগে পড়ে নাই । কবি চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু ষণ্ড ষণ্ড মনের ভাবকে মূল প্রবাহে ফেলিয়া ঠিক ঠিক বিভাগ করা এ ক্ষেত্রে একরূপ অসম্ভব । এই জন্ত বলিতেছিলাম বিভাগটি নির্দোষ হয় নাই ।

ভাব ও ভাষা লইয়াই কবিতা । এই কবিতা গ্রন্থের বিশেষত্ব ভাব । ভাষার আড়ম্বর বড় একটা নাই । সরল ভাষায় স্নদরের ভাব প্রকাশে কবির বিলক্ষণ পারদর্শিতা দৃষ্ট হয় । সরলতাই কবির বিশেষ প্রশংসার সামগ্রী ।

‘কোথা’ হ’তে’, ভাল ক’রে বল, আর একবার ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাগুলি ইহার নিদর্শন ।

কবি হৃদয়ে অন্তর্লীন একটি বাখা আছে । কবি সুখ হৃৎকের বিলাপে বলিতেছেন—

হৃৎ বল মুছি আঁখি বারি—
 হৃৎ হ’রে জন্মিলাম যদি,
 এক জন ব্যথার ব্যথিত
 কেন মোরে নাহি দিল বিধি ?
 নীরবেতে একেলা একেলা
 নিশিদিন কানিয়া কাটাই
 মুছাইতে নয়নের বারি
 এ অগতে কেহ মোর নাই ।

আজ বাবহারিক জগতের কত লোকই এই কথা বলিয়া বিলাপ করে।
আগন্তিক দৃষ্টিতে কথা শুনি বড়ই সত্য। এ জগতের সকল দুঃখই আনন্দে
সম্বৎ করা যায় যদি কেহ চক্ষের জল মুছাইবার থাকে। লোকে দ্বিজ্ঞানসা
করিতে পারে, শিশু মাতা ভাই বোন আত্মীয় কুটুম্ব কেহ কি এই ব্যথা
মুছাইয়া দিতে পারে না ?

আমরা বলি—বুঝি পারে না। পারে এক জন—আর সে যারে অমুগ্ধ
করে বুঝি সেও পারে। কিন্তু ভাল করিয়া বুঝিলে বুঝায়—এই দুঃখ ও সে
আপনি। দুঃখ রূপে তিনিই দেখা দেন, আর নয়ন জল মুছাইতে ও তিনি।
আর এই অন্তর্লীন গূঢ় ব্যথা বাহ্যিক তিনি মুছিয়া দিয়াছেন, তাহারই সর্বদুঃখ
নিবৃত্তি হইয়াছে। সে তখন আর তাঁহার ঘোরা মূর্তি দেখেনা—দেখে অব্যর্থ
মূর্তি, যে মূর্তি নিত্য, সদা আনন্দ ময়, সদা মধুময়।

কিরূপে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে? কবি উৎসর্গে বাহ্য লিখিয়াছেন
তাঁহাতে তাঁহার সাধনার কথাই প্রকাশিত হইয়াছে।

পুস্তক খানি “মা”কে উৎসর্গ করা হইয়াছে। মাই কবির অবলম্বন যদিও
মা কবির বিশ্রাম নহে। মার প্রতি বিশেষণটি ভালবাসা মাথা।

“সমতার প্রতিমা আমার
প্রীতিময়ি স্মৃতিময়ি উৎস করণার
স্নেহময়ি জননি আমার”
দীপ্তিময়ি, জ্যোতির্ময়ি জননি আমার
ববিচ্ছবি রূপিনি আমার ।”

মাই কবির গুরু। জননীই ঐব তারা রূপিনী। সমস্ত পুস্তকেই মার
কথা আছে—মার আদর আছে—মার কাছে হা হতাশ আছে—মার কাছে
প্রার্থনা আছে। কবি এক দিন জননীর স্নেহভরা চক্ষে চক্ষু স্থাপন করিয়া-
ছিলেন—আজ স্মৃতিতে তাহাই করিতে হয়—ইহাই ধ্যান। হৃদয় দীপ্তিচূর্ণ
দেখিয়া মার আঁধি মনে পড়ে, বর্ষার স্নান শব্দ দেখিয়া মার করুণ-নয়ন
স্মৃতিতে ভালে, কোলাগরে পৃথিবীর সহিত জ্যোৎস্নার মিলন দেখিয়া মার
স্নেহ জাগে। আমার সহিত জগত জীবকে দুঃখ ভারে বাধিত দেখিয়া মাকে-
ডাকিতে হয়—আমার শক্তি নাই—তুমি সর্বশক্তিময়ী-তাই বলি

ভূবে যায় বুঝি জগত সংসার

মা আমার রক্ষা কর রক্ষা কর তারে ॥

কি হ্রদর ভাব ! সমস্ত বিশেষণের ব্যাখ্যা আমরা করিব না, একটি সংযো-
ধনের কথা বলিব। প্রীতিময়ি, স্নেহময়ি, মমতার প্রতিমা, বুঝিলাম কিন্তু
স্বতিময়ি কি ?

দেখিতে সাধ যায় কেন ? অনেকবার দেখিয়াও দেখা হয় না কেন ?
অনেক কথা কহিয়াও কথা কওয়া হয় না কেন ? স্বতিময়ি—ইহার একমাত্র
উত্তর। প্রচুর অর্থে মরুট প্রত্যয় হয়। কিসের স্বতি তাঁহাতে প্রচুর ?
কিসের তাহাত জানি না—যেন কোথার কবে কত লুপ্ত ভোগ করিয়াছিলাম,
কত আনন্দে ছিলাম—যাহাকে ভালবাসি তাঁহাতে যেন কত জানা অজানা
আনন্দের প্রাচুর্য আছে—ইহা লোক, লোকান্তরের কত স্বতি জড়ান যেন সেই
নাম। বড় মধুর এই সংযোজন, বড় ভাব ব্যঞ্জক এই বিশেষণ।

“মনে রেখো” কবিতার কবি লিখিতেছেন

মনে রেখো এ জীবনে

গড়িয়া তুলিতে হবে

জ্বর এক নবীন জীবন।

এ ক্র গঠনে নাই

বিধাতার অধিকার

সব ভার তোমার উপর।

কুৎসিত করিলে তারে

কুৎসিত করিতে পার

পার তারে করিতে হ্রদর।

এই বিচার দ্বারা কল্যাণ পথ বাহিনী বুঝির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাই
শাস্ত্র সিন্ধু। মানুষ যতই হীন অবস্থার আত্মক না কেন পুরুষার্থ করিবার
শক্তি সকলেরই আছে। প্রকৃত কথা—ভগবান কখন কোন জীবকে ত্যাগ
করেন না—পুরুষার্থ রূপে তিনি সকল জীবের সঙ্গে সর্জন আছেন। হরুঁল
অবিস্বাসী হ্রদরই দৈবমুখাপেক্ষী। এ জীবন গঠন সকলেরই আয়ত্তাধীন।

কবি বলিতেছেন—

যতনে গঠন কর

আপনারে আজি হ’তে

মিলনের সে দিন ভাবিয়া

সে দিন তাঁদের সনে

যেন গো মিলিতে পার

ধরা হ’তে হ্রদর হইয়া।

শত গুণে পড়—শত বাধা পাও, মনে রাখিও এই দুঃখের সংসার হইতে
অন্মর হইয়া তোমার বাইতে হইবে, নির্মল হইয়া তোমার বাইতে হইবে,
পবিত্র হইয়া তোমার বাইতে হইবে। পবিত্র হও, নির্মল হও, বাহ্যকে
পাইবার জন্য তুমি প্রাণান্ত করিতেছ, সেই তখন তোমার কাছে আসিবে,
তোমাকে প্রাপ্ত হইবে তোনাতে উদয় হইবে। প্রতি বলেন “পতির্যব জায়াঃ”
পতি যেমন স্ত্রীকে প্রাপ্ত হয় সেইরূপ, সৈনিক যেমন নিজ অশ্বকে প্রাপ্ত হয়
সেইরূপ, গাভী যেমন বৎসকে প্রাপ্ত হয় সেইরূপ। এ শিক্ষা অপেক্ষা উচ্চ
শিক্ষা আর নাই। এই পবিত্রতার জন্য জগতের জুড়ুটি সহ্য কর—রমনীয়দর্শন-
কে পাইবার জন্য, মিলনের সে দিন ভাবিয়া নন্দনীর গজনা সহ্য কর--বাহ্য-
তে তাহাতে পার রোগ ঘেব ত্যাগ কর—ইহাই নির্মলতা—ইহা প্রাণপণে কর
একজনকে পাইবে বলিয়া—আর অন্য কিছুই আকাঙ্ক্ষা রাখিও না। একটু
জপ, তপ করিয়া যদি ভাব এইত করিলাম, আর লোকের সঙ্গে হা হা হ হ তে
মত্ত হও তবে তোমার প্রিয় মিলিবে না--স্বামী যারে গ্রহণ করে না তার হাসি
বাহির হইবে কিরূপে? আগে সে গ্রহণ করুক, চরণ সেবার অধিকার
প্রদান করুক, তবে ত আনন্দ ফুটিবে। আমরা অধিক বলিব না শুধু বলি
এই উপদেশ জয়ন্তু হউক।

শুভকে শুধু শুক উপদেশ দেওয়া হয় নাই, কবি যাহা আঁকিয়াছেন
তাহাতে উপায়ও আছে।

শক্তি অবলম্বন ভিন্ন রমনীয়দর্শন দীপ্তিভতমের সহিত মিলন হইবে না।
মাই শক্তিরূপিনী। যা ভিন্ন মনের মালিন্য দূর হয় না। বলা হইয়াছে
কবির অবলম্বন মা, কিন্তু মা কবির বিশ্রাম নহে। “চোর ধরা” কবিতাতে

কবি লিখিতেছেন—

গুঞ্জে পাই নাই.

নিজে এসে চোর

দিয়াছে আমারে ধরা

মুখ শতদল

অনিয়া মধুর

হাসি পরিমল ভরা।

তুমি পূর্ণ নাগ

বাহিত তুমিহে

চিত্র আশা চাওয়া নিদি

আগ রতন কুড়ারে

কে যে দিবে গেল

আঁচলে আমার বিধি।

যে মুহূর্তে জীব সাধনা ব্যাধি নির্মল হয় সেই মুহূর্তেই এই চির আশা চাওয়া মিথি আপনি আইসে। আমরাও প্রার্থনা করি—এই অগ্নিকের ভাব স্থায়ী হউক।

ইহা পাইবার জন্তই সংসার—সংসার ভোগের জন্ত নহে, ভোগনিবৃত্তি লাভ হইলেই সৰ্ব্বজ্ঞাননিবৃত্তি।

মাই অবলম্বন কেন? স্বামীই কি সব দিতে পারে না? স্বামী যখন তাই দেন তখন তিনি উভয়ই—নতুবা তিনি কোনটিই নন।

মা ও স্বামী দুটি ধরিলে বলিতে হইবে ইহাদের পার্থক্য আছে। মল-লুলিত শিশু যখন চীৎকার করে, মাই তখন ছুটিয়া আসিয়া কোলে তুলিয়া লন—পবিত্রতা অপবিত্রতা বিচার করেন না। বন্ধে ধরিয়া শিশুকে শুদ্ধ করিয়া লয়েন। আর স্বামী! স্বামী ব্যতিচার সহ করেন না। জীব ব্যতিচার স্বামী আদৌ বরদাস্ত করেন না। হৃদয় নির্মল না হওয়া পর্যন্ত হৃদয়নাথ হৃদয়ে পদার্পণ করেন না। তাই শক্তিময়ীর কাছে শক্তি লইয়া নির্মল হইয়া স্নিপিততমের দর্শনে যাইতে হয়।

এই সংসারের যেখানে শেষ হইয়াছে, যেখান হইতে আবার নিত্য সংসার আরম্ভ হইয়াছে সেই ষানে এক শক্তিময়ী রমণী মূর্তি, এই নারী মূর্তি সাধক কে বলিতেছেন, পার আবার পরাস্ত কর—পথ ছাড়িয়া দিতেছি। না পার মা বলিয়া আমার শরণাপন্ন হও; আমি আমার সন্তানকে কোলে করিয়া সে রাজ্যে মিথ্যা আসি অবোধ সাধক মা বলিতে চায় না—পরাস্ত করিয়া উপরে যাইতে চায়, শেষে অন্তঃসার শূন্য হইয়া ইতোভ্রষ্ট ততো নষ্ট হয়। স্মৃদ্ধি সাধক তাই মা অবলম্বন করেন—আপনাকে শক্তি শূন্য মনে ভাবিয়া, প্রাণ পণে মাত্র নিকট শক্তি ভিক্ষা করিতে করিতে সাধনা করেন—করিয়া যেমন মা তারে নির্মল করেন অমনি সে দেখে হৃদয় বিহারী তাঁরে বন্ধে ধারণ করিয়া আদর করিতে-ছেন। উৎসর্গে—আমরা এই ভাব গুলি পাই—তাই বলিতেছিলাম ইহাই প্রবাহের মূল প্রবাহ।

কবি শুধু যে উদ্দেশ্য ও উপায়ের কথা গুলি উল্লেখ করিয়াছেন তাহা নহে, উপায় লইয়া উদ্দেশ্যে যাইতে হইলে নিরন্তর বাহ্যর প্রয়োজন তাহাও দেখাই-তেছেন। এইটি আত্ম পরীক্ষা। যিনি সাধক অথচ আত্ম পরীক্ষা শূন্য তিনি একটা কৃত্রিম তৃপ্তি লইয়া আছেন। তিনি একটা উপদেশ মত কার্য্য করিয়াই ভাবিতেছেন ইহাতেই আমার সৰ্ব্বকৰ্ম্ম করা হইল। ইহা মূঢ়তা মাত্র।

বাহাকে অবলম্বন করিলাম—যাহা করিতেছি তদ্বারা আমার কি হইল না হইল আমার নিত্য পরীক্ষা কবিত্তে হইবে। এই পুস্তকে আমরা কবির সরল ব্যঙ্গ পরীক্ষা দেখিয়া মুগ্ধ হই।

কবি বলিতেছেন—

বিফল তপস্তা মোর
জীবন সঁপিছ তবু

নিশি জাগি রূপা আরাধন
গড়িবারে নারিছ জীবন।

এখানে ভাব যদি ও কিছু অম্পট তথাপি কবির অভিপ্রায় সহস্র বোধ্য। কতামার জীবন সঁপিলাম অথবা সঁপিবার ইচ্ছা প্রবল, যেমন করিয়া সঁপিলে হয় তাহাও জানি, কিন্তু মনের মত করিয়া গড়িয়া সমর্পণ করিবার সামর্থ্য হইল না—ইচ্ছা আছে শক্তিতে কুলাইল না। কি জানি অনাদি সঞ্চিত কণ্ঠ সংস্কার আমায় আমার মত হইতে দিল না। তবুও আত্ম সমর্পণ করিলাম—আমার সাধা নাই তুমি শক্তি দিয়া করিয়া লও, আমিও প্রাণ পণ করিতেছি।

কেন আমার হয় না ? কবি বলিতেছেন
ওহে নাথ বিশ্বাসী হরি
অবিশ্বাসে শুধু পুড়ে মরি।

সত্যই; হয় না শুধু অবিশ্বাসে। কোন উপায়ে হারী বিশ্বাস হইলেই হয়। কবি অকৃত্রিম ল্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন।

আমার সর্বস্ব বলি রূপা তান করি
তুমি কি হৃদয়ে আছ হৃদয় বিহারি !
লোকে জানে তব দ্বানে সন্ন্যাসিনী আমি
তুমি জান এ অস্তর ওহে অত্যাশী
জানেনা তো কেহ—ত্যাগে কিবা অতিমান,
জানেনা এ উদাসীন্ত শুধু রূপা তান,
লোকে দেখে এ হৃদয় নির্মল নীতল
জানেনা কি বিষ সেখা সংসার গরল।

প্রবন্ধ বাড়িয়া গেল। আমরা সকল কথা বলিতে পারিলাম না বলিয়া
কুটী স্বীকার করিলাম।

উপসংহারে আমাদের জননী ও সহোদরা ভূলা প্রীতিবিদগকে একটা কথা শ্রবণ করাইয়া দিতে ইচ্ছা হয়—প্রাচীন সমালোচকের ইহাও একটা কর্তব্য বলিয়া মনে হয়। আমাদের মা ও সহোদরা ঘাহারা, তাঁহারা অস্ত্রপুত্র চারিণী; এই আমাদের জাতির অসাধারণ ধর্ম। অপর জাতি সাধারণ ধর্ম মাত্র গ্রহণ করিয়াছে—চুরি করিওনা, মিথ্যা কহিওনা ইত্যাদি জীবের সাধারণ ধর্ম। কিন্তু সনাতন, সার্বিক আহোর, অস্ত্রপুত্র অবস্থান, এক কথায় বর্ণশ্রম ধর্ম—জগত ইহার যতই কেন না নিন্দা করুক, সর্বত্রষ্টা স্ববিগণ আমাদের ভারতে এই অসাধারণ ধর্ম দিয়া গিয়াছেন। আহারে যজ্ঞ, শয়নে যজ্ঞ, স্নানে যজ্ঞ, সাধনার যজ্ঞেরত কথাই নাই, ইহা আর কোথাও নাই। আমরা আমাদের মা ও সহোদরাগণকে অস্ত্রপুত্র হইতে বাহিরে যাইতে দেখিলে বাথা পাই। বৃন্দ শরীর অস্ত্রপুত্র রাখিয়া, স্তম্ভ শরীর যদি সবার নিকটে প্রকাশ হয়, তবে কি বাহিরে আসা হয়না? বাহিরে বে বড় ধূলা কাণা, রোদ্র ও পাপ। খণ্ড কবিতার যতদূর অল্পপ্রকাশ হয় গভীর বাহিরে সুলশরীর আনিলেও তত হয় না।

পুত্রক লেখা শতবার কর্তব্য। কবিতাজ্ঞ কৃষ্ণদাস কি পুত্রক লেখেন নাই? নিজের মনকে নিজের হৃদে দেবতার রূপ ত্ত লীলার ময় রাখা—চিত্ত বালককে কখন পুরস্কার, কখন তিরস্কার, কখন তাণ্ডার সহিত কথা, কখন ঈর্ষের সহিত কথা—কখন তাঁহার পরিজন লইয়া সংসদ্র—এই কার্য্যই, মনে হয়, সাধকের কর্তব্য। ইহাদের হৃদয় আছে, ভাব আছে, সাধনা আছে—আর অবস্থাও অস্বাভাবিক তাঁহারা ঈশ্বরিততনের কথা প্রসঙ্গ ক্রমে কহিবেন—কেন? তাঁহাদের শুধু ঐ কথা লইয়াই থাকা উচিত। “তৎকথনং তচ্চিত্তনং অস্তোভ্যং তৎপ্রবোধনম্” ইহাই মহাপুরুষেরা আমাদের উপদেশ করেন। রাম প্রসাদ সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন নিজের উপকারের জন্য—তাই আজ জগৎ তাঁহার সঙ্গীতে এত উপকার পাইতেছে। শুধু কবিতা লেখা ঘাহারা জীবনের কার্য্য মনে করেন না তাঁহাদের নিকট আমরা ইহা প্রার্থনা করিতে পারি। ইহাতে নিজেরও উপকার ঘণেরও উপকার।

আকাশ ।

এই সৰ্বজন দৃষ্ট আকাশ কি ?

মিনি ব্রহ্মকাশমান চিৎস্বরূপ, তিনি যখন শূন্যরূপে অবস্থান করেন তখন সেই শূন্যাবস্থাকেই সৰ্বজন দৃষ্ট আকাশ বলে । ভগবান্ বশিষ্ঠ দেব ইহাই বলেন ।

ঐতি বলেন—“আকাশাহংগুক্রমেণ সৰ্বেষাং বা এতদ্বৃত্তানাং আকাশঃ পরাহরণম্ । সৰ্ব্বাণি হ বা ইমাণি ভূতান্তাকাশাদেব জায়ন্তে । আকাশ এব নীঘন্তে । তন্মাদেব জাতানি জীবন্তি । তন্মাদাকাশজং বীজং বিদ্যাত্” ইত্যাদি । ব্রহ্মের সহিত এই আকাশের তুলনা হয় । ঐতি বলেন আকাশ মেকং সম্পূর্ণঃ কুত্রচিৎশৈব গচ্ছতি । আকাশ শব্দময় । শব্দ হইতেই জগৎ । শব্দ ও ব্রহ্ম । ইহাও ঐতিবাচ্য ।

আকাশের চিন্তা কর জন করিয়াছেন ? সৰ্ব্বদা বিস্ত্রমান, সৰ্ব্বত্র বিস্ত্রমান, সৰ্ব্বব্যাপীৰ ধান আর এমন করিয়া কে ধারণা করিয়া দিতে পারে ?

ধারণা কাহার নাম ? অপরিচ্ছিন্নকে পরিচ্ছিন্নে, অথওকে খণ্ডে ধারণা করিতে হয় । ঐতি বলেন “ও শ্রীশুভঃ সৰ্ব্বকারণ ভূতা শক্তিঃ” শ্রীমাতেশ্বরীই শক্তি । তিনি ত্রিভুবন ব্যাপিনী হইরাও—কখন কুমারী, কখন যুবতী, কখন বৃদ্ধা । আনন্দের ধীশক্তি এই অপরিচ্ছিন্না শ্রীমাতেশ্বরীকে ধারণা করে—ঘটাকাশের উপর মহাকাশ ধৃত হয়—ঐতি বলেন, “দেহ মদাগতে ব্যোমি বাহ্যাকাশং তু ধারয়েৎ । প্রাণে বাহ্যহ্নিনিলাং তদ্বজ্জলনে চাহ্মিমোদরে । তোয়াং তোয়াংশকে ভূমিং ভূমিতাগে মহামুনে” ইত্যাদি ।

তার পর জগতের প্রকৃত স্বরূপ আকাশ কেমন বুঝাইয়া দেয় । আকাশের এক সৰ্ব্বোৰ্ণ স্থানে জীবজন্তু পরিপূর্ণ বৃক্ষ লতা চন্দ্র সূর্য্য সাগর পৰ্ব্বত সমন্বিত এই জগৎ । এক দেশে মাত্র এই সৃষ্টি তরঙ্গ, অন্ত সমস্তই শান্ত । চিৎস্বরূপের এই শান্তাবস্থানই আকাশ । সৃষ্টি, আকাশে গর্ভরূপ নগরীর ভায় । ইহা ইন্দ্রজাল মাত্র । এই হিসাবে তোমার রাজ্যলাভ বা পৃথিবী লাভ পিপীলিকার ভূম্যাদিকাগী হওরা মাত্র ।

প্রবাসী ।

আমি প্রবাসী,
সুদূর পথ প্রবাসী,
সুদূর পানে চাই ।
সুদূর হতে এসেছি—
হেথা, মেলেনা মোর ঠাই ।
ও গো, আমায়ে কেউ চেনে না ।
মরম কথা বোঝেনা,
সুখালে কেহ চাহেনা—...ফিরে যাই ।
আমি প্রবাসী—
হেথা, মেলেনা মোর ঠাই ।
এই গহিন যদি অন্তরালে,
মোর লুকান রহে বত বাধা ।
অমর গীতি বীণার সুরে
বৃহল গাহি উঠে সেথা ।
আমার পরাণ ভাবে
উলসি' উঠে তাই ।
আমি প্রবাসী
হেথা, মেলেনা মোর ঠাই ।
আমার বার্তা আপনার—
হেথায় কেহ নাই ।
সবাই চাছে পরিচর
বাদের পাণে চাই ।
লক্ষ বীথি শুকাবে বার,
কুলের কুঁড়ি ঝরবে হার ।
নিত্য সেই দেশের বেন
হেথায় কিছু নাই ।
আমি প্রবাসী—
হেথা, মেলেনা মোর ঠাই ।



ও হ্রী আস্থারামায় নমঃ ।

অষ্টৌব কুরু যচ্ছ্রয়ো বৃক্ষঃ সন্ কিং করিম্বাসি ।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি নিপর্যায়ৈ ॥

২য় বর্ষ]

১৩১৪ সাল, চৈত্র ।

[১২৭ সংখ্যা]

ও

নমো ভগবতে বাসুদেবায় ।



মানস-পূজা ।

অর্ঘ্য এই ক্ষণের নিম্ন,
তুলিয়া তব হাতে ।
পাশ্ব্য দিহু নয়ন বারি
নুহিয়া কোনও মতে ।
আচমনীর প্রীতি নিম্ন
ছন্দ গীতি ভাষে ।
গন্ধ দিহু স্বপ্ন মোর—
প্রভাত রবি হাসে ।
আসন দিহু বক্ষঃ মোর
মরম সাথে শেতে ।

আমি একা।

বসন দিচ্ছ নীলাবরী
লুনা-আশ চিতে।
জীবন দিচ্ছ পূজার ফল—
আর কি মম আছে ?
আশার ফল এ নিরাশা
রহিল তধু কাছে।

ত্ৰিহস্তি-চন্দ্র চক্রবর্তী।

—(০)—

আমি একা।

‘আমার কেহ নাই’ ‘আমি একা’ এই বলিয়া কত লোক দুঃখ করেন।
আমি দুঃখ করি আমি একা হইতে পারি না বলিয়া।

প্রকৃতি পুরুষ মিলিয়া আমি একা। মনেই আমার প্রকৃতি। আর
আমি পুরুষ, আমার প্রকৃতির স্বামী। আমি জীব বশ হইয়া গিয়াছি।
আমার অভাবও কিছু নাই, দুঃখও কিছু নাই—কেবল জীব জন্ত আমার
দোয়াতি নাই। ইষ্ট চিন্তা সময়েও জীব যে আমায় নানা কথায় কোথায়
আনিয়া ফেলে, আমি তাহাতেই দুঃখ পাই।

জীবন হইয়াছি সত্য কিন্তু মনে জানি আমি জীব বশ নই। এই মনে
জানা কথটা সত্য করিব ইহাই আমার সঙ্কল্প।

মনের বশ আমি নহি—ইহা আমি জানি। সকলেই জানেন। আমি
জীব জন্ত। জীব বাই কল্পক না কেন আমি জন্তাই থাকিব। জীব আমার
মায়াবিনী, বহু মায়ায় সহজানন্দ পুরুষকে জুলাইয়া বশ করিয়া ফেলে—বশ
হইয়া তাবি, একি হইল? আশ্চর্য্য হইয়া বাই কারবার দেখিয়া।

প্রকৃত জন্ত থাকিতে হইলে জীবকে রাজী করিয়া জন্ত থাকিতে হইবে।
জীব বিজ্ঞের ইচ্ছামত চলিলে আমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবে না। জীবকে রাজী
করিয়া আমার চিহ্নিত কোন কার্য্য দিতে হইবে। জীব ঐ কার্য্য করিবে,
আর আমি দেখিব ইহাতেই আমার অন্ন হইবে।

মনে করা হউক জীবকে হরি হরি করিতে রাজী করান গেলে—আর
আমি তাহাই দেখিতে লাগিলাম। ইহাই আমার যথার্থ জন্ত স্বরূপে থাকা।

নতুন জীকে কোন তিহিত স্ত কণ্ঠে নিগুত না রাখিয়া—অর্থাৎ জীকে পূর্ণ
নাড়ায় ব্যভিচার করিতে দিয়া আনি কিছুতেই স্রষ্টা থাকিতে পারি না।
তাই বলা হইল অপকর স্রষ্টাবরূপে অবস্থান ছত। ইহাতেও চিত্তবৃত্তির
একাগতা এবং নিরোধ চাই।

স্রষ্টাই অন্তর্দেব। স্রষ্টা দৃশ্য হইতে সর্বথা পৃথক্। দৃশ্যই প্রকৃতি—দৃশ্যই
মন, আর স্রষ্টা পুরুষ।

তদা “স্রষ্টঃস্বরূপেহনস্থানম্” এই মুখা কথা। চিত্তবৃত্তি নিরোধ হইলে
স্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান হয়।

স্রষ্টা হইয়া থাকা এক কথা, আর স্রষ্টা হইয়া যাওয়া অন্য কথা। প্রকৃতি
আছে, মন আছে আনি তাহার স্রষ্টা ভাবে আছি যদি “স্রষ্টঃস্বরূপে, বস্থানম্”
ইহার এই অর্থ কেহ করেন তবে সেটা নিরোধ নহে একাগতা। কিন্তু স্রষ্টা
যিনি ছিলেন, একাগ্র অবস্থায় তাঁহার স্বরূপে আসিলে প্রকৃতিও থাকেন না।
দেখিতে দেখিতে দেখা যায় না—তখনই স্বরূপে থাকা হয়।

কেহ বলেন যোগদ্বয়ে যে স্রষ্টার কথা বলা হইয়াছে, বেদান্তে তাহার
উপরের কথা বলা হইয়াছে—বেদান্তে স্রষ্টা, দর্শন, দৃশ্য, এই ত্রিপুরি ছাড়াইয়া
এক পরম শাস্ত ভাবে অবস্থান হয়, তাহাই স্রষ্টা পুরুষের বরূপাবস্থান, তাহাই
স্বক ভাবে স্থিতি।

“প্রকৃতের্ভিগম্যস্থানং বিচারয় সদানঘ”। প্রকৃতি হইতে আমি ভিন্ন—
দেখা হইলেই প্রকৃতির লয় হইয়া যায়। আমিই পূর্ণ থাকি। তখন “আমি
এক”। তত্ত্বগ্ৰন্থময়ে আকাশের মত নিম্নে যাহা হইতেছে সমস্তই দেখিতে
হয়। ইহাও ভাল কিন্তু নৃত্য দেখিতে দেখিতে নৃত্য করিয়া ফেলিলে বড়
লজ্জার কথা। শুধু লজ্জা নয় অশেষ দুঃখ। তাই “আমি একা”র আশ্রয়
না হওয়া পর্য্যন্ত মনকে জপে স্পন্দন করাইয়া তাহার স্রষ্টা পাকা ভাল।

—(০)—

১৩১৪ শিবগাত্রি।

স্ত প্রভাত আগিল। স্ত প্রভাত বনিতেছি, কারণ সমস্ত জীবন ধরিয়া
বাহ্য অভ্যাস করিতে হইবে সেই পাথেরটি আজ প্রভাত আপনি আনিয়া দিল।
আনিয়া দিল সত্য, এতদিন ধরিয়া লইয়া আছি সত্য, কিন্তু অনিয়মে তাহা

চলিয়াছে কৈ ? এ শুভ প্রভাত কি বলিয়াছিল, এবার হইতে চলিব ? কিসে ভাল হইবে জানিনা—জানিবার প্রয়োজনও বুঝি রাখিনা—যদি অশুভ ব'করাইয়া দাও—তুমিই সমস্ত করিতেছ—আর তুমি ভিন্ন আমি জড়শিও নাহি ।

কিন্তু অবিরামে চলা বুঝি একবারে হয়না । অথবা ‘অবিরামে চলন’ কপাটাই হয়না । এখনকার ধন্য তাগ ও গ্রহণ । বায়ু, জল, বাস, সকলি এখানে অগ্রসর হয় আবার পশ্চাৎ হটে । বাহিরে আসিয়া হয় অহং ভিতরে ঢুকিয়া হয় সঃ । অবিরামে কিছুই চলে না । “চলন বিরাম” ইহাই বুঝি ঠিক কথা ।

মাথা করি—এতদিন চেঁচা করিয়াও ঠিক হইতেছিল না কেন ? শাস্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাসের অভাবই ইহার মূল কারণ । আরও একটু কিছু আছে । কিসে শীঘ্র হয়—এই অজ্ঞায় ব্যাকুলতায় নূতন নূতন শাস্ত্র আজ্ঞা পালনের যে চেঁচা তাহাও না হইবার অল্পতম কারণ । এইরূপ ব্যাপারে এক ধরিয়া থাক, বত শিথিল হয় এমন আর কিছুতেই হয় না ।

মাটির নীচে জল আছে । একদান খুঁড়িতে আরম্ভ করিলাম—কতক দূর খুঁড়িয়ায়—আর একজন বলিল—এইস্থান না খুঁড়িয়া ঐ দ্বানটি খুঁড়িতে থাক—অমনি তাহাই করিলাম । সেখানেও কার্য শেষ হইতে না হইতে আর এক জনের কথা শুনিয়া আর এক স্থানে বাইলাম—এরূপ করিলে কখন আর জল পাওয়া যাইবেনা কেননা এক জনকে বিশ্বাস করিতে পারি নাই বলিয়া ।

এক ধরিয়া সকলই করা যায়—তবে যে মানুষ পারেনা—তাহা মহামায়ার প্রকাশ রহস্য । তিনি বলিয়া দিতেছেন—ছাড়িওনা—বলিয়া কহিয়া এক ছাড়াইয়া অল্প ধরান—আবার অল্প ধরাইয়া সব শিথিল করেন । যাহাদের গোঁ আছে তাহারাই এই প্রকাশ রহস্যে জিতিয়া যায় । যাহার গোঁ রাখিতে পারে না তাহার হারিয়া যায় । হারিয়া গিয়া আলস্তে অনিচ্ছায় ক্রেশ পায় আর মা হাসিতে হাসিতে দেখেন অজ্ঞান কেমন ।

তথাপি মা আমার বে করুণাময়ী—তাহাতে ভুল নাই বোঁটাকে মাটির মধ্যে দৃঢ় ভাবে প্রোথিত রাখিতে হইলে অনেকবার হেলাইতে হয়, নাড়াচাড়া করিতে হয় । সাও আপন সম্মানকে তাই করেন—পাছে ছেলে শেষে ঠকিয়া যায়—আর কুহারও হাতে ঠকে ।

তিনিই বলেন না পাওয়া পর্যন্ত “এক” শিখিল করিওনা । আগনি শিখিল করিয়া বলিয়া দেন এই দেখ ঠকিলে—আর ঠকিওনা ‘এক’ হইতেই সব পাইবে আনিয়া রাখ । এই “এক” টিতে সবার অধিকার আছে । এই ‘এক’টি আমার নাম । নাম সোমানুল নামান সাকার রূপ মাত্র ।

অগতঃ জননী তাঁহার অঘোঁরা মুষ্টিতে কি শিখাইয়া গিয়াছেন ?

অগতঃ বহু দুঃখ পাইবে । সুখও পাইবে কিন্তু দুঃখ অনন্ত । আমার জীবন চাহিয়া দেখ । রাজ্যনাশ, বনবাস, হরণ আবার বিসর্জন । তথাপি এই দুঃখ রাশিকে অতিক্রম করিবার ক্ষমতা অনন্ত কাল ধরিয়া আপনার বস্তুটি দৃঢ় ভাবে ধরিয়া থাক । দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে, সময়ে অসময়ে, শুচি অশুচিতে, প্রতিকূলে প্রতিপক্ষে এক মুহূর্ত্তও ছাড়িয়া থাকিওনা । কখন বৈধরী কখন মধ্যমা কখন পশ্চিমিতে তাহাকেই লক্ষ্য কর । নিত্যস্ত মৃত অবস্থাতেই বৈধরীতে করিতে থাক—সেই সব আনিয়া দিবে । “নাহি মাতা সমুপেক্ষতে হৃতম্” । অধিক কি দুলিওনা ।

—(০)—

এই সে চরিত্র ।

(১)

তনিয়া দেখিয়া অকলঙ্ক শশী,
মনে হয় প্রফালিয়া কলঙ্কের রাশি,
পুনঃ জন্মি ধরাতলে হইবারে দাসী,
এই সে চরিত্র সই কত ভালবাসি ।

(২)

কত ভালবাসি সই শূন্য করম,
স্বার্থলুনা ভালবাস্য পবিত্র ধরম,
নাহি চায় ভালবাসা তবু বাসে ভাল,
ভাল বেসে হ’য়ে থাকে কতই কাঙ্গাল ॥

(৩)

কাত্তাল সবার কাছে মান অপমান—
নাহি গণে, সবে দেয় সর্কদা সন্ধান ।
*নাহি গণে নিজ সুখ—অপরের তরে
সর্ক-লোক সেবা করে এক সেবা ধরে ॥ •

বিধবা না চিরমধবা ।

(ক্ষুদ্র গল্প ।)

(১)

যশোহর জেলার বেত্রাবতী তীরে আঁধার কোটা গ্রাম । স্থানে স্থানে
গেতমকুঞ্জপরিবৃত কীর্ণ দেবমন্দিরের ধ্বংসাপনেষ ইহার প্রাচীনত্ব প্রমাণে
সচেষ্টে ।

এই গ্রামে বিধেবর কথক চুড়ামণির বাস । কথকতা বিষয়ে তাঁহার
খ্যাতি যথেষ্টে । বৎসর বৎসর সাপ্তাহিক পত্রিক্রমণের পর যখন চুড়ামণি
মহাশয় তৈরসসম্ভারে নৌকা যোগে ভবনে প্রত্যাগত হইতেন, তাহা দেখিয়া
অনেক ধনী লোকেরও তাক্ লাগিয়া বাইত । অনেক লোক লোকে মনে
করিত, চুড়ামণি মহাশয়ের পূৰ্ব্বদেশে কোথায় জন্মিদারী আছে !

কথক চুড়ামণির পবিবারে তাঁহার এক মাত্র কন্যা প্রসাদী, তাঁহার স্ত্রী
করণাময়ী । ইহা ব্যতীত একটি পুত্রাতন ভৃত্য ভোলা ।

ভূটী আনন্দ নৈবলিনী ধীরে ধীরে তাঁহার জীবনের হুই পাশে বহিয়া
যাইতেছিল । ইহাতে চুড়ামণি মহাশয় কতকটা ধুর্জটির মত, অগ্নবা প্রয়াগ
তীর্থের মত শোভা পাহতে ছিলেন । তাঁহার হুইদিকে গঙ্গা যমুনার ঢেউ
খেলিতেছিল । করুণানিষ্ঠারিত করুণাময়ীর সন্নিবে, স্নেহবৎসলা জনকানন্দ-
বন্ধিনী প্রসাদীর আনন্দ নৃত্যে, সে গৃহে আনন্দের অবধি ছিল না ।
দরিদ্রের লজ্জা তাহা আবার শত মুখে তাহার শত দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল ।

(২)

অপত্যম্বেহই বোধ হয় সংসারের সন্নিহিত জীবনের সুখের অশরীরী
বন্ধন । চুড়ামণি মহাশয়ের গৃহে তাহা বেশ উপভোগ্য । যে সময়ে
প্রসাদী লম্বে নাট, তাঁহার স্ত্রী করুণাময়ী একটি সন্তানের লজ্জা বটী
ঠাকরপুংক কত উৎকোচ মানস করিতেন, সেদিনও কথক চুড়ামণি মহাশয়ের
গৃহে এক প্রকার সুখ ছিল—আনন্দ ছিল ; কিন্তু তাহা যেন এই পৃথিবীতে
কাহারও দ্বার ধায়ে না । হুইটী আশ সেখানে অনবরত মিলনের চেষ্টা
করিয়াও মিলিত না । একটি কোমল গ্রন্থির অভাব ।

বলীষ্ঠাকুরণ্ করুণাময়ীর বুসে ভুটে হইলেন। প্রসাদী জন্মিল। গৃহে তখন পূর্ণানন্দ। প্রসাদীরমার্জার শিশুটা পয়ান্ত তখন স্নেহের দাবি পাইল। ক্ষুদ্র পরিবার সত্যি তখন একটা বৃহৎ পরিবারে পরিণত হইল। একটা সীমা হৃদক ক্ষীণ আলোক রেখা দৃষ্টি বেগার তখন একেবারে কোথায় মুছিয়া গেল। ইহাইত সংসারের বৈচিত্র্য।

(৩)

সময় চলিতেছে। সে কাহারও অপেক্ষা করে না। দেখিতে দেখিতে প্রসাদীর বিবাহের বয়স পিতা মাতার অজ্ঞাত সারে লাড়া দিল। আনন্দ ও বিস্ময়ে তখন উভয়ের মনে এক অতৃত চাকালোর ছায়া দোলাইয়া দিল। প্রসাদী এত বড় হইয়াছে? লক্ষ্যাবনত অারক্ত মুখ চাহিতে, বলিতে হেটু। চোক ছুটা ভীতা বিহঙ্গীনীর মত ব্যাকুল। শৈশব ও যৌবনের সন্নিগনে এ এক অপূৰ্ণ ভাব।

কপক চূড়ামণি কস্তার বিবাহের বড় দায়ে পড়িলেন। দিন কয়েকের অল্প তাঁর পুরাণ পাঠও বন্ধ করিতে হইল। অনবরত চার মাস পর্য্যটনের পর একটা জামাই ধরিয়া আনিলেন, জাতাভিমানে কুলীন, বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান। গৃহিণী কস্তাদানে প্রথমতঃ একটু আপত্তি করিলেন, পরে বধন চূড়ামণি মহাশয় বুঝাইয়া দিলেন যে, এই ছেলেটির দ্বারা তিনি জামাই ও পুত্রের সাধ একত্রে মিটাইয়া লইতে পারেন, তখন আর তাঁহার এ বিবাহে আপত্তি থাকিল না। ছেলেটির বাপ মা কেহই নাই, নিতান্ত নিরাশ্রয়।

ভুতদিনে, ভুতলগ্নে কস্তাবিক্রয় ও প্রসাদীর বিবাহ যথাসম্ভব সমারোহে সম্পন্ন হইল।

(৪)

অখের উপর হ্রঃখ চিরকালটাই সঙ্গিন্ চড়াইয়া আছে। হর্ষে বিবাদ, সাধে বাদ, ইহা যেন বিধাতার অভিসম্পাত। প্রসাদীর বিবাহের পাকসম্পর্শের দিন, রাত্রে চূড়ামণি মহাশয়ের স্ত্রী করুণাময়ী বেশ একটু অর অশুভব করিলেন। দারুণ পিপাসাও সঙ্গে সঙ্গে যোগ দিল। কোনও ডাক্তার কবিরাজের ঔষধে আর সে পিপাসার নিবারণ হইল না। “কই মা—প্রসাদী জল,—কই মা—প্রসাদী—একটু জল” এই রূপে সপ্তাহ কালাস্তে তাঁহার শেষ পিপাসার শাস্তি হইল। বৈজ্ঞবতীর শৈশলসিদ্ধ নির্মল জলরাশি তাঁহার চিতা ধুইয়া দিল।

প্রসাদী—মাটিতে পড়িয়া “মা আমার—মা গো”, ইত্যাদি ছন্দে শ্রব করিয়া অনেক কাঁদিল। জীবনে এই তাহার প্রথম শোক, বুক বড় পড়িল।

কস্মিনীগান্ত নিজের উদাহরণ দেখাইয়া প্রসাদীকে অনেক বুঝাইলেন। প্রসাদী একটু শান্ত হইল। চুড়ামণি মহাশয়কে আর কাহারও বুঝাইতে হইল না, তিনি নিজেই বুঝিলেন। তাহার কোটরাবিষ্ট চক্ষু দুটি একটু একটু আর্দ্র হইয়া আসিতেছিল, একদিন্দুও জল মাটিতে গড়াইয়া পড়িল না। ভোলাবড়ই কষ্ট হইল। তাহার মা ঠাকুরপের মত আর কি কেহ তাকে বহু করিয়া খাওয়াইবে? যথাবিধি করুণাময়ীর শ্রাদ্ধ সমাপনান্তে, কপক চুড়ামণি কথকতার নাম করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইলেন। একবৎসর কাটিয়া গেল আর তিনি গৃহে ফিরিলেন না। পরস্পর শুনাগেল তিনি ৬ কালীধামে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

(৫)

কস্মিনীগান্ত এখন গৃহস্থামী, প্রসাদী গৃহিণী। আর সেই ভোলা ভূতা। কপোত কপোতীর মত উচ্চবৃক্ষচূড়ে নীড় বাঁধিয়া প্রসাদীর জীবন বড় সুখে কাটিল না। এখন কস্মিনীগান্তের আদর, বহু সোহাগ, ভাল বাসা আর সে বনবিহঙ্গীকে একটা সন্নিহিত গভীর মধ্যে আটকাইয়া রাখিতে পারিত না প্রসাদীর কি যেন অভাব, কি যেন নাই। “কেহ প্রসাদীর কাছে সীতা সাবিত্রীর কথা পাড়িলে প্রসাদী বলিত, এক দিনেই মানুষ ভগবানের তক্ত হইয়া যায় না, এক দিনেই স্ত্রী পতিকে নারায়ণ বেধ করিতে পারেনা। নিজের সুখকামনা অরে অরে ত্যাগ করিয়া পতিসেবা জন্ত দুঃখ অভ্যাস চাই। ইহাই জীব সাধনা।

প্রসাদী তার বাবার অন্ত বড় কাঁদিত। ঘুমের ঘোরে রাজে স্বপ্ন দেখিয়া উঠিয়া বসিত। কস্মিনীগান্ত জিজ্ঞাসা করিলে বলিত “বাবাকে স্বপ্নে দেখিলাম মাথায় জটা, ত্রিশূল হাতে, কপালে সিন্দূরের অর্ধচন্দ্র, বাবা এসে আমাকে কোলে লইলেন।”

মাকে প্রসাদী এক দিনও স্বপ্নে দেখিতনা। প্রসাদীর মা দেখানে ছিলেন, সে পুরী বোব হয় স্বপ্নেরও অতীত।

(৬)

একদিন শীতকালের শেষ রাজে কস্মিনীগান্ত হঠাৎ কলেরাক্রান্ত হইল। গ্রামের আশে পাশে তখন কলেরা দেখা দিরাছিল। অনেক আয়ুর্কেন্দ্রীয় চিকিৎসা ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা নিষ্ফল হইল। “কস্মিনীগান্ত আর কিছুতেই প্রাণ ফিরিয়া পাইল না।

প্রসাদী আগেই বুঝিয়া ছিল যে স্বামীকে মালুম বোধ থাকি পর্য্যন্ত তাহার নারী জীবন বৃথাই রহিল, তাই প্রসাদী সাধনের মত কিছুই করিত না। কত কি ভাবিত। প্রসাদী জানিত স্বামী দেবতা, তাই প্রাতঃকালে শয়্যী হইতে উঠিয়া প্রত্যাহ প্রণাম করিত আর কাদিত, কবে আমি দেবতাকে দেবতা বলিয়া দেখিব? কখন ভাবিত একি হইল? মা গেল কেন? লোকেও বলিত যেই এই দেবতার আবির্ভাব, অমান তাহার মেহময়ী জননীর জন্মের শোধ বিদায়। সে কি পাইয়া, কি চাহাইল? কল্পীগীকান্তের পার্থিব মেহ ভালবাসা তাই তখন পর্য্যন্ত প্রসাদীকে মুক্ত করিতে পারে নাই। তাহার অবসর থাকিতে না থাকিতে সে অভ্যাস অভ্যাস হইতে না হইতে আরোপ বন্ধন ছিড়িয়া গেল।

প্রসাদী একটুও কাদিল না। সে স্বতঃ প্রবৃত্তা হইয়া স্বপ্নানে শববাহীগণের অগ্রগামিনী হইল। আজ তাহার জন্মের শ্রাদ্ধ, গৃহে শ্রাদ্ধ। নদী, জল, আকাশ প্রসাদীর কাছে আজ সবই শ্রাদ্ধ।

বেত্রবর্তী তীরে যেখানে করুণাময়ীর দেহ ভগ্নাবশেষ ধৌত হইয়াছিল, আজ আবার সেইখানে কল্পীগীকান্তের চিতা সজ্জিত হইল।

প্রসাদী বথাবিহিত শাস্ত্রামুশাসিত স্নানক্রিয়া সমাপনান্তে সাত বার প্রদক্ষিণ করিয়া স্বামীর মুখাঘি করিল। মনে পড়িল তাহার বিবাহের সময়ে এইরূপ সাত বার সে স্বামীকে প্রদক্ষিণ করিয়াছিল। ইহার কোন্টা ঠিক? এক বার বন্ধন গ্রহণ, আর এক বার তাহার উন্মোচন।

মুখে অগ্নি দিবার সময়ে প্রসাদী একবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। সে চির পরিচিত মুখ থানি অগ্নির মধ্যে গেল অটুহাসি হাসিয়া উঠিল। প্রসাদীর নয়ন ঝলসিয়া আসিল। শিরার শিরায় বিজ্ঞাপ্রবাহ ছুটিয়া গেল। আর স্থির হইয়া দেখানে দাঁড়াইতে পারিল না। ভ্রত পদে গৃহাভিমুখে ছুটিল। পথি মধ্যে, জটা মাখে, ত্রিশূল হাতে, কপালে সিন্ধুর অঙ্ক চন্দ্র এক সন্ন্যাসী প্রসাদীকে দৃঢ় বাহুমূলে জড়াইয়া ধরিল। প্রসাদী চিনিল, এ সেই স্বপ্নের সন্ন্যাসী—তাহার পিতা।

(৭)

পিতা বিধবা কৃত্তাকে ৮কালীধামে আনিলেন। প্রসাদী প্রথম দিন আসিয়াই গঙ্গাতে স্নান করিল—করিয়া একবার একবার বিশুদ্ধ অঙ্গপূর্ণা

দেখিয়া আসিল। মনে মনে বলিয়া আসিল—তোমাদের আশ্রয়ে আসিলাম, প্রতাহ যে যাত্রা করিব তেমন অবস্থা আমার নাই। আমি বিধবার দৰ্শ্য হে ব্রহ্মচর্যা তাহাই আচরণ করিব। ঠাকুর; আমার কৰ্ম নিষ্পত্তি তোমার করিতে হইবে।

প্রসাদী কাহারও সহিত মিশিত না কিন্তু ক্রমে ক্রমে হুই একজন করিয়া পরিচিতের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। সধবা কালে প্রসাদীর বাহ্য রূপ ছিল বিধবা হইয়া প্রসাদীকে যেন আবার কেহ ভাবিয়া গড়িল। প্রতাহ গল্পা দান, একবেলা সাঙ্ঘিক ভোজন, আর প্রাণপণে ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ—এই সকলে প্রসাদী মুক্তিমতী দেবী হইয়া উঠিল।

(৮)

কথায় কথায় একদিন বিধবার বিবাহ হওয়ার কথা উঠিল। প্রসাদী অনেককণ কোন কথাই কহিল না। কেহ বলিল এই যে খালি প্রাণে বিধবার একটা অতৃপ্ত বাসনা থাকিয়া যায়—যার জন্ত বিধবা একটা ছা হুতাশ লইয়াই থাকে, আর ব্রহ্মচর্যা পারে না তাই কোথাও একটু রূপ বা গুণ দেখিলেই ভ্রান্ত হইয়া ভালবাসিয়া নিশি দিন তাই চিন্তা করে—সুবিধা পাইলে কত স্থানে কত ব্যভিচার হইয়া যায়, কত স্থানে কত ভৈরবী কত যোগিনী কত সন্ন্যাসিনী সাজিয়া বসে—এ সমস্ত নিবারণের জন্ত বিধবার বিবাহ মন্দ কি?

আর এক জন বলিল—বিবাহ দিলেই যদি দুঃখের প্রতীকার হইত তবে সধবার আর কোন দুঃখ থাকিত না। যখন সধবারও দুঃখ দেখা যায় তখন সধবাদের দুঃখ দূর করিবার জন্ত তাহাদেরও আবার বিবাহ দিতে হয়।

আর একজন বলিল—কথা ত সত্য। বিধবার দুঃখ অপেক্ষা বহু সধবার জীবন আরও বিষাদময়।

বহু কল্পনা জল্পনা হইতে লাগিল। প্রসাদী কোনই উত্তর করিল না। মনে মনে প্রসাদী কি যেন প্রার্থনা করিতে ছিল।

সহসা সকলে দেখিল জটা মাথে ত্রিশূল হাতে কপালে সিন্দূরের পূর্ণচন্দ্র এক সন্ন্যাসী প্রসাদীর নিকটে। সন্ন্যাসী বলিলেন ধর্ম রক্ষাই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব। ধর্ম রক্ষা ভিন্ন শরীর, বাক্য ও মনের ছন্দ থাকে না। জীব স্বচ্ছন্দে না থাকিতে পারিলে বুধা পাপ জীবন বহন করে। জীলোকের ধর্ম সত্যীত। বিধবার বিবাহে সত্যী ধর্ম নাশ হয়। সধবা জীবনেও যদি ব্রহ্মচর্যা রক্ষা না হয় তবে সত্যী ধর্ম নষ্ট হয়। বিধবা হও বা সধবাহও, মা তোমরা সত্যী ধর্ম বুঝিয়া রক্ষা কর। কথা শেষ হইল। সকলে অবাক হইয়া দ্রুতিল প্রসাদী নাই। সেই অবধি কানীতে কেহ আর প্রসাদীকে দেখিল না।